জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

নিরীক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩২তম সংখ্যা

করোনাকালে সাংবাদিকতা
পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

নিরীক্ষা

২৩২তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

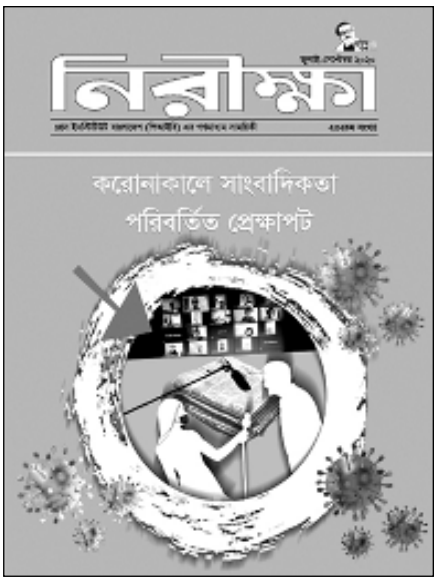

'পৃথিবীর এখন গভীর গভীরতর অসুখ।' এই অসুখ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গোটা বিশ্ব আজ করোনার গ্রাসে। বলা যায়, সমগ্র বিশ্ব আজ মহাসংকটের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ রোগটিকে 'বৈশ্বয়িক মহামারি' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ভাইরাসটি পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সহজ করে বললে– সভ্যতা আজ বহুবিধ হুমকিতে। এই মহামারির প্রকোপে জনজীবনে যে ছন্দপতন ঘটেছে, তা নিকট অতীতে বিশ্ববাসী কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে অর্থনীতির চাকা অনেকটা স্থবির। এর প্রভাব সামাজিক সম্পর্কের ওপর অভিঘাত হানছে। জীবন-জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকা, কাজ হারানো, পুনরায় কাজে যোগ দেওয়া যাবে কি না, সেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধসহ নানাভাবে জনজীবন বাধাগ্রস্ত। মানসিকভাবেও হচ্ছে বিপর্যস্ত।

বৈশ্বিক এই সংকটের ছয় মাস ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা নিজেদের আবিষ্কার করছেন একটি অনিশ্চয়তা ও হতাশাভরা জগতে। যেখানে বিশ্বে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা তিন কোটি এবং মৃতের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। চাকরি হারিয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। মহামারি শুরুর পর থেকে মানুষের মানবিক গল্পগুলো তুলে এনেছেন সাংবাদিকরা। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণির মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করেছেন তিনি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখতে দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ। পাশাপাশি তাঁর দল আওয়ামী লীগকেও জনগণের দোরগোড়ায় নামিয়েছেন তিনি। সরকার ও দলের সমন্বয়ে মানুষকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টিও তিনি সরাসরি মনিটরিং করছেন। এসব উদ্যোগ নিয়ে করোনা সংকট মোকাবিলায় দেশবাসীর পাশে থেকে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এই দুঃসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মানবিক সদিচ্ছায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট মূলধারার সাংবাদিকদের মধ্যে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করে আসছে।

শীতকালে দ্বিতীয় দফার সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কার্যকর প্রতিষেধক বা টিকা এখন পর্যন্ত হাতে আসেনি। বাংলাদেশেও দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, নিরাপদ কোনো ভ্যাকসিনের নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সাংবাদিককে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এমনকি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছেন অনেকেই। তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

করোনাভাইরাস প্রতিনিয়ত রূপ বদলায়। এ কারণে ওষুধের কার্যকারিতাও বদলে যায়। এই অবস্থায় করোনা নিয়ে আরও গভীরে গবেষণা হওয়া দরকার। দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়া দরকার। একই সঙ্গে কোথাও কোনোভাবে যেন আতঙ্ক ছড়ানো না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তাছাড়া গুজব ছড়ানোর প্রবণতাও এদেশে তীব্র। এসব প্রতিরোধ করা অবশ্যকর্তব্য।

করোনাকালীন এই বাস্তবতার নিরিখে গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা' গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় দৈনিক ও অনলাইনের সম্পাদক এবং জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যমের কর্মীদের মতামত ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার সমন্বয়ে 'করোনাকালে সাংবাদিকতা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট' শিরোনামে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে। সংখ্যাটি পাঠক, গবেষক এবং সংবাদকর্মীদের কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

** প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২০*

সূ|চি|প|ত্র

অভিমত

করোনাকালে সাংবাদিকতা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

করোনা শেষে চাই ভালোবাসার সজীব সাংবাদিকতা ৬
সাখাওয়াত আলী খান

তথ্যায়িত সমাজ কাটিয়ে উঠবে করোনা সংকট ৯
ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সঠিক নির্ভরযোগ্য সংবাদই সংকটকালে প্রত্যাশা ১২
অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

অতিমারিতে প্রিন্ট মিডিয়ার সংকট ও উত্তরণ ১৪
আবেদ খান

মহামারি সাংবাদিকদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সামনে এনেছে নতুন করে ১৬
তাসমিমা হোসেন

করোনাকালীন চ্যালেঞ্জ এবং সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ১৮
সাইফুল আলম

করোনাকালে সক্রিয় গণমাধ্যম ২১
জাফর ওয়াজেদ

করোনাকাল ও সম্প্রচারমাধ্যম ২৩
রেজোয়ান হক

মোবাইল যুগে সাংবাদিকতায়ও মাস্ক জরুরি ২৫
জাহিদ নেওয়াজ খান

সংগ্রহ ও সম্পাদনা– পপি দেবী থাপা
সহযোগিতায় মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন

২৭ **নয়া স্বাভাবিকতা এবং আমাদের সাংবাদিকতা**
শুভ কর্মকার

৩২ **কোন পথে অর্থনীতি কীভাবে পুনরুদ্ধার**
শওকত হোসেন

৩৫ **কোভিড যখন সঙ্গে কীভাবে করবেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা**

৩৮ **বাংলাদেশে করোনাকালীন সাংবাদিকতা: আক্রান্ত সাংবাদিকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সুরক্ষা কৌশল অনুসন্ধান**
মাহামুদুল হক

৪৯ **করোনা নিয়ে করোনাকালে সাংবাদিকতা**
ইফতেখার মাহমুদ

৫২ **করোনাকালে টেলিভিশন সাংবাদিকতা**
রুহুল আমিন রুশদ

৫৫ **বিতর্কের কেন্দ্রে যখন করোনা শনাক্তকরণ কিট ও ভ্যাকসিন প্রসঙ্গ**
অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

৫৮ **সংক্রমণ সময়ের সাংবাদিকতা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুরুত্ব ও নির্দেশনা**
মো. মিনহাজ উদ্দীন

৬৪ **কোভিড-১৯ মহামারি যে সাত উপায়ে পালটে দেবে সাংবাদিকতা**
ভাবানুবাদ- মো. শামসুল কবীর (সজল)

৬৭ **করোনাকালে উপকূল সাংবাদিকতা**
রফিকুল ইসলাম মন্টু

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২৩২তম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

করোনাকালে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ও এক মানবিক প্রধানমন্ত্রী ৭২
মোল্লা জালাল

মফস্বল সাংবাদিকতায় করোনার প্রভাব ৭৫
রহিম বাদশা

করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ৭৮
রাশেদ রাব্বি

করোনার ভ্যাকসিন রিপোর্টিং: বিবেচ্য বিষয় ৮১
ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া

নিউ নরমাল মানে নরমাল নয় সতর্কতাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলুন ৮৪
মিরাজ আহমেদ চৌধুরী

করোনাকালে তথ্যের উৎস ৮৬
মঈন মাহমুদ

করোনাকালে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র ৯১
মামুন অর রশিদ

সাংবাদিকতার নতুন সংকট কোভিড-১৯ ৯৬
শ্যামল দত্ত

ফটোসাংবাদিকের ক্যামেরায় কোভিড-১৯ মহামারি ১০৪
রোয়ান ফিলিপ

করোনাকালে গণমাধ্যমে শিক্ষার হালচাল ১১২
সাইফুল সামিন

১১৫ কোভিড-১৯॥ গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ও ভূমিকা
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

১২১ করোনাকালে সোশ্যাল মিডিয়া: তথ্য বনাম বিভ্রান্তিকর তথ্য
বারেক হোসেন

১২৬ করোনাকালীন গণমাধ্যমে স্প্যানিশ ফ্লুর শিক্ষা
সারতাজ আলীম

১২৯ করোনা: প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার কাল
মাহফুজুর রহমান মানিক

১৩৩ সংবাদকর্মীর করোনার দিনরাত্রি
রাসেল মাহ্‌মুদ

১৩৫ পেশাদার সাংবাদিকতায় করোনার প্রভাব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
মো. ফরহাদ উদ্দীন

১৩৯ যুগে যুগে যত মহামারি
মো. লুৎফর রহমান

১৪২ কেমন পৃথিবী আমাদের অপেক্ষায়
অনুবাদ- আকিল জামান ইনু

১৪৫ গণমাধ্যম সংবাদ

১৫৬ পিআইবি সংবাদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

করোনাকালে সাংবাদিকতা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে সভ্যতা দেখছে এক অণুজীবের তাণ্ডব। তার সামনে থমকে যাওয়া পৃথিবী, চিন্তায় বসবাস অস্তিত্ব হারানোর আতঙ্ক। বিবর্তনের ধারায় পৌঁছানো মানব, তার প্রচেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা আজকের সভ্যতা আর বিজ্ঞানের উদার দানের এ সমাজ বনাম কোভিড-১৯ নামক মারণ ভাইরাস। বিশ্বজুড়ে নীরব মৃত্যুমিছিল। চাঁদের মাটিতে পদচিহ্ন মেপে মানুষ যখন মঙ্গলে বসবাসের স্বপ্নে বিভোর, ঠিক তখনই করোনাভাইরাসের থাবা আঘাত হেনেছে অস্তিত্বের মর্মমূলে। চারিদিকে সংকটের পদধ্বনি। গণমাধ্যমও এর বাইরে নয়। করোনাকালীন গণমাধ্যমের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সংকটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা কথা বলেছি দেশের বিশিষ্ট গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন সম্পাদক এবং সম্প্রচারমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে। নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য তাঁদের অভিমত সংগ্রহ ও সম্পাদনায়– পপি দেবী থাপা, সহযোগিতায় মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন।

করোনা শেষে চাই ভালোবাসার সজীব সাংবাদিকতা

সাখাওয়াত আলী খান

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনিশ্চয়তা কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। মানবজীবনে অনিশ্চয়তা প্রচুর। কিন্তু করোনা নামক একটি ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ এই বহুল ব্যবহৃত শব্দটিই নতুন এবং ভয়ানক এক মর্মান্তিক অর্থ নিয়ে আজ হাজির হয়েছে মানুষের সামনে। আমরা জানি, অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়েই সভ্যতা এগিয়েছে। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ– এগুলো ছিল মানবসভ্যতার প্রধান গতিরোধকারী বিষয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রধানত ছিল আঞ্চলিক এবং এগুলোর তীব্রতাও অঞ্চলভেদে তারতম্য ছিল। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু করোনা নামক এই ক্ষুদ্র ভাইরাস যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব, তা-ই আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের মধ্যে এক মারাত্মক বিভীষিকার সঞ্চার করেছে। এই ভাইরাসে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী এমন আতঙ্ক অতীতে আর কখনো ছড়িয়েছে কি না সন্দেহ। গত ছয় মাসে পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ এই রোগে প্রাণ হারিয়েছে।

“করোনা নামক এই ক্ষুদ্র ভাইরাস যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব, তা-ই আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের মধ্যে এক মারাত্মক বিভীষিকার সঞ্চার করেছে”

করোনা রোগের এই যে বিস্তার ও তীব্রতা, তা কিন্তু আমরা জানতে পারছি সাংবাদিকতারই কল্যাণে। অন্যদিকে এই সময়ে গণমাধ্যমের পরিচালনা, টিকে থাকা এবং তার রূপ পরিবর্তনের ধারারও নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই করোনা মহামারি। অবশ্য সমাজের সব ক্ষেত্রেই এই ভাইরাসটি পরিবর্তন ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এখানে আমরা সাংবাদিকতার ওপর করোনা মহামারির প্রভাব নিয়েই কিছু আলোচনার চেষ্টা করব। অবশ্য শুধু সাংবাদিকতাই নয়, বৃহত্তর গণমাধ্যমের পুরোটাই এই করোনা মহামারি দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত।

বলা বাহুল্য, করোনা মহামারির প্রভাব বর্তমানে পুরো বিশ্বের সমাজব্যবস্থাকেই অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। সাংবাদিকতা এই সমাজব্যবস্থারই অংশমাত্র। সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেখানে সাংবাদিকের অকুস্থলে যাওয়া অপরিহার্য, সেখানেই সমস্যা সবচেয়ে বেশি। সরেজমিন দেখে সংবাদ লেখা এখন কঠিন কাজ। বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরে থাকতে হয়, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হয়– এসব বিষয়ই সাংবাদিকের জন্য অস্বস্তিকর এবং কাঙ্ক্ষিত খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। এছাড়া মানুষের চলাচল ব্যবস্থা এখন চেষ্টা করেও স্বাভাবিক করা যায়নি। অনেক জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই অথবা যাওয়া সময় সাপেক্ষ কিংবা অতি ব্যয়বহুল। সম্পাদনার কাজও এখন প্রধানত অনলাইনেই করা হয়। সেক্ষেত্রে সর্বত্র আইটি ক্ষেত্রে দক্ষ লোকের দরকার হয়। সংবাদমাধ্যমগুলোয় বিজ্ঞাপন খুবই কম, কাজেই সংবাদকর্মীদের ছাঁটাই চলছে অবিরাম, কোথাও কোথাও বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা মাসের পর মাস বেতনই দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থা যে কেবল গণমাধ্যমের তা নয়, বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা।

এগুলো সবই নেতিবাচক চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে প্রশ্ন হলো– সভ্যতার বাহক মানবজাতি কি হেরে যাবে করোনার কাছে? মহামারি অতীতেও হয়েছে এবং মানুষ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। মহামারিতে প্রাণও গেছে বহু মানুষের; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মারাত্মক রোগের টিকা-প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– বাংলাদেশে এখন গুটিবসন্ত নির্মূল হয়েছে, কলেরা মহামারি হয় না, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রিত বলা যায়, আগের মতো টাইফয়েড দেখা যায় না, একসময়ের মারাত্মক ব্যাধি কালাজ্বরও হয় না বললেই চলে। এ ধরনের উদাহরণ অনেক। তবে মানুষ মরণশীল, কিছু রোগশোক থেকেই যাবে।

এত কথার পরও স্বীকার করতেই হবে, সম্ভাব্য কর্মপন্থায় সাংবাদিকতায় উন্নতির চেষ্টা করা হলেও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতা কেমন হবে, এখনই তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়

এখন সোজা কথা, করোনা যতদিন আছে, আমাদের করোনার এই শঙ্কা নিয়েই বাঁচতে হবে। করোনা যাতে না হয়, তার সব ব্যবস্থা করে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে। নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মানুষকে সচেতন করার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিতে হবে। করোনা-আক্রান্ত হয়ে গেলেও চিকিৎসার যেন ত্রুটি না থাকে, সেক্ষেত্রে সব মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। আর সাংবাদিকতা, তা যে প্রকারেই করা যায়, চালু রাখতে হবে। হয়তো এখন যেমনভাবে সাংবাদিকতা চলছে, আগামী দিনগুলোয় তার রূপ পাল্টে যাবে, সংবাদপত্রের প্রচার কমে যাওয়ার কারণে তাদেরও অনলাইন সংস্করণের দিকেই বেশি জোর দিতে হবে। মানুষ যেহেতু অভ্যাসের দাস, তাই সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা কমলেও আশা করা যায় মাধ্যমটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। তবে মানুষের পছন্দমতো পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে, পাঠক হয়তো বিনোদনের জন্য, ঘটনার বিশ্লেষণের আশায় এবং নতুন জ্ঞানের সন্ধানে সংবাদপত্র পড়বে। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে সামাজিক গণমাধ্যমের ক্ষতিকর দিকগুলো যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে সামাজিক গণমাধ্যমের ইতিবাচক দিকগুলোকে সম্প্রসারিত এবং নেতিবাচক দিকগুলোকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের পরিচালকদের ভাবতে হবে গভীরভাবে।

এত কথার পরও স্বীকার করতেই হবে, সম্ভাব্য কর্মপন্থায় সাংবাদিকতায় উন্নতির চেষ্টা করা হলেও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতা কেমন হবে, এখনই তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন গবেষণার, নিয়মিত গভীর পর্যবেক্ষণের এবং পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের অভিমত যাচাইয়ের। তারা যা চাইবে, যেভাবে চাইবে, সেগুলো আমলে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের গণমাধ্যম। গণমাধ্যম সম্পর্কে বাক্‌পটুতার আশ্রয় নিয়ে এক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী অর্থহীন। মানুষের প্রবণতা বোঝার জন্য চাই মনোবিজ্ঞানের সহায়তা, চাই নিবেদিত নিবিড় গবেষণা। ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এ দুই বিজ্ঞানের উন্নতি ও গতিপ্রকৃতির ওপর অনেকটা নির্ভর করবে আগামী দিনের সাংবাদিকতার ধরন-ধারণ। এখন যেমন বলা হচ্ছে– 'মুঠোফোনই প্রাথমিক মাধ্যম' (মোবাইল ফার্স্ট), তেমনি ভবিষ্যতে হয়তো বলা হবে নতুন কোনো প্রযুক্তির কথা। যদি করোনার টিকা অবিষ্কার হয়ে রোগটি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তবে হয়তো নতুন দিনের সাংবাদিকতায় শোনা যাবে আরও অনেক নতুন কথা। তবে এটা ঠিক, করোনার অভিজ্ঞতা হয়তো পৃথিবীর মানুষের মনোজগৎ অনেকটাই পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু তার আগে চাই করোনার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ'জয়। কে জানে বিজয়ী মানুষ তখন বিদ্বেষের চাইতে ভালোবাসার দিকে ঝুঁকতে পারে।

তখন সাংবাদিকতায়ও হয়তো হানাহানি বড়ো সংবাদ না হয়ে আত্মত্যাগই বড়ো সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মানুষ খারাপ খবরের চেয়ে সুখবর বেশি পছন্দ করতে পারে। নেতিবাচকতার চেয়ে ইতিবাচকতায় বেশি আকর্ষণ বোধ করতে পারে।

এ সবই আমাদের কল্পনা। কিন্তু করোনার শিক্ষা যে একটা পরিবর্তন আনবে বলে মনে হয়, তেমনই সাংবাদিকতায়ও করোনা-পরবর্তী বড়ো ধরনের বিন্যাস আশা করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাবে আসতে পারে পরিবর্তন। করোনা-পরবর্তী সময়ে পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকতার আকর্ষণ বাড়তে পারে। মানুষের জ্ঞান ও শক্তির যে দম্ভ করোনায় ধূলিসাৎ হওয়ার পথে, তা থেকে হয়তো মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আরও সহনশীল হতে পারে। সাংবাদিকরা সেই সুযোগ নিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সুলিখিত রিপোর্ট প্রচারে মনোযোগী হতে পারেন। সংবাদের ধরন পাল্টে গিয়ে সাংবাদিকরা হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়বেন সুশিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সুখাদ্য ও সুস্থ বিনোদনবিষয়ক প্রতিবেদন লেখা ও প্রচারে। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকও হয়তো তা-ই চাইবেন।

আমাদের জন্য অস্বস্তির কারণ এই যে, করোনার হামলায় বিপর্যস্ত হয়েও সমাজে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, কথাবার্তা কমেনি। এককথায়– বিশ্বজোড়াই এখন হিংসার রাজত্ব। সেই হিংসারই প্রতিফলনও বেশি সাংবাদিকতায়, কিন্তু করোনা যে আমাদের শিকড় খেয়ে ফেলছে, সেদিকে যেন সাংবাদিকসহ কারও তেমন হুঁশ নেই। সংবাদমাধ্যমজুড়ে প্রধানত এখন কেবল অপরাধ আর অপরাধ। আশার বাণীর বড়ো অভাব। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকরাও কেমন যেন উদাসীন হয়ে যাচ্ছে, অপরাধ, মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা, দেখেশুনে, পড়ে পড়ে তারা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে, যেন কোনো কিছুতে তাদের কিছু যায় আসে না। করোনায় প্রতিদিন কতজন মরছে, তা সাংবাদিকরা রুটিনমাফিক জানালেও জনগণ মনে রাখতে পারে না, কিংবা মনে রাখতে চায় না। সেই জন্য এখন মানুষ সংবাদমাধ্যমে বড়োজোর চোখ বুলায়, তাদের মগজে তেমন কিছু ঢোকে না।

তাই স্বীকার করতেই হবে– সাংবাদিকতা আজ অনেকটাই ম্রিয়মাণ। কিন্তু আমরা আশাবাদী হতে চাই। করোনা যাবে, নতুন দিন আসবে, আসবে নতুন সজীব ভালোবাসার সাংবাদিকতা। আমরা সেই আশায় পথ চেয়ে আছি।

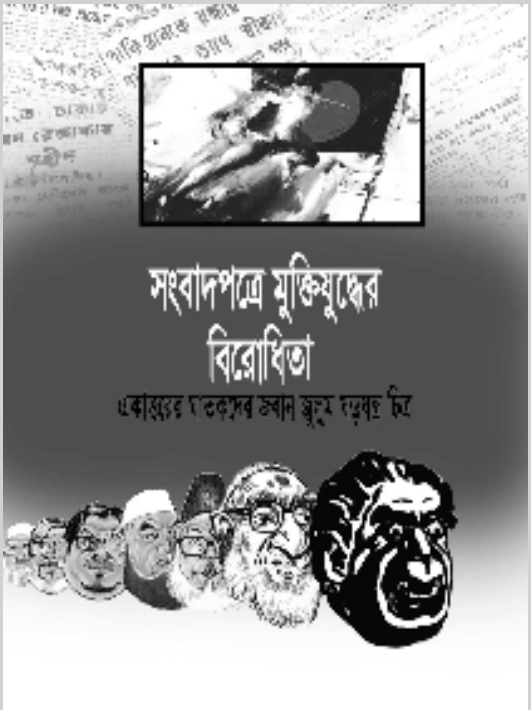

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তথ্যায়িত সমাজ কাটিয়ে উঠবে করোনা সংকট

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদ, বাসস

বিশ্বব্যাপী করোনার থাবায় এক সংকটকাল অতিক্রম করছি আমরা। এটা কেবল বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশের জন্যই একটা কঠিন সময়। এককথায়, আমরা সবাই মিলে অতিবাহিত করছি একটা কঠিন সময় এবং যাচ্ছি নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই সংকটকালীন আমাদেরকে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, গণমাধ্যম– সর্বক্ষেত্রে একটা বড়ো ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে আর্থিক সংগতি দরকার হয়, সেখানে একটা বড়ো ধরনের গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি ধরে রাখা যাচ্ছে না। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সরাসরি দেখা যাচ্ছে, সার্কুলেশন কমেছে মুদ্রণমাধ্যমের আবার একই সঙ্গে সম্প্রচারমাধ্যমের গ্রাহক-দর্শক বেড়ে গেছে বেশ কয়েক গুণ। বেড়েছে সম্প্রচারমাধ্যম নির্ভরতা। যদি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আসি, বিজ্ঞাপন ছাড়া সম্প্রচার আর মুদ্রণমাধ্যম যেটাই হোক, গণমাধ্যমের কোনো শাখাই চলতে পারে না। বিজ্ঞাপনই তাদের জীবনপ্রবাহ ধরে রাখে। সেই জায়গায় কমে গেছে বিজ্ঞাপন। কারণ পুরো পৃথিবীরই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। আমাদের

> আমরা সবাই মিলে অতিবাহিত করছি একটা কঠিন সময় এবং যাচ্ছি নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে

দেশেও একই অবস্থা লক্ষ করছি। যারা সচরাচর বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন শিল্পকারখানা, ব্যাংক, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা– তারা এসব ক্ষেত্রে অনেক সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছেন। মূলত এর ওপর নির্ভর করে গণমাধ্যমগুলো সাংবাদিকদের বেতনভাতা দিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে সরাসরি। অনেক গণমাধ্যম ইতোমধ্যেই বহু সাংবাদিককে ছাঁটাই করেছে অথবা বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে। শুরুতেই বলেছি, আমরা একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছি। এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশ সরকার খুবই সহানুভূতিশীল হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রণোদনামূলক সাহায্য-সহযোগিতা করছে। সরকারের পক্ষ থেকে গার্মেন্টসহ অন্যান্য শ্রমিক, কৃষিক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, দিন আনে দিন খাওয়া মানুষ অর্থাৎ দৈনিক আয়ের ওপর যাদের সংসার চালাতে হয়, এমন প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষকে সাহায্যের ছাতার আওতায় আনা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শিল্পকারখানার মালিকদেরও নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে সরকার। কলকারখানা সচল রাখতে সময়মতো শ্রমিকদের বেতনভাতা পরিশোধে নামমাত্র সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেছে সরকার। এ সবই দৃশ্যমান। তবে আমাদের দেশের গণমাধ্যমের আর্থিক অবস্থা সব সময় একটু দুর্বল বলে আমি লক্ষ করেছি। শেখ হাসিনা প্রশাসন এই সংকটকালে তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকসহ দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিক, তিনি মুদ্রণ অথবা সম্প্রচারমাধ্যম যেখানেই কাজ করুন না কেন, তাদেরকে প্রণোদনা দিচ্ছেন। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে এই প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। পিআইবি'র মহাপরিচালক যিনি একই সঙ্গে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে সাড়ে তিন হাজারের মতো সাংবাদিক প্রণোদনা সাহায্য পেয়েছেন। এছাড়া সাংবাদিকদের জন্য আগেই বর্তমান সরকারের আমলে তহবিল গঠন করা হয়েছে। সেখান থেকে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সাংবাদিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। সেই তহবিলে বর্তমানে ফিক্সড মানি লাভসহ জমা আছে ৪৫ কোটি টাকার কিছু বেশি। আমাদের সাংবাদিক নেতা এবং সম্পাদকদের চাহিদা মোতাবেক সরকারি বিজ্ঞাপনের বকেয়া টাকা দ্রুততার সঙ্গে পরিশোধ করা হচ্ছে (বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনেক সময় মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছরও অনেক বিজ্ঞাপন বিলের টাকা বাকি পড়ে থাকে)। এ সবকিছুই করা হচ্ছে গণমাধ্যমগুলোর টিকে থাকার স্বার্থে। যেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলো বিজ্ঞাপন সংকুচিত করে ফেলেছে বা দিচ্ছে না, সেখানে সরকারের বিজ্ঞাপনগুলো গণমাধ্যমকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে। করোনাকালীন সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসামগ্রী দিচ্ছে।

গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য, গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য মুক্তগণমাধ্যম ও তথ্যমনস্ক নাগরিকের কোনো বিকল্প নেই। এই বিষয়টি বর্তমান সরকার সব সময় গুরুত্ব সহকারে, অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করছে

বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে স্বাধীনভাবে গণমাধ্যমের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া। শেখ হাসিনা সরকারই গঠন করেছে স্বাধীন তথ্য কমিশন, প্রণয়ন করেছে তথ্য অধিকার আইন। সাধারণ মানুষসহ প্রত্যেকের চাহিদা পূরণের জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত যে সরকার নেয়, সে সরকারের কাছে সব সময় আমরা আশা করি, গণমাধ্যম কোনো ধরনের বাধার মুখে পড়বে না। একই সঙ্গে আমরা এটাও আশা করি, গণমাধ্যম নেতা, গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক– তারাও এগিয়ে আসবেন। শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাদেরও লক্ষ রাখতে হবে এই করোনাকালীন সংকটে আমাদের সাংবাদিকরা যেন কোনো সমস্যায় না পড়েন। সাংবাদিকদের ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া এ মুহূর্তে অমানবিক। কারণ, এই সময়ে বিকল্প চাকরি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের সবাইকেই হতে হবে মানবিক। করোনা আমাদের এটাই শিখিয়েছে। আমাদের একে অপরের থেকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হচ্ছে। পাশাপাশি করোনা আমাদের এই শিক্ষাও দিচ্ছে যে– আমরা যতই শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখি না কেন, আমাদের মানসিক নৈকট্য সৃষ্টি করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের অভাব, চাহিদা, প্রয়োজন– এগুলো উপলব্ধি করি এবং সেই মোতাবেক কাজ করি। সবাই মিলে কাজ করলে আমার ধারণা, আমরা করোনা সংকটও কাটিয়ে উঠতে পারব। আর আমাদের গণমাধ্যমও বিধ্বস্ত হবে না। বরং করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম আরও সমৃদ্ধি লাভ করবে। করোনা পরিস্থিতি কিন্তু মানুষকে আরও বেশি তথ্যমুখী করেছে। যে মানুষ সংবাদ পড়তে চাইত না, সংবাদ দেখত না, বিভিন্ন রকমের বিনোদন নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তিনিও সংবাদমুখী হয়েছেন। তিনি সম্প্রচারমাধ্যমে সংবাদ দেখছেন, পত্রপত্রিকা পড়ছেন। যদিও প্রাথমিকভাবে পত্রপত্রিকার সার্কুলেশন একটু কমে গিয়েছিল। এখন আবার মানুষ বিশেষ করে পত্রপত্রিকার অনলাইন সংস্করণের দিকে বেশি ঝুঁকছে। বিভিন্ন দেশে এই করোনাকালীন যে গবেষণাগুলো হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সংবাদের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেছে বহুগুণ। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি গণমাধ্যমকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা সংকটে ফেললেও আমার ধারণা– যদি পাঠক, দর্শক, সংবাদকর্মী এবং সম্পাদক-মালিক সমন্বিতভাবে কাজ করি, সেই সঙ্গে সরকারের যে সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছি সব মিলিয়ে এই সংকট নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারব।

গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য, গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য মুক্তগণমাধ্যম ও তথ্যমনস্ক নাগরিকের কোনো বিকল্প নেই। এই বিষয়টি বর্তমান সরকার সব সময় গুরুত্ব সহকারে, অগ্রাধিকার দিয়ে

বিবেচনা করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে সংবিধান দিয়ে গেছেন, যে সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর আছে, সেখানে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে– সরকারি সহযোগিতানির্ভর গণমাধ্যম তার স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারবে কি না?

করোনাকালে সাংবাদিকদের আপৎকালীন সহযোগিতা যেভাবে করা হয়েছে– আমি জানি, দলমতনির্বিশেষে সবাইকে সমভাবে, প্রয়োজন অনুসারে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের মনে রাখতে হবে, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় গণমাধ্যম বিকাশে সরকারেরও একটি ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানাভাবে সহযোগিতা ও উদ্দীপনা দিয়ে চলেছে। কাজেই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের বহুমুখী সহযোগিতা কোনোভাবেই গণমাধ্যমের স্বকীয়তা বিনষ্ট করবে বলে আমি মনে করি না। তবে তথ্যের বিভ্রান্তি বা অপতথ্য প্রকাশের ব্যাপারে গণমাধ্যমের অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, কোনো স্বাধীনতাই নিরঙ্কুশ নয়। স্বাধীনতার সঙ্গেই দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। স্বাধীন সাংবাদিকতার অর্থই হচ্ছে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতায় অপতথ্যের কোনো স্থান নেই। অপতথ্য অপসাংবাদিকতারই জন্ম দেয়। একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণের সময়ে প্রতিনিয়ত আমাদের এই বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে।

আমরা লক্ষ করেছি, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন গঠন, মোবাইল টেলিফোন অপারেটরের মনোপলি ভেঙে সাধারণ মানুষের হাতে সুলভে মোবাইল ফোন পৌঁছে দেওয়া, সারা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো নির্মাণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যকেন্দ্র, সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্তি ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে তথ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার যে প্রত্যয় নিয়ে শেখ হাসিনা এগিয়ে চলেছেন, তাতে তাঁকে আমরা প্রকৃত অর্থে তথ্যকন্যা কিংবা তথ্য-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করতে পারি। শেখ হাসিনা প্রশাসনের সময়কালে গণমাধ্যমের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটবে– এটিই আমাদের প্রত্যাশা। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়– তাঁর ওপর আস্থা রেখে আমি এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

এই করোনা সংকটে সব জায়গাতেই আমাদের কিছু না কিছু কাটছাঁট করতে হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেতে পারছে না শ্রেণিকক্ষে। এই ধরনের বাস্তবতায় সর্বক্ষেত্রেই কাটছাঁটের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের সর্বত্র নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। সেটা কিন্তু গণমাধ্যম যাতে সচল থাকে, সক্রিয় থাকে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, সে লক্ষ্যেই। এখন এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে। গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব আছে। গণমাধ্যম কেবল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। গণমাধ্যম মূলত তথ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সরকার যেভাবে এগিয়ে এসেছে, সেভাবে তারাও যদি এগিয়ে আসে, সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় স্বাধীন গণমাধ্যম স্বাধীনভাবেই এই করোনাকালীন তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। আমরা লক্ষ করছি, আমাদের বেশির ভাগ গণমাধ্যমই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সংবাদ পরিবেশন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েই আমাদের সাংবাদিকরা রিপোর্ট করেছেন, প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। ঝুঁকির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতিবেদন।

বেশ কয়েকজন সাহসী সাংবাদিক ইতোমধ্যে করোনা-আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তারা মারা গেছেন সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে। চিকিৎসকরা যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছেন, ঠিক তেমনি সাংবাদিকরা করোনা মহামারি প্রতিরোধে তথ্যসেবা দিয়ে মূলত সমাজের চিকিৎসক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন। এই পুরো করোনা সংকটের তথ্য অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন সাংবাদিকরা। সংযোগ স্থাপন করেছেন জনসাধারণের মধ্যে। এই মহামারিতে ডাক্তারাও যেমন জীবন দিয়েছেন, তেমনই আমাদের সাংবাদিকরাও জীবন দিয়েছেন। জীবন দিয়েছেন আমাদের পুলিশবাহিনীর সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সঠিক নির্ভরযোগ্য সংবাদই সংকটকালে প্রত্যাশা

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান
শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার

করোনাকালীন এই সংকট, এই অভিজ্ঞতা আগে কখনোই ছিল না আমাদের দেশের মানুষের। শতবছরে হয়তো এক-দুইবার এ রকম সংকটের মুখোমুখি হতে হয় পৃথিবীর মানুষকে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। পৃথিবীর অন্য ২১৫টি দেশের মতো আমাদের দেশেও জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত সবই বন্ধ। সবকিছুতেই বাড়ছে ক্ষতির অঙ্ক। লকডাউনের কারণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গৃহান্তরিন হয়ে আছে সবাই। অর্থনীতির ওপর বড়ো ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মানসিক, সামাজিক চাপও রয়েছে কমবেশি। যেন চারপাশে একটা দুর্বিষহ অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের গণমাধ্যমগুলো পড়েছে শঙ্কায়। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো সাময়িক সংকটে পড়েছে।

“লকডাউনের কারণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গৃহান্তরিন হয়ে আছে সবাই। অর্থনীতির ওপর বড়ো ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মানসিক, সামাজিক চাপও রয়েছে কমবেশি। যেন চারপাশে একটা দুর্বিষহ অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের গণমাধ্যমগুলো পড়েছে শঙ্কায়”

গণমাধ্যম বলতে বিশেষ করে মূলধারার সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিয়ো ইত্যাদি। সব মূলধারার গণমাধ্যমই তাদের সাংবাদিক, কর্মীদের সীমিত কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তাদের স্পটে কিংবা, সরেজমিনে রিপোর্ট করতে হয় তুলনামূলক কম। অফিস

আওয়ার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, কম সময় ব্যয় করে তারা বাড়ি থেকে অনলাইনে সাংবাদিকতা করছেন। তাতে যা হচ্ছে, বাস্তবতা থেকে সাংবাদিকরা অনেকটা দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করছেন। এ কথাটা আমি এজন্য বলছি যে, তারা সঠিক তথ্যনির্ভর কোনোরকমে কাজ করতে পারছেন। তারা মন খুলে, ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে যে রিপোর্ট করা, সেটা পারছেন না। একই সঙ্গে মিডিয়ায় পলিসিগত নানা ধরনের ফ্যাক্টরও কাজ করছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিক ছাঁটাই করা হয়েছে, বেতন বন্ধ করেছে, বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। এতে সাংবাদিকতা, গণমাধ্যমের সার্বিক বা স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি ব্যাহত হচ্ছে। মহামারির এই সময়ে গণমাধ্যমের পাঠক বা দর্শক আশা করেন, এই করোনাকালীন সংকটে গণমাধ্যমগুলো আরও বেশি তথ্যসেবা দেবে। সেই জায়গাটাতে আমার মনে হচ্ছে, এই সংকটে সাধারণ জনগণের যে ধরনের তথ্যসেবা পাওয়া জরুরি, তা তারা পাচ্ছেন না। অনেকেই করোনা-আক্রান্ত হচ্ছেন, আক্রান্ত হলে কী করবেন, কী ব্যবস্থা নেবেন, চিকিৎসা কোথায় করাবেন? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা সহায়তা চাচ্ছেন। যখন জনজীবন, যোগাযোগব্যবস্থা স্থির, তখন গণমাধ্যমের প্রতি নির্ভরশীলতা যায় বহুগুণ বেড়ে। সাধারণ জনগণ এসব তথ্যসেবা গণমাধ্যমের কাছে আশা করেন। গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ত্বরিতগতিতে প্রদানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। এই সময়ে আমাদের জনগণ যেভাবে তথ্য প্রত্যাশা করেছেন বা প্রয়োজন মনে করেছেন, সেভাবে তথ্যগুলো তারা পাননি কিংবা পাওয়ার সুযোগ হয়নি। প্রত্যাশা অনুযায়ী গণমাধ্যম তা সাপ্লাই দিতে পারেনি।

মূলধারার গণমাধ্যম কিংবা সংবাদপত্রও এ কাজগুলো সেভাবে করতে পারেনি। যেমন– আগে হরতাল হলে বা রাজনৈতিক কোনো ঘটনা ঘটলে সারাদিন আমাদের সাংবাদিকরা তা কাভার করেছেন, ছবি তুলেছেন, অথচ আজ যখন সারাবিশ্ব কার্যত অচল, অচেনা ক্ষুদ্র এক ভাইরাস মানুষের মৃত্যুর কারণ, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই– সেখানে কিন্তু সাংবাদিকরা সেরকম গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি সচেতনভাবে উপলব্ধি করেননি। এই জায়গায় তাদের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। হরতাল কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগে মিডিয়া যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিবেদিতভাবে কাজ করে, করোনাকালীন গণমাধ্যমকে আমরা সেভাবে পাইনি। এক্ষেত্রে মিডিয়া ফেল করেছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে– কোনো কোনো মিডিয়া আবার অপ্রয়োজনীয় তথ্য ব্যাপকভাবে সরবরাহ করেছে। এতে অনেক ভুল তথ্য এসেছে। অথেনটিক নয়, এজাতীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বা খবরাখবর বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া অথেনটিসিটি বা নির্ভরযোগ্যতাহীন প্রচুর সংবাদ-তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। যেগুলোয় মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করেছে। কেউ কেউ প্রতারিতও হয়েছেন। তথ্যপ্রবাহটা হতে হবে যথাযথ অর্থাৎ থাকতে হবে তথ্যের সঠিকতা, পরিমিতিবোধ এবং পরিমিতভাবে উপস্থাপন। সেই জায়গায় আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আবার এটাও ঠিক পত্রপত্রিকার সার্কুলেশন বা বিলিবণ্টন পড়েছিল সীমাবদ্ধতার মধ্যে। যে কারণে অনেক মানুষ সঠিকভাবে তথ্য পায়নি। একই সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব ছিল সঠিকভাবে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে জনগণের কাছে তুলে ধরা। এই জায়গায় আমাদের গণমাধ্যমের আরও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই জায়গাটাতে কাজ করার এখনো সময় রয়েছে। এখনো মানুষ করোনা সংক্রমিত হচ্ছে। আর কতদিন চলবে, তা আমরা জানি না। এখনো প্রচুর লোকজন মারা যাচ্ছে করোনার থাবায়। তাই গণমাধ্যমকর্মীদের এখনো সুযোগ রয়েছে সঠিক, পরিমিত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করার। মাঝেমধ্যে আমরা দেখি তথ্যের বহুলতা বা বাহুল্য। বাহুল্য এই অর্থে যে, অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভিড়। এ বাহুল্য পরিহার করতে হবে। যে যেভাবে পারে তা-ই পরিবেশন করে, এটা যেন না হয়। সুতরাং এখন তাদের নতুন করে কাজ করা উচিত। পাঠক-দর্শক যাতে তাদের প্রচারিত তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করে এবং আমলে নেয়– এসব দিক মাথায় রেখে গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে কিংবা স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা হয়েছে, সেগুলোয় সীমাবদ্ধতা ছিল। এগুলো বিস্তারিত ছিল না। অনেক সময় সাংবাদিক সেসব বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর করতে পারেননি। এগুলো হয়েছে একমুখী যোগাযোগ।

অথেনটিক নয়, এজাতীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বা খবরাখবর বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া অথেনটিসিটি বা নির্ভরযোগ্যতাহীন প্রচুর সংবাদ-তথ্য পরিবেশিত হয়েছে

কখনো অনলাইনে কার্যক্রম চলেছে, সেখানে প্রশ্ন-উত্তরপর্ব বা বিস্তারিত জানার সুযোগ সাংবাদিকদের ছিল না। সেক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে এগোয়নি। করোনাকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য বিভাগ, হাসপাতাল– এসব জায়গা থেকে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা প্রয়োজন। মহামারির এই সময়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে সাংবাদিকদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ থাকতে হবে। এই সুযোগ পেলে সাংবাদিক অবশ্যই সঠিকভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবেন। পারবেন সঠিক সংবাদ উপস্থাপন করতে।

অতিমারিতে প্রিন্ট মিডিয়ার সংকট ও উত্তরণ

আবেদ খান
সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ; চেয়ারম্যান পরিচালনা বোর্ড, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

করোনার থাবায় বিপর্যস্ত পৃথিবী এক দুঃসময় পার করছে। কোভিড-১৯-এর সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তালমিলিয়ে আমরাও এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। সামাজিক, অর্থনৈতিক– প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্ব এখন ধসের মুখোমুখি। গণমাধ্যমও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে মূলধারার গণমাধ্যমের মধ্যে মুদ্রণমাধ্যম পড়েছে ব্যাপক সংকটে।

পৃথিবীতে যখনই রাষ্ট্রীয় সংঘাত কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে, তখন আক্রান্ত হয় প্রিন্ট মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়া এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এর সঙ্গে নীতিগত বিষয় থেকে শুরু করে মানুষ, যন্ত্র, অনেক কিছুই জড়িত– কাজেই এটা আক্রান্ত হবেই। যেমন আক্রান্ত হয়েছিল যুদ্ধের সময়। কোভিডের ব্যাপারটি ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কিত এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নির্ভর। আর মুদ্রিত সংবাদপত্র যতক্ষণ না মানুষের হাতে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সংগত কারণেই অতিমারির এই মুহূর্তে প্রিন্ট মিডিয়া সংকটে পড়বেই।

“মুদ্রিত সংবাদপত্র যতক্ষণ না মানুষের হাতে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সংগত কারণেই অতিমারির এই মুহূর্তে প্রিন্ট মিডিয়া সংকটে পড়বেই”

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসনের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ধরে রাখে সংবাদপত্র। যুগে যুগে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় উত্থানপতন, সৃষ্টি, ধ্বংস, যুদ্ধ– সব ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সাংবাদিকরা। আড়াই শ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের সংবাদপত্র সম্পর্কে একটা বিখ্যাত উক্তি হলো, 'আমাকে যদি সংবাদপত্রবিহীন সরকার ও সরকারবিহীন সংবাদপত্র এর একটিকে বেছে নিতে হয়, তাবে দ্বিতীয়টি বেছে নিতে আমি একমুহূর্ত দ্বিধা করব না।' সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে, প্রযুক্তি এগিয়েছে, তারপরও সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই সংবাদপত্রের প্রয়োজন রয়েছে সব সময়।

এমনিতেই বর্তমান অবস্থায় প্রযুক্তিগত কারণে প্রিন্ট মিডিয়া আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। সংবাদপত্র থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের যুগে অনলাইন নিউজ পোর্টালের কারণে প্রিন্ট মিডিয়া মুখোমুখি এককথায়– অগ্নিপরীক্ষার। করোনার আগেই পশ্চিমা দুনিয়ার মূলধারার প্রিন্ট মিডিয়া বা সংবাদপত্র বড়ো ধাক্কা খেয়েছে অনলাইন সাংবাদিকতার সঙ্গে পাঠকের ইন্টারনেটে সংবাদপত্র পাঠ করার সুবাদে। আর এখন করোনাকালীন পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রিন্ট মিডিয়ার লড়াইকে কঠিনই করেনি, ঠেলে দিয়েছে অস্তিত্ব রক্ষা বা টিকে থাকার যুদ্ধে। আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়ছে এবং তা বেড়ে চলেছে। করোনাকালে লকডাউন শুরুর কঠিন দুঃসময়ে, পত্রিকার মাধ্যমে করোনা ছড়ায়– পাঠকের মনে এমন অহেতুক ভীতি তৈরি হওয়ার কারণে তারা পত্রিকা স্পর্শ করতে চাইতেন না। যা বড়ো আঘাত হেনেছে পত্রিকার সার্কুলেশনে। অনলাইন পোর্টাল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে অনেক দেশে প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অনলাইন পোর্টাল থেকে মানুষ আজকাল মোবাইল আপডেট পাচ্ছে। সুতরাং প্রিন্ট মিডিয়ার টিকে থাকা অনেক চ্যালেঞ্জের। শোনা যাচ্ছে– সংবাদপত্রের সময় শেষ হয়ে আসছে, সামনে অনলাইনের যুগ। তবে এখনো অনেক মানুষ সংবাদপত্রের প্রতিই আসক্ত। অনেকেই নিউজ পোর্টালের নিউজ পড়ে, টিভির খবর দেখেও কাগজেই পুরোটা পড়ার তৃপ্তি রাখেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও অনলাইন নন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী। পুরোটাই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।

এ ছাড়াও মানুষের ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়েও প্রিন্ট মিডিয়া এখনো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। একটা জিনিসের সামাজিক অবস্থা, তারতম্যে বিভিন্ন পরিস্থিতি আছে কিংবা বিশ্ব পরিস্থিতির পাশাপাশি মানুষের মনোজগতের যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়া নানাভাবে এফেকটেড হয় আবার ঘুরেও দাঁড়ায়। মানুষের পছন্দের ব্যাপারটায় তারতম্য ঘটে। বৃদ্ধের হাতে প্রিন্ট মিডিয়া আর তরুণ বা নবযৌবনপ্রাপ্ত কোনো নারী কিংবা পুরুষের হাতে একটা ল্যাপটপ বা অগ্রসরমান প্রযুক্তি। জিনিসটা ঘটে আসছে ঠিক এভাবে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে যে আকর্ষণ আছে, সে বিষয়গুলোয় প্রিন্ট মিডিয়া আর্কষণ তৈরি করতে পারছে না। নানাভাবে চেষ্টা করছে এবং এটা ব্যয়সাধ্যও। এসব কারণে প্রিন্ট মিডিয়া পিছিয়ে পড়ছে। তার মধ্যে এই ধরনের মহামারি কিংবা অতিমারি বা বিপর্যয়! তারপরও আমরা আশাবাদী এই কারণে যে, দিনের শেষে প্রিন্ট মিডিয়ার একটা আলাদা আর্কাইভ ভ্যালু রয়েছে। আজ না হোক, ভবিষ্যতে বহুস্তরে যেটার একটা পণ্যমূল্য থাকবে। যেমন– আজ রবীন্দ্রনাথ কিংবা শেকসপিয়ারের হাতের লেখার অন্যরকম মূল্য রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার বিকল্প নেই। অনেক সময় সংকট কিন্তু নতুন সমাধানের দরজা খুলে দেয়। আগে থেকেই সমস্যায় জর্জরিত প্রিন্ট মিডিয়ার পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে এই মহামারি। বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো অস্তিত্ব রক্ষার্থে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে প্রিন্ট মিডিয়া সংশ্লিষ্টদের। চিন্তাধারাকে পাঠকের চাহিদা মোতাবেক নতুনভাবে প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট মিডিয়া সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে পত্রিকাকে প্রয়োজনানুসারে তৈরি করা যায় আরও ভালো করে। বেশি করে তুলে ধরতে হবে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ।

এর আগেও প্রিন্ট মিডিয়া বিভিন্ন সময় বিপদের মুখোমুখি পড়েছে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেছে সামনে। মিডিয়া-জগৎ সব সময় বদলায়। মিডিয়া গ্রাহকরা সবকিছু গলাধঃকরণ করেন। প্রতিমুহূর্তে তাদের নতুন বিষয়বস্তুর প্রয়োজন হয়। তাই মুদ্রণমাধ্যমকে তার পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক এবং বিষয়বস্তুর ওপর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সেভাবে পরিচালিত করতে হবে।

এই করোনাকালীন প্রিন্ট মিডিয়ায় কমে গেছে বিজ্ঞাপন। সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন বিষয় দুটি হচ্ছে ইন্টাররিলেটেড। কোন পত্রিকা কত বিজ্ঞাপন পাবে, তা নির্ভর করে সার্কুলেশন এবং পত্রিকার মার্কেটিং পলিসির ওপর। একই প্রোডাক্ট বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে দেখে। আবার বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এটার মূল্যয়ানও করে। সাধারণত মুদ্রণমাধ্যম চলে বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশনে। সেখানে সার্কুলেশন প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। বিজ্ঞাপনও আসছে না। এ অবস্থায় মুদ্রণমাধ্যম সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটা খাত বলে আমি মনে করছি। এখানে জড়িয়ে আছে অনেক সংবাদকর্মীর জীবন-জীবিকা। মহামারির এই সময়ে অনেক সংবাদপত্র অফিসে সংবাদকর্মীদের বেতন বন্ধ আছে, কর্মী ছাঁটাই হয়েছে, অনেককে আবার বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই দুঃসময়ে যা কাম্য নয়। সমাজের স্বার্থে, গণমানুষের স্বার্থেই গণমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ সময়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে গণমাধ্যমকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলা কোনোভাবেই উচিত নয়। কারণ, মহামারি ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি সঠিক তথ্যপ্রবাহ। করোনাকালীন পৃথিবীর গতি যখন স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের সংবাদকর্মীরা তখন প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন। অনেক সাংবাদিক মারা গেছেন। আমাদের মহান স্বাধীনতাসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধসহ গণতান্ত্রিক সব সংগ্রামে সাংবাদিকদের যে সাহসী ভূমিকা, সংবাদপত্রের যে অবদান, তা স্মরণীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মিডিয়াবান্ধব।

করোনা বা এই ধরনের অতিমারি যখন পৃথিবীতে আসে, সাজানো অনেক কিছুই ভেঙে পড়ে। তছনছ হয়ে যায় চেনা চারপাশ। তারপরও মানুষ কিন্তু পরাজিত হয় না, যেমনটা হেমিংওয়ে বলেছেন 'But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.' এটাই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য যে, মানুষ কিন্তু হারবে না, হয়তো সাময়িকভাবে ভেতর থেকে ভেঙে যায়। ভেঙে আবার ভেতর থেকেই নতুন করে গড়ে ওঠে নতুন প্রতিভা, নতুন শক্তি ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। প্রিন্ট মিডিয়াও সংকট কাটিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে, নতুন সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতায় নতুন করে পথ তৈরি করে নেবে।

আমি বিশ্বাস করি, একসময় কোভিডের আক্রমণ, ভয়ংকর এ বিপর্যয় কেটে যাবে। মানুষ আবার নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে জীবনযাপন করবে। আর আমাদের প্রিন্ট মিডিয়াও আলোর মুখ দেখবে নতুনভাবে।

মহামারি সাংবাদিকদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সামনে এনেছে নতুন করে

তাসমিমা হোসেন
সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক এবং সম্পাদক ও প্রকাশক, পাক্ষিক অনন্যা

আমার লেখার বিষয় হচ্ছে 'করোনাভাইরাস বা এ জাতীয় মহামারিতে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কতটা'। এ নিয়ে আলোচনা করতে হলে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব ও ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকাতেই হবে। সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন তথা সাংবাদিকতা কোনো নতুন বিষয় নয়। জ্ঞাত ইতিহাসে প্রাচীন রোমে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯ সালে প্রথম সংবাদ-গেজেট প্রকাশিত হয়েছিল। তখন মূলত রাজন্যবর্গের প্রয়োজনেই, অর্থাৎ রোমান সম্রাটের ডিক্রি জনগণকে জানাতে এবং জনগণের সংবাদ রাজন্যবর্গকে অবহিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই এই সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন বিস্তার ও বিকাশ লাভ করতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যে যা কেবল রাজন্যবর্গের সীমিত প্রয়োজনে শুরু হয়, সেটাই আরও বিকশিত হয় চিনের টাঙ রাজবংশের (৬১৮-৯০৭) হাত ধরে। তারা এই সংবাদ প্রচার বিষয়টিকে আরও বিকশিত করে শিল্প-সাহিত্য ও সামাজিক বিষয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। লক্ষণীয়, সেই সময় থেকেই সংবাদমাধ্যমের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন মনোযোগ বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে প্রজাসাধারণের তথা জনগণেরও।

> "পৃথিবী যত আধুনিক হয়েছে, সাধারণ জনগণের অধিকার যত সামনে উঠে এসেছে, সংবাদমাধ্যমও ততই বিকশিত হয়েছে। বেড়েছে সংবাদের আওতা। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, প্রকৃতি, ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউনা, মহাকাশ– কোনো কিছুই এখন আর সংবাদের বাইরে নয়"

পৃথিবী যত আধুনিক হয়েছে, সাধারণ জনগণের অধিকার যত সামনে উঠে এসেছে, সংবাদমাধ্যমও ততই বিকশিত হয়েছে। বেড়েছে সংবাদের আওতা। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, প্রকৃতি, ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউনা, মহাকাশ– কোনো কিছুই এখন আর সংবাদের বাইরে নয়। আর এই প্রযুক্তিবিপ্লবের সময় এসে সংবাদমাধম্যও হয়ে উঠেছে একদিকে প্রযুক্তিনির্ভর, অন্যদিকে বিস্ময়কর রকমের শক্তিশালী। সংবাদপত্রের পাশাপাশি ম্যাগাজিন, রেডিয়ো, টেলিভিশন, বই, ব্লগ, ওয়েবকাস্ট, পডকাস্ট, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইমেইল– সবকিছুই ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ও সংবাদের মাধ্যম হয়ে গিয়েছে। বদলে গেছে মানুষের জীবনাচার। সহজ করে বললে– একজন অতি সাধারণ মানুষও এখন অন্যান্য সংবাদের পাশাপাশি আবহাওয়া পরিস্থিতি জেনে তার সারাদিনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে যায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো একজন সাধারণ মানুষ। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এখন আর বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। একজন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী যে কোনো বিষয়ে একটি টুইট করে দেন; সেটাই তার বিবৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সেটার ওপর নির্ভর করেই রচিত হয় বিশ্লেষণ ও সংবাদ।

এমন একটি যুগে এসে আমরা গোটা বিশ্ব পড়েছি এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ধনী-দরিদ্র, উঁচুনিচু কেউ এই বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত নই। আর এই মহাবিপর্যয়ে সংবাদমাধ্যমকেই রাখতে হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই বিপর্যয় গোটা মানবসমাজের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর চিনের উহান প্রদেশে যে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়, তা মুহূর্তে চীন অতিক্রম করে প্রথমে ইউরোপে এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দেশে দেশে হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পৃথিবীতে কয়েক লাখ মানুষ মারা গেছেন, আরও কতজন আক্রান্ত হবেন, মারা যাবেন, তা এখনো কারও জানা নেই। আমি যখন এ লেখা লিখছি, তখন পর্যন্ত এ রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিকার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়নি। যদিও আমরা আশা করছি, কেউ না কেউ, কোনো না কোনো দেশ হয়তো অতি দ্রুতই সফলভাবে ভ্যাকসিন-টিকা আবিষ্কার করে ফেলবে।

দেশে দেশে চলছে লকডাউন। বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়েছে কুঠারাঘাত। একটি বিষয় সবার কাছে পরিষ্কার– এ রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে, মুক্ত থাকতে, জীবন বাঁচাতে সচেতন থাকার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং মানুষের এই সচেতনতার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আজ আমার দেশের একজন সম্পূর্ণ শিক্ষাবঞ্চিত, হতদরিদ্র মানুষের মুখেও শুনতে পাওয়া যায়, কোভিড-১৯ কোয়ারেন্টিন, লকডাউন, প্যানডেমিক, মাস্ক, আইসিইউ, ভেন্টিলেটর এসব শব্দ– যেগুলোর সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না। নিঃসন্দেহে এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে সংবাদমাধ্যম।

যারা পেশা হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন, তাদের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই স্পর্শকাতর। কোনো ভুল সংবাদ যদি তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়, কোনো গুজব যদি তাদের হাত দিয়ে উঠে আসে, তাহলে যে কোনো জনপদ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, যারা পেশা হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন, তাদের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই স্পর্শকাতর। কোনো ভুল সংবাদ যদি তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়, কোনো গুজব যদি তাদের হাত দিয়ে উঠে আসে, তাহলে যে কোনো জনপদ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাদের সংবাদের ভিত্তিতে এক দেশ যদি আরেক দেশ সম্পর্কে ভুল মেসেজ পায়, তাহলেও এই কোভিডকালের অর্থনীতিতে, টিকা-ভ্যাকসিন সরবরাহে, স্বাস্থ্য সহায়তা নিয়ে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

সুতরাং আমি জোর দিয়ে বলব, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রথম কথা হলো– স্পর্শকাতর এই রোগ সম্পর্কে, সংক্রমণ সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে অবশ্যই। তাদের অবশ্যই জানতে হবে হোম কোয়ারেন্টিন এবং আইসোলেশন সম্পর্কে, জানতে হবে ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে, জানতে হবে এ সংক্রান্ত সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও নীতিমালা সম্পর্কে, জনগণের মধ্যে এর প্রভাব সম্পর্কে। আর অবশ্যই জানতে হবে রোগটির চরিত্র ও ধরন সম্পর্কে। এবং এই ধারণা গ্রহণ করা দরকার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে। ভাইরোলজিস্ট, প্যানডেমিক এক্সপার্ট দ্বারা হওয়া প্রয়োজন সেই প্রশিক্ষণ। সাংবাদিকদের এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা উচিত রাষ্ট্রের অথবা কর্মরত প্রতিষ্ঠানের। বাংলাদেশে যদিও কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হচ্ছে; কিন্ত তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ব্যাপক প্রশিক্ষণ দরকার বলে আমি মনে করি। সেই সঙ্গে অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলব, সাংবাদিকতার জন্য এখন এটি একটি unprecedented challenge. ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএনডিপি এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলো অনলাইন কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। আমি মনে করি, এই আন্তর্জাতিক কোর্সগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংবাদমাধ্যম ও সরকারের উদ্যোগ নিয়ে যুক্ত হওয়া উচিত। এই সুযোগগুলো আমাদের এখন আছে। ১৯২০ সালে যখন স্প্যানিশ ফ্লু মহামারি আকারে দেখা দিয়েছিল, তখন আন্তর্জাতিকভাবে এমন সংঘবদ্ধভাবে রোগ মোকাবিলার সুযোগ ছিল না প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে। এখন যখন সুযোগ আছে, এই সুযোগ ও প্রশিক্ষণজ্ঞান আমরা কেন গ্রহণ করব না?

করোনাকালীন চ্যালেঞ্জ এবং সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা

সাইফুল আলম
সম্পাদক, যুগান্তর ও সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

‘মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মানুষ মৃত্যুকে ভুলে থাকে’– এটাই আশ্চর্য, তবে বাস্তবতা। করোনাকাল পৃথিবীব্যাপী মানুষকে দুটি সত্যই মর্মে মর্মে স্মরণ করিয়ে দিল। এমনিতেই দুর্যোগে, দুঃসময়ে মানুষকে মানবিকতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সেই পরীক্ষায় ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়। করোনা মহামারি শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা মানবসভ্যতাকে মানবতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে দিয়েছে। স্বেচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নয়– মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার নিজের একান্ত নৈতিকতার মুখোমুখি। সে পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়েছেন। অনেকেই হননি। আমাদের এই ছোট্ট দেশটিতেই আমরা দেখেছি মানুষের বিচিত্র আচরণ। আপন সন্তান অশীতিপর বৃদ্ধা অসুস্থ জননীকে করোনা-আক্রান্ত ভেবে ফেলে গেছে রাস্তায়! আবার সেই অসুস্থ জননীকেই সরকারি কর্মকর্তা ইউএনও রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন– ডাক্তাররা জানিয়েছেন, বৃদ্ধা অসুস্থ; কিন্তু করোনা-আক্রান্ত নন। দেখেছি, আত্মীয়স্বজন করোনায় মৃত লাশ এলাকায় ঢুকতে দেননি। করোনায় মৃত বাবার মুখাগ্নি করেননি সন্তানরা। মুখাগ্নি করতে হয়েছে সরকারি

“করোনা মহামারি শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা মানবসভ্যতাকে মানবতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে দিয়েছে। স্বেচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নয়– মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার নিজের একান্ত নৈতিকতার মুখোমুখি”

কর্মকর্তা ইউএনওকেই। করোনা-আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে যে ডাক্তার দম্পতি নিজেরাই করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন, তাদেরকে বাড়িওয়ালা এবং বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করার জন্য চড়াও হয়েছে। শেষে তা ঠেকাতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

সত্য এমনই কঠিন! এমন 'কঠিনেরে' স্বয়ং রবিঠাকুরও 'ভালোবাসতে' পারতেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করা যায় নিঃসন্দেহে।

২.

করোনার উপর্যুক্ত উদাহরণ সত্ত্বেও এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে– মানবিকতার পরীক্ষায় আমরা বাঙালিরা উত্তীর্ণও হয়েছি। উপর্যুক্ত নিষ্ঠুরতার উলটো পিঠও আছে এবং সত্যি কথা বলতে কী– সেই মানবিকতার পিঠই বেশি সাহসের, বেশি আশাজাগানিয়া। আমরা দেখেছি করোনা-আক্রান্ত রোগীদের অক্লান্ত সেবা দিতে গিয়ে শতাধিক ডাক্তার মারা গেছেন করোনায়। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার যে ছুটির ঘোষণা দেয়, এই ছুটির কারণে কর্মহীন মানুষের ঘরে ঘরে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে গিয়ে অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আর্মিসহ স্বেচ্ছাব্রতীরা অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন আবার সেরেও উঠেছেন। অনেকে শহিদের মর্যাদায় মারা গেছেন।

করোনায় মৃতদের দাফনে স্বজনরা ভয় পেয়ে কাছে না এলেও সারাদেশে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনসহ অনেক স্বেচ্ছাব্রতী সাহসীরা এগিয়ে এসেছেন। তারা আমাদের মানবতার পতাকাকে উড্ডীন রেখেছেন সগৌরবে।

৩.

করোনা মহামারি এক সর্বাত্মক যুদ্ধ বটে। সে যুদ্ধ– 'অদৃশ্য শত্রু'র সঙ্গে। যার বিরুদ্ধে অস্ত্র, অর্থ, শক্তি– সবকিছুই অর্থহীন, অকার্যকর। এমনকি যার নেই প্রতিষেধকও! এমন একটি ভয়ংকর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা এখনো সময় অতিক্রম করছি। যাকে বলে অসম যুদ্ধ– সেই যুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে– সম্বল একমাত্র মানবতা।

আমি বলব, মানবতার সে পরীক্ষায় জাতি হিসেবে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। আমরা যেমন অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি, তেমনই যাদের প্রয়োজন তাদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছি করোনাকালীন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও অন্যান্য সামগ্রী।

করোনাকালীন এই চ্যালেঞ্জে বিশ্বব্যাপী পিছিয়ে থাকেননি সাংবাদিকরা। বাংলাদেশেও সাহসী এবং মানবিকতার আখ্যান রচনা করেছে সাংবাদিক সমাজ

৪.

করোনাকালীন এই চ্যালেঞ্জে বিশ্বব্যাপী পিছিয়ে থাকেননি সাংবাদিকরা। বাংলাদেশেও সাহসী এবং মানবিকতার আখ্যান রচনা করেছে সাংবাদিক সমাজ। তারা যেমন মানবিকতা, অমানবিকতার খবরগুলো তুলে ধরেছেন, তেমনই উন্মোচন করেছেন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির বিষয়গুলোও। করোনার সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশনার কাজে অতন্দ্রপ্রহরীরূপে দাঁড়িয়েছিল সাংবাদিক সমাজ। তাদের অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন– মারাও গেছেন অনেকে। সেদিক থেকে বলা যায়, করোনাকালীন এই যুদ্ধ এখনো চলমান। বলা যায়, এখন আরও বেশি ঝুঁকি নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাঁদের।

৫.

করোনা থামিয়ে দিয়েছিল পুরো পৃথিবীর গতি, স্পন্দন। বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ডসহ মহল্লার রিকশাওয়ালা পর্যন্ত চাকা বন্ধ করে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এক গতিহীন পৃথিবীর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা।

এই থমকে থাকা, থামিয়ে রাখা পৃথিবীতেও সাংবাদিকদের সর্বত্র সচল থাকতে হয়েছে। সক্রিয় থাকতে হয়েছে, সজাগ দৃষ্টি থাকতে হয়েছে। অন্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে দায়িত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে আমাদের দেশের সাংবাদিক সমাজ।

প্রায় অবরুদ্ধ বাস্তবতায় বাংলাদেশের সাংবাদিকরা থেমে যেতে দেননি সংবাদপত্রকে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে অব্যাহত রেখেছেন সংবাদপত্রের প্রকাশনা। দেশের মানুষের অবাধ তথ্য পাওয়ার অধিকার। এ সময় তারা প্রযুক্তির সহায়তায় ঘরে থেকে অনলাইনে কার্যসম্পাদন করেছেন। পালাক্রমে অফিসে উপস্থিত থেকেছেন। কঠোরভাবে মেনে চলেছেন করোনার স্বাস্থ্যবিধি। করোনা দুর্যোগকালে তারা নিরাপদে চলাফেরা পোশাক-আশাক, মাস্ক ব্যবহার– এসবের মডেলও হয়ে উঠেছিলেন যেন। সর্বোপরি মানুষের মনে আশা ও

আস্থা জাগিয়ে রেখেছেন নিরন্তর। যে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল সবার মনে, তা দূর করার কাজে সাংবাদিকদের কলম, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের স্ক্রিন সব সময় সাহস জুগিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছে মানবিকতাকে এবং সচল রাখতে ভূমিকা রেখেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে। যার ফলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারছে দেশ।

৬.

অন্য যে কোনো পেশার তুলনায় 'সাংবাদিকতা' ভিন্নমাত্রার। বলা যায়, সাংবাদিকতা একটা ডিপ-রুটেড পেশার নাম। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে এক অলিখিত অন্তর্জালে আবদ্ধ (এই 'অন্তর্জাল' শব্দের অর্থ 'ইন্টারনেট' নয়! এই 'অন্তর্জাল' হচ্ছে মানবিক বোধের!) সাংবাদিকরা। মুচি-মেথর থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তার গতায়াত। উপরে দৃষ্টিপাত করলে যে পেশাকে মনে হয় নিষ্ঠুর; কিন্তু সেই পেশার অন্তরে প্রবাহিত মানবিকতার ঝরনাধারা। যে সাংবাদিকের ভেতর এই ঝরনাধারা, নেই তিনি উপর্যুক্ত অন্তর্জালের মানবিক বোধের বাইরের মানুষ। কারণ প্রকৃত সংবাদ তার কাছে অধরা।

৭.

করোনা পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অনেক কিছুরই খোলনলচে পালটে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দেবে। পরিবর্তিত এই বিশ্ব বাস্তবতার সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশার নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং হবে– এটাই সত্য।

আজতক সভ্যতাকে 'বিবর্তনের সভ্যতা' ভাবা হয়– যেখানে যোগ্যরা টিকে থাকে, অযোগ্যরা হারিয়ে যায়। কিন্তু করোনা বোধকরি সেসব ব্যাখ্যাকে পালটে দিয়েছে। দৃশ্যমান প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে যে মানুষ এগিয়েছে, এখন 'অদৃশ্য শত্রুর' সঙ্গে যুদ্ধে সে মানুষকে যেমন সাবধান হতে হচ্ছে নিজের নিরাপত্তা নিজেকে নিশ্চিত করার জন্য, একই সঙ্গে সেই নিশ্চিতকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকছে তার স্বজন-প্রতিবেশী, পরিপার্শ্বের নিরাপত্তাও। তাই প্রকৃতিকে সংহার ও ধ্বংস, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা– এটা আর এ যুগের 'যোগ্যতা' নয়। এখনকার 'যোগ্যতা' প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় এবং সহাবস্থান। নিজের কল্যাণ চাইলে প্রকৃতির কল্যাণসাধন করতে হবে। কেননা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মঙ্গলচেতনার বিষয়টি।

৮.

করোনাকালে সবচেয়ে আলোচিত যে দুটি শব্দের অর্থ পালটে গেছে তা হচ্ছে– 'পজিটিভ' ও 'নেগেটিভ'। সত্যি কথা বলতে কী, শব্দ দুটি সভ্যতার বাঁকবদলেরও সাক্ষী হয়ে থাকবে। চিরকালের 'পজিটিভ' শব্দটি যেন এখন 'অপরাধী' হয়ে গেছে। আর চিরকালের অপ্রিয় শব্দটি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আদরণীয়, প্রিয় অধিক প্রিয়! তাই করোনাকালীন পরিবর্তিত বিশ্ববাস্তবতাকে প্রচলিত নানা শব্দ ও সংজ্ঞায় আর ব্যাখ্যা করা যাবে না। সূত্রবদ্ধ সূত্রগুলোকেও পালটাতে হবে বোধকরি। যেমন– নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিক কৌশিক বসু বলেছেন, 'ধনীরা ভাবে তারা অর্থনীতি চালায়, আসলে অর্থনীতি চালায় গরিবরা।' অর্থাৎ, সময় যেন এখন উলটে দেওয়া বালুঘড়ি। আমরা মনে করি, ধনী-গরিব সবাই মিলেই শুধু অর্থনীতি না, গোটা পৃথিবীটা চালায়। সেই চলিষ্ণুতায় থাকতে হয় গভীর মানবিক সমঝোতা, সমন্বয়। করোনা– অদৃশ্য শত্রু– আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আর এই পরিবর্তিত বিশ্বে, পরিবর্তিত দেশীয় বাস্তবতায় সাংবাদিকদের আরও বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শুধু পরিশ্রম নয়, যুক্ত করতে হবে মেধা, মনন, আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান ও মানবিকতাকে।

করোনাকালীন চ্যালেঞ্জ আমাদের সেই পথে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চরৈবেতি এই যাত্রায় পিছিয়ে পড়ার উপায় নেই।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনাকালে
সক্রিয় গণমাধ্যম

জাফর ওয়াজেদ
একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও কবি; মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

বিশ্বজুড়ে এখনো চলমান আতঙ্ক করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)। পৃথিবীর এখন যেন গভীর-গভীরতর অসুখ চলছে। যেমনটা বলেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাস আট দশক আগে। করোনা হচ্ছে এক অদৃশ্য শত্রু মানবজাতির জন্য। এই ভাইরাস উলটপালট করে দিয়েছে বিশ্ববাসীর জীবন তথা জীবনধারাকেও। আলোকিত সাংবাদিক মোরসালিন মিজানের মতে, এই হচ্ছে একসময়, যাকে বলা যায়, 'গোটা দুনিয়ায় এক স্রোত বইছে। আছড়ে পড়ছে অভিন্ন ঢেউ।' তাই বলে জীবন স্থির বা স্থবির হয়ে নেই। বিরুদ্ধ সময়ের সঙ্গে লড়ে চলেছে। একদিকে ঢেউভাঙা জীবন, অন্যদিকে নিয়তিবাদ। দুটোকে সঙ্গী করে 'নিউ নরমাল' বাঙালি। ঢাকার একটি জনপ্রিয় দৈনিকের প্রতিবেদক মোরসালিন তার লেখায় করোনাকালীন জীবনধারার নানাদিক তুলে ধরেছেন। করোনার প্রথম ঢেউয়ে তার মতে, 'কত মানুষ যে ভেসে গেছে।' পৃথিবীজুড়ে যে সংক্রমণকেন্দ্রিক জীবনধারা, তাতে বিশ্বের দুই গোলার্ধে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দৃশ্যমান। বিশ্ববাসীর সুকুমার রায়ের সেই কিংবদন্তি ছড়ার কথা মনে আসে এই করোনাকালে– 'ছায়ার সাথে লড়াই করে গাত্রে হলো ব্যথা'। করোনা

এই হচ্ছে একসময়, যাকে বলা যায়, 'গোটা দুনিয়ায় এক স্রোত বইছে। আছড়ে পড়ছে অভিন্ন ঢেউ।' তাই বলে জীবন স্থির বা স্থবির হয়ে নেই

যেন সেই ছায়া। যার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে বিশ্বের শতকোটি মানুষ। এ লড়াইয়ের শুরু আছে, শেষ নেই বুঝি আর। কবে কখন কীভাবে এই অপচ্ছায়ার গ্রাস কেটে যাবে, কেউ জানে না। সেই যে ২৯ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো শনাক্ত হয়েছিল নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী, এই এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যা অধ্যুষিত– সর্ববৃহৎ দেশ চীনে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ তখনও এ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেনি। কিন্তু এই ভাইরাস বা অণুজীবের ধরন-ধারণ নিয়ে, আক্রান্তকারী শনাক্ত হওয়ার বিষয় নিয়ে, নানা জল্পনাকল্পনা ডানা মেলতে থাকে বিশ্ব গণমাধ্যমগুলোয়। নানা মত, নানা ভাষ্য আর অনুমানভিত্তিক বক্তব্যের ফুলঝুরি ঝরছিল। আর ততদিনে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইউরোপ, আমেরিকাসহ এশিয়ার দেশে দেশে। দ্রুত ছড়াতে থাকে এই অণুজীবের সংক্রমণ। আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গণমাধ্যমগুলো হয়ে উঠে সক্রিয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নানামুখী পদক্ষেপ নিতে থাকে। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয় সবকিছু। গণমাধ্যমে নতুন শব্দ উঠে আসে 'লকডাউন'।

গণমাধ্যমের কল্যাণে সবাই দেখেছে 'লকডাউনের' দখলে নাকাল বিশ্ববাসী। এই বাংলাদেশেও বিভিন্ন স্থানে 'লকডাউন' করা হয়। কিন্তু বাসিন্দারা তা মেনে চলার ক্ষেত্রে ছিল সহ্যাতীত। ঘর থেকে বেরিয়ে

> গণমাধ্যম স্বাধীন ও মতপ্রকাশের অধিকার বজায় থাকার কারণে অনেক অপদৃষ্টিকে সামনে তুলে এনেছে। এর ফলে দেখা গেছে, প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছে অনেক ক্ষেত্রেই

রাস্তাঘাটে চলাচলের প্রবণতা রোধ করা যায়নি। বিশ্ববাসীর মুখ ঢেকে গেছে 'মাস্ক'-এ। মানুষ বিশ্বাসও করে মাস্ক ব্যবহারের ফলে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। বিশ্বজুড়ে মাস্কের ব্যবহার ব্যাপক বলা যায়। তবে নিম্নবিত্তের মধ্যে মাস্কের ব্যবহার একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে করোনা-ভীতিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায়নি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান নগরবাসী পালনে সচেষ্ট হলেও গ্রামাঞ্চলে তার প্রভাব তেমন পড়েনি। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে মানুষ হয়ে পড়ে কর্মহীন। বন্ধ হয়ে যায় কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, অবকাঠামো নির্মাণসহ আরও বহু ক্ষেত্র। কিন্তু যথারীতি সচল রয়েছে গণমাধ্যম। সংবাদপত্রের পাঠক কমে গেছে এ সময়ে। কারণ বাসাবাড়িতে পত্রিকা সরবরাহ থেমে গেছে প্রায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে করোনা ছড়াতে পারে, এমন প্রচারণা বা আশঙ্কার কারণে অধিকাংশ বাসাবাড়িতে সংবাদপত্র আর প্রবেশ করতে পারছে না। গৃহবন্দি বা আইসোলেশন তথা নিঃসঙ্গ জীবনে ইলেকট্রনিক মাধ্যম তথ্য প্রদানে ছিল সক্রিয়। তার সঙ্গে সংযোজিত ছিল সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার অ্যাপস। এর মাধ্যমে আক্রান্তরা যেমন নিজেদের মনোভাব তুলে ধরেছে আবার অনেকের নিকটাত্মীয়ের করোনা-আক্রান্ত বা করোনা উপসর্গে মারা যাওয়ার তথ্যাদিও মিলেছে।

করোনাকালে বাংলাদেশের চিত্র বিশ্বের অন্য দেশের চেয়ে ভিন্ন বলা যায়। মানুষ খুব একটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার পরও এখানে আক্রান্তের সংখ্যা সীমিত। বলা যায়, দেশবাসী করোনার প্রথম তরঙ্গাভিঘাতকে মোটামুটি সামাল দিতে পেরেছে। কর্মপ্রাণ মানুষ কর্মহীন হয়ে বেশিদিন ঘরে বসে থাকতে না পারলেও, ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করার মওকাটুকুকে কাজে লাগাতে কসুর করেনি। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাইজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু করোনা এসে ডিজিটাইজেশনের কাজটিকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। 'লকডাউন' বা 'আইসোলেশন' সময়কালেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং সংযোগসাধন বেড়েছে। কাজের চাপে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত না, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বেড়েছে ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে। শিক্ষার্থীদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলা যায়। নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া, হোমওয়ার্কিং করা, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দেওয়া– সবই জীবন থেকে সরে গিয়েছে। অপরদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নানা ধরনের তথ্য-উপাত্ত, পরামর্শ, গুজব ইত্যাদিও ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির খবরে মানসিক উদ্‌বেগ বাড়ছে ক্রমাগত। এর প্রভাব পড়ছে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। অব্যাহত ভীতি মানুষের মানসিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে বলে মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্য। মানুষের জীবনযাপনের মতো চিন্তাভাবনায়ও একধরনের পরিবর্তন আসছে। ধারণা করা হয়, করোনার প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সামাজিক ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে আসতে পারে বড়ো ধরনের পরিবর্তন। করোনাভাইরাস বিশ্বমানবের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচরণের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা ভাবনার বিষয় বৈকি। সংক্রমণ রোগের যাবতীয় তথ্যাদি গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ যেমন অবহিত হচ্ছেন, তেমনই সাবধান ও সতর্কতার বাণীগুলো মেনে জীবনযাপনে সচেষ্ট থাকছেন অনেকেই। কিন্তু গণমাধ্যমে তথ্য পরিবেশনের কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের কাজ করতে হয় ঝুঁকি নিয়েই। ইতোমধ্যে কর্মরত অনেক সাংবাদিক এদেশে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। অনেকে আক্রান্ত হয়ে যেমন সুস্থ হয়েছেন, অনেকে আবার নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে দাঁড়িয়ে তথ্য পরিবেশনে দায়িত্ব ও কতর্ব্যবোধকে সামনে রেখে সক্রিয় রয়েছেন। এমনকি করোনকালে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের সমস্যাগুলোও সামনে এসেছে। সেসব তুলে ধরার কাজে গণমাধ্যমকর্মীরা এখনো সক্রিয়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বলে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। কিন্তু গণমাধ্যম স্বাধীন ও মতপ্রকাশের অধিকার বজায় থাকার কারণে অনেক অপদৃষ্টিকে সামনে তুলে এনেছে। এর ফলে দেখা গেছে, প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছে অনেক ক্ষেত্রেই। আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার অনেক অসংগতিই সামনে এসেছে। এর ফলে এসব অসংগতি দূর করে নয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

অনেক দুঃখ-কষ্ট, সহায়ক উপকরণ না পাওয়ার মাঝেও সাংবাদিকরা দুধরনের চাপ নিয়ে কাজ করেছেন এদেশে। এই দুর্যোগকালে অনেকে ছাঁটাই হয়েছেন, বেতনভাতা হ্রাস পেয়েছে, অনেকে নিয়মিত বেতনভাতাও পান না। একদিকে চাকরির ঝামেলা ও আর্থিক অনটন, অপরদিকে করোনার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাংবাদিকদের কাজ করে যেতে হচ্ছে অবিরাম। পেশার প্রতি দায়িত্ববোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্য মাথায় রেখে সাংবাদিকরা জীবনপণ করে করোনাকালে যে কর্মস্পৃহা অব্যাহত রেখেছেন, তা দৃশ্যমান।

সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতাকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত থাকবেই।

করোনাকাল ও সম্প্রচারমাধ্যম

রেজোয়ান হক
বার্তাপ্রধান, মাছরাঙা টেলিভিশন; চেয়ারম্যান, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার

এই করোনা মহামারিতে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল ঘরবন্দি মানুষের কাছে সরাসরি তথ্য পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম। জীবনযাত্রা যখন স্থবির, চলাচল থেমে গেছে, তখন তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। জীবন বাঁচাতে মানুষ যখন আশ্রয় নিয়েছে ঘরে, তখন জনগণকে তথ্যসেবা দেওয়ার প্রয়োজনে গণমাধ্যমকর্মীদের থাকতে হয়েছে বাইরে।

করোনা মহামারি অন্যান্য সেক্টরের মতো গণমাধ্যমকেও সংকটে ফেলেছে। প্রথমদিকে প্রিন্ট মিডিয়া বড়ো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। হকাররা বের হতে পারেননি, আবার অনেকে বাড়িতে পত্রিকা রাখতে চাননি, এ থেকে করোনা ছড়ানোর অহেতুক আতঙ্কে। তবে ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সে সমস্যা ছিল না। তারা সরাসরি খবর পৌঁছে দিয়েছে ঘরবন্দি প্রতিটি পরিবারকে। এই সময়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দর্শক যেমন বেড়েছে, তেমনি ঝুঁকিও বেড়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মী, বিশেষ করে নিউজে যারা কাজ করেন, তাদের শ্রম দিতে হয়েছে স্বাভাবিক

“ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সে সমস্যা ছিল না। তারা সরাসরি খবর পৌঁছে দিয়েছে ঘরবন্দি প্রতিটি পরিবারকে”

সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে রিপোর্টার ও ক্যামেরাপারসনকে খবরের জন্য বাইরে, হাসপাতালে যেতে হয়েছে। কারণ এ কাজ তো ঘরে বসে করা যায় না। সেক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হয়েছে অনেক বেশি।

আবার যাদের অফিসের বাইরে যেতে হয়নি, তারাও ঝুঁকিমুক্ত ছিলেন না। তাদেরকে মাঠ থেকে ফেরা রিপোর্টার এবং ক্যামেরাপারসনদের পাশাপাশি বসে কাজ করতে হয়েছে। ফলে সবাই কোনো না কোনোভাবে ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন। মিডিয়ার প্রায় চার শ কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। এ কারণে অনেক বাড়িওয়ালা সংবাদকর্মীদের বাড়িতে থাকতে দিতে চাননি। একটি টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন এক নারী সাংবাদিক। তিনি তার স্বামী, সন্তানদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে নিজে চার মাস একা ঢাকায় থেকে কাজ করেছেন। এটা তো তার পেশার জন্য বড়ো ত্যাগ। এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে।

করোনার মধ্যে নিউজরুমগুলোর প্রস্তুতি একেক চ্যানেলে একেক রকম। কোথাও কর্মীদের প্রতি কর্তৃপক্ষ অনেক যত্নশীল। আমি আমার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারি, করোনার শুরুতে আমরা সবাইকে নিয়ে বসে ঠিক করেছি এই অবস্থায় কী করণীয়। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়েছি। যেসব সংবাদকর্মী বাইরে কাজ করতে গিয়েছেন, তাদের সুরক্ষার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্কের ব্যবস্থাসহ ক্যামেরা থেকে শুরু করে অন্যান্য ইকুইপমেন্ট দিয়ে ভাইরাসমুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অফিসের ভেতরে দূরত্ব রেখে বসা, মাস্ক ব্যবহার করা ছিল বাধ্যতামূলক। এসব ব্যবস্থা অধিকাংশ হাউস নিয়েছে। আবার কেউ কেউ অতটা করেনি। যেখানে বেতনভাতা ঠিকমতো দেওয়া হয় না, সেখানে সঠিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আশা করা যায় না। এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেও সংবাদকর্মীরা কাজ করেছেন। তারা নিজেরাই যতটুকু পেরেছেন তা দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

করোনার প্রথমদিকে একজনের টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ এলে তার কাছাকাছি যারা ছিলেন, তাদের সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠাতে হয়েছে। একসঙ্গে যদি একটি নিউজ চ্যানেলের ৪০ জনকে অফ রাখতে হয়, তাহলে সেই স্টেশন চলে কীভাবে। নিউজের তো অনেক কাজ। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল, চ্যানেল হয়তো বন্ধ রাখতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটা করতে না হলেও একটি চ্যানেলকে বার্তা বিভাগ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

> ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই সময়ে প্রচুর সংবাদ প্রচার করেছে। সঠিক পরিস্থিতি মানুষকে জানানোর চেষ্টা ছিল। তবে কিছু কিছু ভুল বা অপসাংবাদিকতা যে হয় না, সেটা আমি বলব না

এই সময়ে কোথায় কী ঘটছে, সেটা জানার আগ্রহ থেকে ঘরবন্দি মানুষ টিভি দেখেছে। সেই কারণে বিশেষ করে নিউজ চ্যানেলগুলোর দর্শক এবং বিজ্ঞাপন বেড়েছে। তবে বিজ্ঞাপনের এই বিল কতটা পাওয়া যাবে, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কারণ বিজ্ঞাপনদাতা বিজনেস হাউসগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মহামারি শুরুর আগে থেকেই বিজ্ঞাপনের বাজার খারাপ ছিল। বিজ্ঞাপনের বাজেট কমিয়ে দিয়েছিল বিজ্ঞাপনদাতারা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে এ অবস্থা থাকবে না, আগের জায়গায় ফিরে যাবে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই সময়ে প্রচুর সংবাদ প্রচার করেছে। সঠিক পরিস্থিতি মানুষকে জানানোর চেষ্টা ছিল। তবে কিছু কিছু ভুল বা অপসাংবাদিকতা যে হয় না, সেটা আমি বলব না। মিডিয়ার মধ্যে এ ধরনের একটা প্রবণতা আছে। প্রয়োজনের চেয়ে মিডিয়ার সংখ্যা বেশি। সংখ্যা যখন বেশি হয়, প্রচুর অযোগ্য লোক ঢুকে পড়ে। অসংখ্য মানুষ এখানে জড়িত– ৩০টি প্রাইভেট চ্যানেল সম্প্রচারে আছে। অনেক সময় মালিকরা নিজের এজেন্ডা নিয়ে এখানে আসেন। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠিত হাউস বা যারা পরীক্ষিত, তাদের বাইরে যারা আছেন তাদের অনেকেরই লক্ষ্য থাকে এটিকে ব্যবহার করে অন্য ব্যবসার সুরক্ষাসহ নানা স্বার্থসিদ্ধি করা। তারপরও আমি মনে করি, মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো এখনো যথেষ্ট দায়িত্বশীল।

সামনে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। করোনার আগে থেকেই আমরা ছিলাম অস্তিত্ব সংকটে। বিজ্ঞাপন আমাদের আয়ের একমাত্র উৎস। সেটা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে ভাগ হচ্ছে। এর ওপর করোনাভাইরাসের ভয়ংকর পরিস্থিতি। এর প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। খরচ কমাতে কর্মী ছাঁটাই, বেতনভাতা কমানোর মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে বেশকিছু হাউস। বাড়ছে পেশার অনিশ্চয়তা।

টিকে থাকতে হলে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে মোটা দাগে তিনটি কাজ করতে হবে– ১. আয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের ওপর একক নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্য পথ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যেটি নিয়ে এখন আলোচনা চলছে তা হলো, চ্যানেলগুলোকে নিজেদেরকে পে-চ্যানেল হিসেবে ঘোষণা দিয়ে অপারেটরদের কাছ থেকে ফি নিতে হবে। গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া টাকার পুরোটাই এখন অপারেটররা নিয়ে নেন। ২. সম্ভাব্য আয়-ব্যয় হিসাব করে যথাযথ বিজনেস প্ল্যান করতে হবে। ৩. বিনোদন এবং খবর পরিবেশনায় আরও বেশি সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। দর্শকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন এক চ্যানেলের সঙ্গে আরেক চ্যানেলের পার্থক্য করা কঠিন। কনটেন্ট প্রায় একই। বিষয়বস্তু বাছাই এবং উপস্থাপনায় মুনশিয়ানা দেখিয়ে যারা নিজেদের আলাদা করতে পারবে আর যেসব খবরে মানুষের আগ্রহ আছে তা পরিবেশন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, ভবিষ্যতে তারাই টিকবে।

মোবাইল যুগে সাংবাদিকতায়ও মাস্ক জরুরি

জাহিদ নেওয়াজ খান
প্রধান বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই; সম্পাদক, চ্যানেল আই অনলাইন

কল্পলোকে মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ভিনগ্রহের কেউ। সায়েন্স ফিকশনে সেই ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রযুক্তির শক্তিতে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই জয়। সিনেমা-সিরিজে এরকম আমরা প্রায়ই দেখি, বইয়েও তেমনটাই পড়ি। সেখানেও জীবাণু থাকে, থাকে জীবাণুযুদ্ধও। কিন্তু বাস্তবের যে দুনিয়া, সেই পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই এক জীবাণু এখন মানুষের নাভিশ্বাস তুলেছে। তারপরও আশা এই– মানুষ এবং বিজ্ঞানের অজেয় প্রায় কিছুই নেই। তাই করোনাভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধে ভ্যাকসিন বা অ্যান্টিবডি কিংবা কোনো ওষুধে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই জয় হবে।

“কিন্তু বাস্তবের যে দুনিয়া, সেই পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই এক জীবাণু এখন মানুষের নাভিশ্বাস তুলেছে। তারপরও আশা এই– মানুষ এবং বিজ্ঞানের অজেয় প্রায় কিছুই নেই”

কিন্তু তার আগে গত বছরের শেষদিক থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অদৃশ্য ভাইরাস যেভাবে কয়েক কোটি মানুষকে সংক্রমিত করে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলছে, দুনিয়াশুদ্ধ মানুষকে প্রায় ঘরবন্দি করে গভীর সংকটে ফেলেছে, বিশ্ব অর্থনীতিকে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে; তার প্রভাব হবে দীর্ঘস্থায়ী। সেটা যেমন শরীর-স্বাস্থ্যে, তেমনই মনে। যেমনভাবে সেটা মানুষের রুটি-রুজিতে, তেমনইভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে।

এভাবে এমন কোনো খাত বা জায়গা নেই যেখানে কোভিড-১৯ তার প্রভাব রাখেনি বা রেখে যাচ্ছে না। গণমাধ্যমও তার বাইরে নয়। সেটা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে কাজের ধরনে পরিবর্তন থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের আয় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে। করোনার এ প্রভাব যেমন সংবাদপত্রে, তেমনই টেলিভিশনে। একইভাবে এখন যে অনলাইনমাধ্যম পাঠক-দর্শকের বড়ো জায়গা দখল করে নিচ্ছে, সেই অনলাইনেও।

তবে করোনায় গণমাধ্যমের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি ঘটছে দুভাবে: ১. সরাসরি প্রভাব, যার ফলে হোম অফিসসহ কাজের ধরনে পরিবর্তন ও আধেয়র বড়ো জায়গাজুড়ে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত খবর ও বিশ্লেষণ, এবং ২. পাঠক-দর্শকের আচরণগত পরিবর্তনের কারণে আধেয় পরিবেশনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে অনলাইনের কর্তৃত্ব।

পাঠক-দর্শকের এই যে আচরণগত পরিবর্তন, এটা শুধু করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণেই ঘটেনি। শুরুটা আরও আগে থেকে। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট বিপ্লবের ফলে এক দশক ধরে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কর্তৃত্বের কারণে পাঠক-দর্শক সংবাদ তো বটেই, এমনকি বিনোদনের জন্যও এখন অনেক বেশি মোবাইলনির্ভর। আগে শুরু হওয়া আচরণগত এ পরিবর্তনকে করোনাকাল আরও এগিয়ে দিয়েছে।

করোনাকালে ছাপা পত্রিকার পাঠক কমার পাশাপাশি টেলিভিশন দর্শক এবং বেতারের শ্রোতা বাড়লেও প্রাথমিক তথ্যের জন্য অনলাইনের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে মানুষ। ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে সংক্রমণের শুরু মার্চ থেকে। সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া জুন পর্যন্ত, অর্থাৎ 'লকডাউনের' বড়ো সময়জুড়ে অনলাইনের পাঠক-দর্শক ছিল অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ এবং সেটা টানা কয়েক মাস। জুনের পর থেকে অনলাইন পাঠক-দর্শক কমতে শুরু করলেও এখনো তা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

এ দর্শক-পাঠকদের অনেকেই, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, আগে থেকেই সংবাদ উৎস হিসেবে অনলাইনকে বেছে নিয়েছিল। এর মূল কারণ ডিভাইস। মানুষের হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটও অনেক সহজলভ্য। করোনাকালে 'মোবাইল ফার্স্ট প্রজন্মের' সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক নতুন মানুষ। নতুন এ পাঠক-দর্শকসহ আগের এবং ভবিষ্যতের 'অডিয়েন্স'কে মাথায় রেখে অনলাইন ছাড়াও সব গণমাধ্যম– হোক সেটা সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশন– তাদের অনলাইন প্ল্যাটফরম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজগুলোয় আধেয়তে গুণগত পরিবর্তন এনেছে।

গণমাধ্যমের এই যে রূপান্তর, এর মূলে আছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন এভাবে একদিকে একটি 'মোবাইল ফার্স্ট জেনারেশন' গড়ে তুলছে, অন্যদিকে বদলে দিচ্ছে গণমাধ্যমের ভেতর-বাহির

আধেয়র এ পরিবর্তনে অক্ষরে প্রকাশিত নিয়মিত সংবাদের পাশে বড়ো জায়গা করে নিয়েছে 'মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট'। এ ভিডিয়ো কনটেন্টের বেশির ভাগই মোবাইল ফোনে ধারণ করা। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনলাইন সাইটগুলোর প্রায় টেলিভিশনের মতো তাৎক্ষণিক এবং বিষয়ভিত্তিক যে লাইভ সেগুলোর মাধ্যমও মোবাইল ফোন প্রযুক্তি। যে 'অডিয়েন্সের' জন্য ওইসব কনটেন্ট বা লাইভ, সেই অডিয়েন্স আবার তা দেখছে ওই মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমের এই যে রূপান্তর, এর মূলে আছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন এভাবে একদিকে একটি 'মোবাইল ফার্স্ট জেনারেশন' গড়ে তুলছে, অন্যদিকে বদলে দিচ্ছে গণমাধ্যমের ভেতর-বাহির। পরিবর্তনের এ ধারাটা অনলাইনে দৃশ্যমান বলে আমরা একে শুধু অনলাইন সাংবাদিকতা মনে করছি। কিন্তু পাঠক-দর্শক যেহেতু এখন অনেক বেশি অনলাইননির্ভর, তাই পরিবর্তন ঘটছে সংবাদপত্র-টেলিভিশন সব মাধ্যমেই। করোনাভাইরাস এসে পরিবর্তনটা দ্রুততর করেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এ সময়টা না এলেও আগেই শুরু হওয়া গণমাধ্যমের রূপান্তরটা ঘটতে থাকত, হয়তো গুণগত রূপান্তরে সময় লাগত আরেকটু বেশি।

প্রযুক্তির এ দিকটি ছাড়াও করোনাকাল আমাদের গণমাধ্যমকে আরও কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার দিকটি নিয়ে খুব বেশি ভাবা হতো না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে 'আগুন সন্ত্রাসের' সময় থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয়টি আলোচিত হওয়া শুরু হয়। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও কোভিড মহামারির এ সময়ে এসে এরকম সংকটে 'ফ্রন্ট লাইনার্স' হিসেবে গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং পেশার নিশ্চয়তার বিষয়টিও বেশি করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সাংবাদিকতা– হোক সেটা সংবাদপত্রে কিংবা টেলিভিশনে অথবা অনলাইনে– এর মূলকথা আরও বেশি সত্যের উন্মোচন, যেখান থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম হয়তো কিছুটা দূরেই ছিল। তবে সত্যের উন্মোচন যে গুজব এবং ধারণাপ্রসূত তথ্য 'ম্যানুফ্যাকচারিং' নয়, সেটাও মনে রাখতে হবে। 'ক্লিকবেইট' জার্নালিজমের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামা আমাদের অনলাইন সাংবাদিকতার জন্য বিষয়টি মনে রাখা আরও জরুরি। করোনা মহামারির এ সময়ে যেমন মাস্ক পরতে হয়, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হয়, পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়; তেমনই সাংবাদিকতায়ও গুজব ঠেকানোর মাস্ক লাগবে, অসত্য প্রচার থেকে শত হাত দূরে থাকতে হবে, শুধু সঠিক তথ্য দিয়ে সাংবাদিকতাকে রাখতে হবে পরিচ্ছন্ন।

নয়া স্বাভাবিকতা এবং আমাদের সাংবাদিকতা

শুভ কর্মকার

নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে অভাব থাকলেও প্রজারা খুব সুখে-শান্তিতেই বসবাস করছিল। কিন্তু হঠাৎ শুরু হয় একদল ডাকাতের আনাগোনা। ডাকাতদল রাতের আঁধারে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেত। ডাকাতদলটিকে সেসময় বর্গী হিসেবে ডাকা হতো। বর্গী শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ বারগিস থেকে। বারগিস শব্দের অর্থ প্রাচীন মারাঠা যোদ্ধা। ডাকাতরা ছিল মূলত মারাঠাদের কিছু পথচ্যুত সেনা। বর্গীরা শুধু সম্পদই লুট করত না, সঙ্গে নিয়ে যেত সাধারণ প্রজাদের স্বপ্ন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা তেমনই বর্গীর কবলে পড়িছি। সাজানো-গোছানো সংসার এলোমেলো হয়ে গেছে এই বর্গীর আক্রমণে। তবে ওই বর্গীর সঙ্গে এ সময়ের বর্গীর তুলনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত, এ বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। তবে এটা বর্গীর চেয়ে কম কিছু নয়। একালের বর্গী মানুষ বা মনুষ্যসৃষ্ট কোনো কিছু নয়। এটা একটি ভাইরাস, এর নাম কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস। বর্গী যেমন আলীবর্দী খানের প্রজাদের স্বপ্ন নষ্ট করেছে, তেমনই কোভিড-১৯ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বা নাগরিকদের স্বপ্ন এলোমেলো করে দিয়েছে।

> বিশ্বায়ন থমকে গেছে। থমকে যাওয়ার এই বৃহৎ পরিসর থেকে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সাংবাদিকতার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

শুধু বাংলাদেশ না, সারাবিশ্বের মানুষের স্বপ্নই এলোমেলো হয়েছে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে। বিশ্বায়ন থমকে গেছে। থমকে যাওয়ার এই বৃহৎ পরিসর থেকে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সাংবাদিকতার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম আলোচনায় কোভিড-১৯ কালীন বাংলাদেশের সাংবাদিকতার পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনায় কোভিড-১৯-পরবর্তী 'নয়া স্বাভাবিকতা'র সাংবাদিকতা কেমন হতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুই পর্বের আলোচনা নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ।

কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশের সাংবাদিকতা

কোভিড-১৯-এর প্রভাব পড়েছে সারাবিশ্বে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অর্থনীতির অবস্থা অনেকটাই ভঙ্গুর। লকডাউন বা সাধারণ ছুটির কারণে ব্যবসা কমে গেছে অনেক প্রতিষ্ঠানের। অনেক কর্মজীবী মানুষ কাজ হারিয়েছেন। দিন আনে দিন খায় এমন পেশাজীবী মানুষও অসহায়। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়ার পর মার্চের শেষের দিকে বাংলাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। লকডাউনে সাধারণ মানুষের অবস্থা জানতে ব্র্যাক মে মাসে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ২ হাজার ৩৭১ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেখানে দেখা যায়, সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ মানুষ চাকরি বা কাজের সুযোগ হারিয়েছে। বেতন পায়নি ৩ শতাংশ লোক, যদিও তাদের চাকরি রয়েছে। আর যারা দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজ করেন, তাদের ৬২ ভাগই কাজের সুযোগ হারিয়েছে। জেলাভিত্তিক ফলাফল উপস্থাপনে এই গবেষণায় দেখানো হয় কোভিড-১৯ এর কারণে ১০টি জেলার মানুষের আয় কমে গেছে। ঢাকা জেলার মানুষের আয় কমেছে ৬০ ভাগ (আসাদুজ্জামান, ২০২০)। অন্যসব পেশার মতো এর প্রভাব পড়েছে গণমাধ্যম পাড়ায়ও। ডয়েচে ভেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ বিশ্বের আঞ্চলিক সাংবাদিকতাকে ব্যাপকভাবে আঘাত করেছে। এই আঘাতের কারণে অনেক আঞ্চলিক গণমাধ্যম বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে (DW, 2020)।

উল্লিখিত পরিস্থিতি গণমাধ্যমের টিকে থাকার লড়াই উপস্থাপন করে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই গণমাধ্যমের আয় কমতে থাকে। আর এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা কর্মী ছাঁটাই শুরু করে। আবার অনেক গণমাধ্যম কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) দেশের আট বিভাগের ২০টি গণমাধ্যমের ওপর জরিপ পরিচালনা করেছে। এমআরডিআই-এর জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকরা কোভিড-১৯ মহামারিকে তাদের টিকে থাকার বড়ো হুমকি হিসেবে মনে করছেন। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা তার লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, মহামারির আগে থেকেই বাংলাদেশের প্রথাগত গণমাধ্যমগুলোর আয় কমতে থাকে। মহামারি এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করেছে (Reza, 2020)। ২০১৯ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর– এই ছয় মাসে বাংলাদেশে ৪৫০ জন টিভি সংবাদকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। সেসময় আয় কমে যাওয়ার অজুহাতে ১০ টিভি চ্যানেল কর্মী ছাঁটাই করেছে। করোনায় এই সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে (স্বপন, ২০২০)।

মার্চের শেষে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ ছুটিতে কার্যত বন্ধ ছিল। আর্থিক লেনদেন স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে গণমাধ্যমের ওপর সাধারণ ছুটির প্রভাব পড়তে শুরু করে। জুনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স (বিএবি) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন বন্ধের ঘোষণা দেয় (বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০২০)। আবার বিজ্ঞাপন পেলেও ঠিকমতো টাকা পাওয়া যেত না করোনার অজুহাতে। ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) সদস্যসচিব ও একাত্তর টেলিভিশনের হেড অব নিউজ শাকিল আহমেদ বলেন, করোনায় টেলিভিশনগুলোর আয় কমে গেছে। বিজ্ঞাপনের টাকা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না (স্বপন, ২০২০)। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে এগিয়ে আসে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিল দ্রুত গণমাধ্যমগুলোকে পরিশোধের বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয় (কালের কণ্ঠ, ২০২০)।

উল্লিখিত পরিস্থিতি গণমাধ্যমের টিকে থাকার লড়াই উপস্থাপন করে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই গণমাধ্যমের আয় কমতে থাকে। আর এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা কর্মী ছাঁটাই শুরু করে। আবার অনেক গণমাধ্যম কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু দুর্যোগের এই সময় সবচেয়ে জরুরি সঠিক তথ্যপ্রবাহ। কর্মী ছাঁটাই এবং গণমাধ্যম বন্ধ ঘোষণা তথ্যের সঠিক প্রবাহ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

এবার গণমাধ্যম বন্ধের চিত্রের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। প্রথম আলোয় 'ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা, বন্ধ ২৫৪টি' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদে বলা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকাসহ আট বিভাগীয় শহর ও সংশ্লিষ্ট জেলায় ৮৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সংবাদটিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ৮টি বিভাগীয় শহর ও সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার কথা ৩৪০টি। কিন্তু বর্তমানে করোনার কারণে ২৫৪টি সংবাদপত্র বন্ধ রয়েছে। তবে ডিএফপি সূত্র অনুসারে, দুই শর বেশি পত্রিকা বন্ধ রয়েছে বলে সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়। এই সংবাদে আরেকটি তথ্য

দেওয়া হয়েছে, ডিএফপির ১ জানুয়ারির তথ্য অনুযায়ী দেশে তালিকাভুক্ত দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫৫২টি। মিডিয়া তালিকার বাইরেও কয়েক শ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এগুলো প্রকাশের অনুমতি থাকলেও সরকারি বিজ্ঞাপন পায় না। এখন প্রায় এ ধরনের সব পত্রিকাই বন্ধ রয়েছে (স্বপন, ২০২০)।

চালু গণমাধ্যমগুলোও যে স্বাভাবিক নিয়মে চলছে, বিষয়টি তেমনও নয়। অনেক গণমাধ্যমই নিয়মিত বেতন দিতে পারছে না। প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকার সাতটি বাংলা ও চারটি ইংরেজি দৈনিক ছাড়া বাকিগুলো নিয়মিত বেতনভাতা দিতে পারছে না (শরিফুজ্জামান, ২০২০)। ইদুল ফিতরের সময় চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের তালিকা তৈরি করে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। ডিআরইউ-এর এই তালিকায় ২৭৫ জন সাংবাদিকের নাম পাওয়া য়ায়। ৩ জুলাই ডিআরইউ জানায়, চাকরিচ্যুত সাংবাদিকের সংখ্যা ৩৫০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া প্রায় ৫০০ প্রতিবেদক ডিআরইউ-এর উদ্যোগে আয়োজন করা সরকারি রেশন গ্রহণ করেছে (শরিফুজ্জামান, ২০২০)। ২২ জুলাই ডয়েচে ভেলে প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে করোনায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে চার হাজার সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী ক্ষতির শিকার হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এই সাংবাদিকদের মধ্যে সরাসরি চাকরিচ্যুত ও ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ছয় শ (স্বপন, ২০২০)। ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) সদস্য সচিব ও একাত্তর টেলিভিশনের হেড অব নিউজ শাকিল আহমেদ বলেন, 'ছয়-সাতটি বেসরকারি টেলিভিশন এখন অর্ধেক বেতন দিচ্ছে। বেশ কয়েকটি টেলিভিশনে দুই মাসের বেতন বকেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে করোনা শুরুর সময় এবং করোনার মধ্যে ৪৫ জনের মতো টিভি সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আরও অনেক টিভিতে এখন চাকরি যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে বছর ধরে বেতন হয় না, সেখানকার কর্মীরা তো বিনা বেতনেই কাজ করছে।' এই তথ্যগুলো সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে (স্বপন, ২০২০)।

পেশাগত নিশ্চয়তা না থাকলেও সাংবাদিকরা করোনার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক সাংবাদিক, এমনকি মারাও যাচ্ছেন। ডয়েচে ভেলের একটি সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, করোনায় ৬৪৪ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকার ৪৫৪ জন এবং ঢাকার বাইরে ১৯০ জন। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ২৫ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে ১৩ জন ঢাকার এবং ১২ জন ঢাকার বাইরের (স্বপন, ২০২০)।

তবে আশার দিক হলো, এই সংকট কাটাতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে সারাদেশে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৩৫০ জন সাংবাদিককে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক বলতে যারা সম্প্রতি চাকরিচ্যুত হয়েছেন, যারা ছয় মাস ধরে বেকার রয়েছেন, চাকরি আছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না– এমন সাংবাদিককে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিকরা এই তালিকার বাইরে রয়েছেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বাইরে কোভিড-১৯ সময়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তৈরি হয় তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) কোভিড-১৯-এর সময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। আইপিআই-এর তথ্য অনুসারে, কোভিড-১৯-এ এখন পর্যন্ত বিশ্বে ৪২৬টি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকদের গ্রেফতার, তথ্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধ করা, সেন্সরশিপ, ফেকনিউজ বা ভুয়া খবর, মৌখিক বা শারীরিক আক্রমণ (IPI, 2020)। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করাও অনেক বেশি ঝুঁকির। 'Stay Home, Stay Safe' স্লোগানে সবাই যখন ঘরে বসে, তখন সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনে রয়েছেন বাইরে। এই ঝুঁকির মধ্যে সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনে ছিলেন অগ্রগামী। এজন্য ডাক্তার কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সাংবাদিককেও 'সম্মুখযোদ্ধা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিকই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারাও গেছেন। মুদ্রণমাধ্যম ও অনলাইনমাধ্যম তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজীকরণ করতে পারলেও রেডিয়ো ও টেলিভিশন মিডিয়ার জন্য কাজটি কঠিন। মুদ্রণ ও অনলাইন মাধ্যমের সাংবাদিকরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের কিছুদিন পর থেকেই বাড়ি থেকে কাজ করছেন। যেখানে রেডিয়ো ও টেলিভিশন ভারী যন্ত্রপাতিনির্ভর গণমাধ্যম হওয়ায় বাড়ি থেকে কাজ করা এই দুই গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের জন্য অনেক কঠিন। এছাড়া এ দুই গণমাধ্যমের যন্ত্রপাতি এখনো মোবাইল ও দূরবর্তী পরিচালনার জন্য সহজতর নয়। ফলে তারা এখনো বাড়ি থেকে কাজ করার সুবিধা তৈরি করতে পারেননি।

নয়া স্বাভাবিকতায় সাংবাদিকতা

নয়া স্বাভাবিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'New Normal'। জানা যায়, রবার্ট এ হেইনলেইন ১৯৬৬ সালে *The Moon Is a Harsh Mistress* নামক গ্রন্থে এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন (Heinlein, 1966, P. 152)। এছাড়া এই শব্দটি ২০০৭-২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট, ২০০৮-২০১২ সালের বৈশ্বিক মন্দা-পরবর্তী সময় ও কোভিড-১৯-এর মহামারির সময় ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৫ সালে পিটার এম সান্ডম্যান এবং জডি ল্যানার্ড এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লুর প্রভাবের ক্ষেত্রে 'নয়া স্বাভাবিকতা' বা 'নিউ নরম্যাল' বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তারা এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'নয়া স্বাভাবিকতা' মানুষের মনোভাবের কৌশলগত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'নয়া স্বাভাবিকতা' মহামারির প্রাথমিক, অস্থায়ী, ভীতিজনক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। 'নয়া স্বাভাবিক' সময়টা আমাদের 'শিক্ষণীয় মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেন সান্ডম্যান ও ল্যানার্ড (Sandman and Lanard, 2005)।

বর্তমান প্রবন্ধে কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশের সাংবাদিকতাবিষয়ক আলোচনায় কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অনেক সংকটের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। তবে বাস্তবতা এটাই– জীবন ও জীবিকার তাগিদে আমাদের সবাইকেই কোভিড-১৯-এর সঙ্গেই বসবাস করতে হবে। ফলে সবার মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রাথমিক, অস্থায়ী ও ভীতিজনক অবস্থা বিরাজ করবে। এ রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবার স্বাভাবিক জীবনাচরণ পরিচালনা করাই 'নয়া স্বাভাবিকতা'কে নির্দেশ করে। এ রকম 'নয়া স্বাভাবিক' পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা কীভাবে পরিচালিত হবে, সেটাই বড়ো প্রশ্ন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় বেশকিছু সংকট তৈরি হয়েছে। সংকটগুলো হলো– গণমাধ্যমের আয় কমে গেছে, সাংবাদিকদের বেতন বন্ধ হয়েছে, কর্মী ছাঁটাই চলছে, অবাধ তথ্যপ্রবাহ হুমকির মধ্যে পড়েছে, গুজব বেড়ে গেছে, তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা সংকটের মধ্যে পড়েছে। ফলে সব ধরনের সংকটেই সাংবাদিকতা টেকসই করতে হবে। এক্ষেত্রে ফোর্বসের সাবেক সাংবাদিক লুইস ডিভরকিন ২০১২ সালে টেকসই সাংবাদিকতা নিয়ে একটি মডেলের উপস্থাপন করেন। এই মডেলে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লুইস গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের গুণাগুণ বৃদ্ধি, গণমাধ্যম বার্তার ওপর পাঠক/দর্শক-শ্রোতার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির মাধ্যমে সাংবাদিকতা টেকসই করার কথা বলেছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি গণমাধ্যমগুলোকে একধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। যে কারণে জবাবদিহিতার জায়গায় গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। টেকসই সাংবাদিকতার

অন্যতম ব্যবস্থা হলো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভের অংশীদার করা। গণমাধ্যম লাভের মধ্যে থাকলে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীর চাকরির নিশ্চয়তা তৈরি হবে। তবে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টা খেয়াল রেখে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যেন গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনদাতার হয়ে না পড়ে (DVorkin, 2012)।

গণমাধ্যমের লাভ ও সংবাদকর্মীদের চাকরির নিশ্চয়তার বিষয়ে চিন্তা করে ম্যান্ডলা চিনুলা ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার জন্য সেভেন বিজনেস মডেল দিয়েছেন। তার এই মডেলটি ২০১৭ সালের ১৯ জুন ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্টস নেটওয়ার্কে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই মডেলে উল্লেখ করেন, গণমাধ্যমের কিছু আধেয় কোনো কোম্পানির সৌজন্যে প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে। তবে সেই বিষয়বস্তু অবশ্যই প্রকৃত এবং সঠিক হবে। মূলত চিনুলা এই আধেয় বলতে বিজ্ঞাপনের আধেয়কে বুঝিয়েছেন। আবার জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, অনেক প্রকাশনাই জনগণের দানের টাকায় পরিচালিত হয়। এ রকম জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারলে সাংবাদিক আরও বেশি গভীর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। সাবস্ক্রিপশন পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান টেকসই হবে। সেই সঙ্গে সংবাদের গুণগত মান বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। সরাসরি সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যমের বাড়তি আয়ের পথ তৈরি হতে পারে। গণমাধ্যমে কোনো ঘটনার সরাসরি বিবরণ উপস্থাপিত হবে। আর এই সরাসরি উপস্থাপনে মানুষের দেখার বাড়তি আগ্রহ তৈরি হবে। এরকম সরাসরি সাংবাদিকতা প্রচারে গণমাধ্যম অধিক বিজ্ঞাপন পেতে পারে কিংবা সরাসরি অনুষ্ঠান বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে প্রচার করতে পারে। দাতাদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে গণমাধ্যম অর্থনৈতিক দীর্ঘস্থায়িত্ব তৈরি করতে পারে। মাইক্রো পেমেন্ট গণমাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। মাসিক সাবস্ক্রিপশনের পরিবর্তে শুধু একটি সংবাদ বা প্রবন্ধের জন্য ক্ষুদ্র অংশ পেমেন্ট হিসেবে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা। ফলে অনেকেই অল্প টাকা দিয়ে একটি সংবাদ বা প্রবন্ধ পড়ে ফেলতে পারেন। সর্বোপরি সাংবাদিকতা টিকে রাখার জন্য প্রয়োজন গুণগত সংবাদ (Chinula, 2017)। উল্লিখিত আলোচনা ও কোভিড-১৯-এ বাংলাদেশের সাংবাদিকতা আলোচনা বিশ্লেষণ করে 'নয়া স্বাভাবিকতা'য় বাংলাদেশের সাংবাদিকতা টিকিয়ে রাখার জন্য গণমাধ্যমের আয় এবং সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্টিং বিষয়ে নতুন ভাবনা তৈরি করেছে। সামগ্রিক আলোচনায় 'নয়া স্বাভাবিকতা'য় সাংবাদিকতার বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে (দেখুন চিত্র-১.১)। এই পদক্ষেপগুলো টেকসই সাংবাদিকতাকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

চিত্র ১.১: নয়া স্বাভাবিকতায় সাংবাদিকতা

'নয়া স্বাভাবিকতায়' সাংবাদিকতা

'নয়া স্বাভাবিকতা'য় সাংবাদিকতার আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথমেই গণমাধ্যমের আয় চ্যালেঞ্জটি আমাদের সামনে হাজির হয়। গণমাধ্যমের আয় না থাকলে গণমাধ্যম টিকবে না আর গণমাধ্যম না টিকলে সাংবাদিকতা টিকবে না। কোভিড-১৯ এই বিষয়টি আমাদের সবার সামনে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এই সময়ে অনেক সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন, বেতন বন্ধ রয়েছে, বেতন কমানো হয়েছে, এমনকি গণমাধ্যমও বন্ধ হয়েছে। এজন্য গণমাধ্যমের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো সাবস্ক্রিপশন পদ্ধতিতে আগাতে পারে। মুদ্রিত সংবাদপত্র টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে থাকে; কিন্তু অনলাইন কিংবা সম্প্রচারমাধ্যম বিনামূল্যেই সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। বাংলাদেশে শুধু *প্রথম আলো* ই-পেপার অনলাইনে সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া আর কোনো গণমাধ্যম সাবস্ক্রিপশন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে পাঠক/দর্শক ধরে রাখলে গণমাধ্যমে আয় যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই সংবাদের গুণমানও বৃদ্ধি পাবে। সংবাদের গুণমান নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি হবে। পাঠক/দর্শক সেই গণমাধ্যমকেই সাবস্ক্রাইব করবে, যে গণমাধ্যমের কনটেন্ট গুণমানসম্পন্ন। তবে এক্ষেত্রে সরকার এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে কৌশলী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। গণমাধ্যমের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সাংবাদিকদের চাকরির নিশ্চয়তা যেন থাকে, সেই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

বড়ো বড়ো গণমাধ্যমের সঙ্গে ছোটো গণমাধ্যমগুলোও টিকিয়ে রাখার বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে আঞ্চলিক পর্যায়ের গণমাধ্যমগুলো। আঞ্চলিক গণমাধ্যমগুলোর কাছ থেকে যদি ঢাকা থেকে প্রকাশিত/প্রচারিত বড়ো গণমাধ্যমগুলো নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মাসভিত্তিক বা নির্দিষ্ট সংবাদ সেবা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে আঞ্চলিক গণমাধ্যমগুলোর আয়ের ব্যবস্থা হয়। অন্যদিকে এই সুবিধা চালুর সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক গণমাধ্যমের সঙ্গে মার্জ করার মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক গণমাধ্যমেরও ব্যয় সংকোচন হতে পারে। এভাবে দুই ধরনের গণমাধ্যমেরই আয়ের সংস্থান করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ তথা বিশ্ব যে কোনো সময় জরুরি মুহূর্তের মধ্যে পড়তে পারে। কোভিড-১৯ এমন শিক্ষাই দিয়েছে। কোভিড-১৯ হঠাৎ করে পুরো বিশ্ব থমকে দিয়েছে। এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত জরুরি পরিস্থিতিতে সবাই সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। তাই এই সমস্যা সমাধানে সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকেও জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। না হলে অনেক সাংবাদিক সংকটের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। যেমনটা আমরা কোভিড-১৯-এ দেখতে পেরেছি। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে কর্মরত সবার বেতনের সমন্বয়সাধনের (অস্থায়ী) মাধ্যমে সাময়িকভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা যেতে পারে।

করোনা-পরবর্তী নয়া স্বাভাবিকতায় সাংবাদিকদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য সংগ্রহ করা। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই)-এর নির্বাহী কর্মকর্তা বারবারা ত্রিয়নফি বলেছেন, 'স্বাধীন সংবাদের অবাধ প্রবাহ এই পরিস্থিতিতে আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। জনগণকে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখার পাশাপাশি সেই ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে একটি মুক্ত আলোচনা ও বিতর্ক বজায় রাখা জরুরি। এগুলো গণমাধ্যমের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়।' (IPI, 2020)

কিন্তু করোনাকালে স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানামুখী বাধার শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। অনেকে আবার কোভিড-১৯-এর অজুহাতে তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। সেই সঙ্গে গুজব বা ফেক নিউজ তো রয়েছেই। বিভ্রান্তিকর তথ্য ও গুজবের কারণে করোনাভাইরাসের সময়ে কমপক্ষে ৮০০ মানুষ এমনকি এর চেয়েও বেশি মানুষ মারা যেতে পারেন বলে আমেরিকান জার্নাল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং হাইজিনে দেখানো হয়েছে (DW,

2020)। এমন পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্টিংয়ে কীভাবে নয়া স্বাভাবিকতায় সাংবাদিকতা টিকিয়ে রাখা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা জরুরি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহের বিকল্প উপায় নিশ্চিতকরণ, সংবাদের গুণমান, তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও ডাক্তারদের তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ, গুজব-বিভ্রান্তিকর তথ্য চিহ্নিতকরণ সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নয়া স্বাভাবিকতায় সাংবাদিকতা টিকে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টসের (আইএফজে) সাধারণ সম্পাদক অ্যান্থনি বেল্যাঞ্জার কোভিড-১৯-এর সাংবাদিকতার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাংবাদিকদের কাজ করার পদ্ধতি বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করতে বলেছেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিকতায় আরও বেশি ভাগাভাগি, আরও বেশি ন্যায়সংগত, আরও বেশি নৈতিকতার প্রতি জোর দিয়েছেন (Bellanger, 2020)। কোভিড-১৯-এর কারণে সাংবাদিকদের টিকে থাকা অনেক কঠিন। এমন অবস্থায় সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সর্বাগ্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। তবে এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে– সংবাদের গুণমান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সংবাদের গুণমানের ওপর নির্ভর করছে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সুনাম। সংবাদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একধরনের সমন্বয় তৈরি করলে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের বিকল্প উপায় নিশ্চিতকরণ। সাদামাটা সংবাদ প্রতিবেদন সংগ্রহের ক্ষেত্রে সব গণমাধ্যম নিজেদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে। অনুসন্ধানী বা বিশেষ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রটি ভিন্ন। গণমাধ্যমগুলো নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করলে একটি সংবাদ সংগ্রহে যেখানে ২০ বা ৩০টি গণমাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন, সেখানে ২ বা ৩টি গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সেই সংবাদ সংগ্রহ করে প্রত্যেকের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন। এতে সাংবাদিকদের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যেতে পারে। এই পদ্ধতি জরুরি পরিস্থিতিতে কিংবা নয়া স্বাভাবিকতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাংবাদিকদের প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য সংগ্রহ কিংবা তথ্য সংগ্রহের বিকল্প উপায় নিশ্চিতকরণের ফলে অনেকেই এর সুযোগ নিয়ে তথ্যে প্রবেশযোগ্যতা সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একজন সাংবাদিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছেন; কিন্তু তথ্য প্রদানকারী ফোন ধরছেন না বা অনলাইনে সাক্ষাৎকার প্রদান করতে সহযোগিতা করছেন না কিংবা তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ছেন। এমন পরিস্থিতিতে সাংবাদিক কীভাবে সংবাদের গুণমান নিশ্চিত করবেন? এজন্য তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার ও সাংবাদিক সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। কোভিড-১৯-এর মতো জরুরি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও ডাক্তারদের তথ্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সাংবাদিক সঠিক সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন না। গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্যও নয়া স্বাভাবিকতায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। তথাকথিত 'ইনফোডেমিক'-এর কারণে গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। ডয়েচে ভেলের প্রকাশিত প্রতিবেদনে শত শত মানুষ মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এই কারণে নয়া স্বাভাবিকতায় গণমাধ্যমগুলোকে গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। গণমাধ্যমগুলো বিশেষভাবে গুজব, ভুয়া খবর, বিভ্রান্তিকর তথ্য চিহ্নিত করে খবর প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে গুজব, ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়বে। তবে নয়া স্বাভাবিকতায় সবচেয়ে বেশি জরুরি সাংবাদিকদের দক্ষতা। একজন দক্ষ সাংবাদিক এসব বাধা দূর করে টেকসই সাংবাদিকতায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তথ্যসূত্র

* আসাদুজ্জামান (২০২০), করোনায় কাজ হারিয়ে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ, *প্রথম আলো*, ২৪ জুন ২০২০, Retrieved from: https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ করোনায় কাজ হারিয়ে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ, on 17 September 2020
* কালের কণ্ঠ (২০২০), বকেয়া বিল দ্রুত পরিশোধের তাগিদ, ২০ মে ২০২০, Retrieved from: https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/05/20/913792, on 17 September 2020
* বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০২০, ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বন্ধের কবরে ক্ষুব্ধ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টরা, Retrieved from: https://m.banglanews24.com/economics-business/news/bd/796121.details, on 17 September 2020
* শরিফুজ্জামান (২০২০), ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা বন্ধ ২৫৪টি, *প্রথম আলো*, ৩ জুলাই ২০২০, Retrieved from: https://www.prothomalo.com/bangladesh/ ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা বন্ধ ২৫৪টি, on 17 September 2020
* স্বপন, হারুন উর রশিদ (২০২০), করোনায় কাজ হারাচ্ছেন সাংবাদিকরা, ডয়েচে ভেলে, ২২ জুলাই ২০২০, Retrieved from: https://www.dw.com/bn/ করোনায় কাজ হারাচ্ছেন সাংবাদিকরা /a-54267379, on 19 September 2020
* Bellanger, Anthony (2020). The Media and the New Normal. Retrieved from: https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/the-media-and-the-new-normal.html, on 17 September 2020
* Chinula, Mandla (2017). 7 business models that could save the future of journalism. Retrieved from: https://ijnet.org/en/story/7-business-models-could-save-future-journalism, on 18 September 2020
* DVorkin, Lewis (2012). Inside Forbes: The 9 Realities of Building a Sustainable Model for Journalism. *Forbes*. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/lewisdvorkin/2012/04/30/inside-forbes-the-9-realities-of-building-a-sustainable-model-for-journalism/#1c7264675f77, on 16 Septemer 2020.
* DW (2020). GMF digital session: Will digitalization save local journalism? Retrieved from: https://www.dw.com/en/gmf-digital-session-will-digitalization-save-local-journalism/a-54518300, on 20 September 2020
* DW (2020a). Spread of coronavirus fake news causes hundreds of deaths**.** Retrieved from: https://www.dw.com/en/gmf-digital-session-will-digitalization-save-local-journalism/a-54518300, on 20 September 2020
* Heinlein, Robert A. (1966). *The Moon Is a Harsh Mistress*. Tom Doherty Associates: USA
* IPI (2020). COVID-19: Number of Media Freedom Violations by Region. Retrieved from: https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/, on 20 September 2020
* Reza, Syed Ishtiaque (2020). Bangladesh media: Pre and post-Covid-19 realities and opportunities. *The Business Standard*. Retrieved from: https://tbsnews.net/thoughts/bangladesh-media-pre-and-post-covid-19-realities-and-opportunities-133591, on 19 September 2020
* Sandman, Peter M. and Lanard, Jody (2005). "Bird Flu: Communicating the Risk". *Pan american Health Organisation / World Health Organisation*. P. 5. Retrieved 25 August 2020.

লেখক: প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

কোন পথে অর্থনীতি কীভাবে পুনরুদ্ধার

শওকত হোসেন

যখন করোনাভাইরাস প্রথম দেখা দিল, শুরু হলো লকডাউন– শুরু হয়ে গেল একটা তর্কবিতর্ক। জীবন না জীবিকা? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) শুরু থেকেই বলে আসছে জীবন বাঁচানোর কথা। তবে অর্থনীতি থমকে যাওয়ায় জীবিকার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। একসময় তো বিতর্কই শুরু হয়ে গেল– জীবন না জীবিকা। পরে অবশ্য একধরনের সমঝোতা হয়। বলা হতে থাকে, জীবন বাঁচাতে হবে, জীবিকাও রক্ষা করতে হবে। আর দুটোই করতে হবে পাশাপাশি। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়।

> বলা হতে থাকে, জীবন বাঁচাতে হবে, জীবিকাও রক্ষা করতে হবে। আর দুটোই করতে হবে পাশাপাশি। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়

আর এখন তো, জীবিকা রক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছে। দুনিয়াজুড়েই লকডাউন-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। পাশাপাশি সংক্রমণও থেমে নেই। আশঙ্কা আছে, কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ধাক্কার। তবে সব দেশই এখন অর্থনীতি বাঁচানোর দিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আর অপেক্ষা ভ্যাকসিন বা টিকার।

শুরুতেই দুটি যৌথ বক্তব্য এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি। এপ্রিলে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফলো বলেছিলেন, 'এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো মানুষের জীবন বাঁচানো, অদূর

ভবিষ্যতে বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দেবে তাদের কাজে ফেরানো। তার পরবর্তী সময়ের সমস্যা, স্বাভাবিক অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়া। আজ আমরা প্রাণ বাঁচাতে যা করছি, তার পরিণাম বড়ো হতে হতে যেন ভবিষ্যতে জীবিকা হারানোর কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, তা দেখতে হবে।'

আরেকটি বক্তব্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার। জীবন ও জীবিকা নিয়ে বিতর্ক ডালপালা ছড়ানো শুরু হলে এই দুজন যৌথ নামে একটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন। লেখাটির শিরোনাম ছিল 'জীবন রক্ষা না চাকরি রক্ষা– এটা একটি মিথ্যা উভয় সংকট'। তারা লিখেছিলেন, 'জীবন ও জীবিকা– আসলে দুটোই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষকে কর্মে ফিরিয়ে আনার কাজটি একই সঙ্গে করতে হবে, একটির আরেকটি বিকল্প হিসেবে নয়।'

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসের প্রথম দেখা মেলে চীনে। তবে বিশ্ববাসী জানতে পারে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ বিশ শুরুই হয় বিষ নিয়ে। অর্থনীতির দিক থেকে ২০১৯ যে খুব ভালো ছিল, তা বলা যাবে না। তখনই বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার পদধ্বনি ছিল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ মন্দার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই মন্দা শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে কোভিড-১৯। তা-ও সেই চীনের হাত ধরেই। আর ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের মতো শোনালেও এটাই এখন পর্যন্ত সত্যি যে, করোনাভাইরাসে আক্রান্তের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রই।

মন্দার আশঙ্কায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই এপ্রিলেই লিখেছিলেন, 'আন্দাজ হয়, ছয় মাস এই যুদ্ধ চলবে, হয়তো খুব বেশি প্রাণক্ষয় হবে না। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির পতন হবে। ধনী দেশগুলো বাইরে থেকে কেনা বন্ধ করে দেবে। আমরা এক বিপুল মন্দা দেখব। শেয়ারবাজারে ধস নেমেছে। মধ্যবিত্তের আয় কমেছে। এই সময়ের পরে ক্রেতারা উৎসাহের সঙ্গে জিনিসপত্র কিনবে, তার আশা কম।'

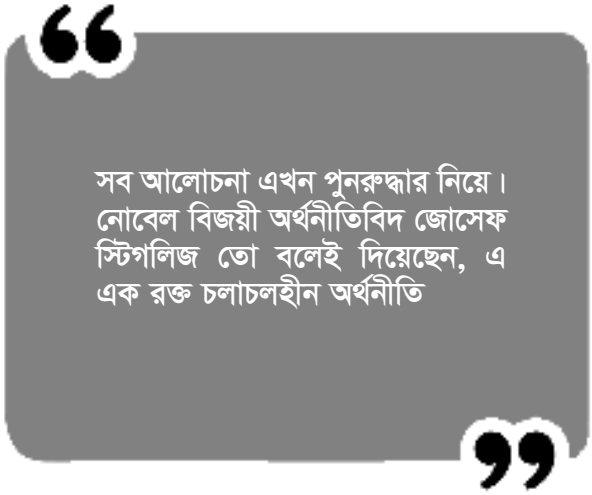

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি কথাই সত্য হয়েছে। তবে এই যুদ্ধ ৬ মাস চলবে, সেটি ঠিক হয়নি। কোভিড-১৯ নিয়ে নিয়ে যুদ্ধ যে কত দিন চলবে, এখনো বলা কঠিন। এখন তো শুরু হয়েছে টিকা-যুদ্ধ। কার্যকরী টিকা আবিষ্কারই সব সমস্যার সমাধান দেবে না, সব দেশ যাতে টিকা পায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাহলেই কাটবে অনিশ্চিয়তা। ততদিন পর্যন্ত অর্থনীতি নিয়েও দুশ্চিন্তা থেকে যাবে। কেননা অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে ভোক্তারা কেনাকাটা কমিয়ে দেয়। মানুষের আয় কমে যায়, চাকরিহারা হয় অনেকে, সামনে আরও চাকরি চলে যেতে পারে– এই আশঙ্কাও থাকে। মানুষ হাতে থাকা অর্থ খরচ করতে চায় না বলে সামগ্রিক চাহিদায় ধস নামে। এতে নতুন বিনিয়োগ কমে যায়, তাতে নতুন চাকরিও তৈরি হয় না। তখন মন্দা আরও তীব্র হয়। এ রকম একসময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের হাতে টাকা রাখার ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন দেশ তাই এরই মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থের তহবিল গঠনের ঘোষণা দিচ্ছে। কমছে ব্যাংক ঋণের সুদ। এরও একটি বিপদ আছে। এতেও যদি উৎপাদন না বাড়ে, তাহলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মূল্যস্ফীতি বাড়ল; কিন্তু চাকরির সৃষ্টি হলো না– এটিও নতুন ধরনের সংকট। যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশন।

কোন পথে পুনরুদ্ধার

মন্দা হবে কি হবে না– এ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক নেই। সব আলোচনা এখন পুনরুদ্ধার নিয়ে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ তো বলেই দিয়েছেন, এ এক রক্ত চলাচলহীন অর্থনীতি। বড়ো বড়ো সব অর্থনীতির দেশই এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দায় থাকার কথা ঘোষণা দিয়েছে। বড়ো অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে চীন। সবার আগে আক্রান্ত চীন দ্রুত সামলে নিয়েছে বলে তাদের অবস্থান ভালো। বড়ো অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এমনকি পাশের দেশ ভারত বেশ বিপাকেই আছে। ২০২২ সালের আগে অর্থনীতি ঠিকঠাক হবে– এমনটা কেউই মনে করছেন না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন– এই পুনরুদ্ধার কোন পথে।

জোসেফ স্টিগলিজ লিখেছেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে ভাবা হয়েছিল অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অনেকটা 'ভি' আকৃতির হবে। এর মানে, যে গতিতে অর্থনীতি নেমেছে, সেই গতিতে উঠবে। সবার প্রত্যাশা এটাই। অর্থাৎ দ্রুত পতন এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার। তবে কাজটা এভাবেই হবে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না।

তাই অর্থনীতিবিদরা আরও তিন ধরনের পুনরুদ্ধারের কথা বলছেন। এর মধ্যে 'ইউ' আকৃতির পুনরুদ্ধার হচ্ছে অর্থনীতির পতন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা অব্যাহত থাকার পর পুনরুদ্ধার। বিশ্লেষকদের বড়ো অংশই মনে করে বিশ্ব অর্থনীতি এ দিকেই এগোচ্ছে। খারাপ হবে যদি পুনরুদ্ধার হয় 'ডব্লিউ' আকৃতির। অর্থাৎ পতনের

পরে দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে ঠিকই; কিন্তু এরপরেই আবার বড়ো পতন। প্রণোদনাসহ সরকারের বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপে অর্থনীতি উঠে দাঁড়াল ঠিকই; কিন্তু মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ায় আবার পতন। এই দ্বিমুখী পতন অর্থনীতির জন্য মোটেই ভালো নয়। তবে এর চেয়েও খারাপ 'এল' আকৃতির মন্দা। এর অর্থ অর্থনীতি দীর্ঘস্থায়ী মন্দায়।

বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে মন্দা নতুন কিছু না। ত্রিশ দশকের মহামন্দার পরও অসংখ্য মন্দা দেখেছে বিশ্ব। তবে মহামন্দার পর এবারই যে সবচেয়ে বড়ো মন্দা হতে যাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পুনরুদ্ধার 'ভি' আকৃতির হোক, 'এল' নয়।

ধনী দেশগুলোর সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) সবশেষ প্রতিবেদন অবশ্য কিছুটা আশা বাড়াচ্ছে। তারা বলছে, যতটা খারাপ হবে বলে ভাবা হচ্ছে, পরিস্থিতি ততটা খারাপ না-ও হতে পারে। কেননা কোভিড-১৯-এর প্রভাবে চলতি বছরে প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৪ শতাংশ কমলেও আগামী বছর প্রবৃদ্ধি বাড়বে ৫ শতাংশ হারে। সংস্থাটির হিসাবে কোভিড-১৯-এ ক্ষতির পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন ডলার হতে পারে (১ ট্রিলিয়ন সমান ৭ লাখ কোটি)।

বাংলাদেশ কোন পথে

২০০৮ সাল ছিল সর্বশেষ মন্দার সময়। সারাবিশ্ব তখন মন্দায় আক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের ওপর এর আঁচ ছিল না। সেই মন্দা বরং বাংলাদেশের জন্য ভালোই ছিল। সেই মন্দার আগে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের পণ্যমূল্য ছিল চড়া। বাড়ছিল খাদ্যের দামও। হন্যে হয়ে বিশ্ববাজারে চাল খুঁজেছে বাংলাদেশ। জ্বালানি তেলের দামও বাড়ছিল। সব মিলিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল নিত্যপণ্যের দাম। বাড়ছিল মানুষের মধ্যে অসন্তোষ। কিন্তু বিশ্ব মন্দা সেই সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিল বাংলাদেশকে। মন্দার কারণে জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণে কমে গেলে এর প্রভাব পড়ে বিশ্ব পণ্যবাজারে। আর এতে লাভবান হয়েছিল বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশ। এমনকি তখন পোশাক রফতানিও বড়ো ধাক্কা খায়নি।

তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ এবার কেবল আন্তর্জাতিক বাজার বন্ধ ছিল তা নয়, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও ছিল কার্যত অচল। মার্চের শেষ সপ্তাহে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি শুরু হয়। জুন থেকে অল্প অল্প করে খোলা শুরু। সবার আগে কাজে ফেরেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। তারপরও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি সরকার দেখাচ্ছে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ। যদিও এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা অর্থবছরের শেষ তিন মাসে অর্থনীতিতে তেমন কোনো কাজই হয়নি। আর এর আগের ৯ মাসে প্রবাসী আয় ছাড়া অর্থনীতির অন্য সূচকগুলো খুব ভালো ছিল না।

তবে নতুন অর্থবছর সুখবর নিয়ে এসেছে। প্রবাসী আয় বেড়েছে, রফতানি আয়েও ইতিবাচক ধারা। এমনকি কৃষির ফলনও বেশ ভালো। অর্থবছরের বাকি সময়টায় এই ইতিবাচক ধারা ধরে রাখতে পারলে সেটাই হবে সত্যিকারের অর্জন। খুব কম দেশই নতুন অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারবে।

তবে আশঙ্কার কথাও বলা প্রয়োজন। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা তহবিলের দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। বিশেষ করে যারা ছোটো, তাদের এই তহবিল বেশি প্রয়োজন। আবার যারা অনানুষ্ঠানিক খাতে আছে, তাদের দরকার বাড়তি মনোযোগ। অর্থনীতির বড়ো অংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানও এই খাতে। অর্থনীতির পুনরুদ্ধার বেসরকারি খাতের হাত ধরে হতে হবে। আমরা আশা করতেই পারি, বাংলাদেশের পুনরুদ্ধার হবে 'ভি' আকৃতির এবং পুনরুদ্ধার পর্ব শুরুই হয়ে গেছে।

লেখক: বিশেষ বার্তা সম্পাদক, প্রথম আলো

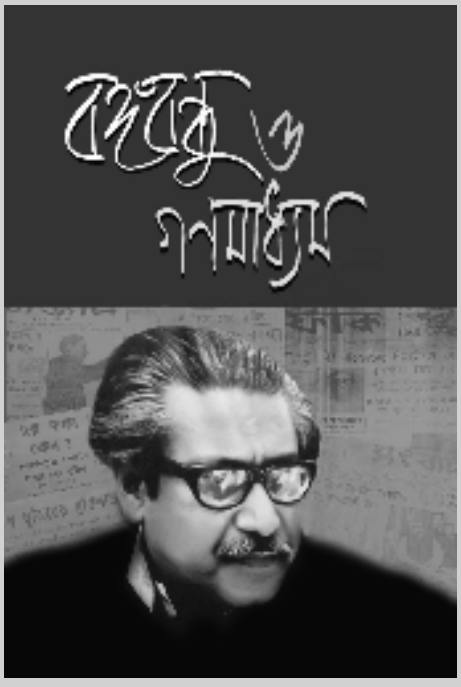

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কোভিড যখন সঙ্গে কীভাবে করবেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

‘সরকার তথ্য দিচ্ছে না, এই বলে ঘ্যানঘ্যান (নাকি কান্না) বন্ধ করতে হবে সাংবাদিকদের।’ এই উক্তিটি বসনিয়ার অনুসন্ধানী সাংবাদিক মিরান্ডা প্যাট্রুচিচের। বার্তাটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য। এর মানে হচ্ছে, করোনা মহামারির কারণে আমাদের সমাজে যে একধরনের মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, তা মেনে নিতে হবে। কোভিড-১৯ থাকবে, তাই আমাদেরও ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত এবং তার নেপথ্যের ব্যক্তিদের স্বরূপ উন্মোচনে নতুন ও সৃজনশীল সব কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।

বৈশ্বিক এই সংকটের ছয় মাস ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা নিজেদের আবিষ্কার করছেন একটি অনিশ্চয়তা ও হতাশাভরা জগতে। যেখানে এখন পর্যন্ত চাকরি হারিয়েছেন কোটি কোটি মানুষ, আর প্রাণ হারিয়েছেন ১০ লাখের বেশি।

> মহামারি শুরুর পর থেকে গণহারে মৃত্যুর শিকার হওয়া মানুষের মানবিক গল্পগুলো তুলে এনেছেন সাংবাদিকরা। উন্মোচন করেছেন সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ চেইনের নানা দুর্নীতি-অনিয়ম

মহামারি শুরুর পর থেকে গণহারে মৃত্যুর শিকার হওয়া মানুষের মানবিক গল্পগুলো তুলে এনেছেন সাংবাদিকরা। উন্মোচন করেছেন সরকারি ক্রয় ও

সরবরাহ চেইনের নানা দুর্নীতি-অনিয়ম। কখনো কখনো এই কাজ করতে গিয়ে তারা জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন। তবে এখন অনেক সাংবাদিকই তাদের দৃষ্টি ঘোরাচ্ছেন টিকা আবিষ্কার এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মতো বিষয়ের দিকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তথ্যের নতুন উৎস ও দুর্নীতির ডেটা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আরও ভালো কাজ করতে হবে নিউজরুমগুলোকে। তাদের দৃষ্টি দিতে হবে অস্বস্তিকর অনেক বিষয়ের দিকেও। যেমন– লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব। একই সঙ্গে মহামারির বাইরের বিষয়গুলো নিয়েও অনুসন্ধান শুরু করতে হবে।

জিআইজেএনের ইনভেস্টিগেটিং দ্য প্যানডেমিক ওয়েবিনার সিরিজের সর্বশেষ পর্বে বসনিয়া, ভারত, উগান্ডা ও যুক্তরাষ্ট্রের চার সাংবাদিক আলোচনা করেছেন কোভিড-১৯ নিয়ে কেমন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে এবং আগামী দিনে কেমন অনুসন্ধান হতে পারে। ভবিষ্যতের রিপোর্টিংয়ের কিছু কৌশলও তারা তাদের আলোচনায় বাতলে দিয়েছেন।

'এটা ঠিক, অনেক সরকারের কর্মকাণ্ডই এই সময়টায় স্বচ্ছ ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে দোষারোপের চেয়ে আমাদের বরং তথ্য পাওয়ার নতুন নতুন সব উপায় ও সোর্স খুঁজে বের করা দরকার। সব দেশের সরকারই শুরুতে অপ্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরেও কি তারা পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছে? যেসব যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা উপকরণ দেশে ঢুকেছে, সেগুলো কি সত্যিই হাসপাতালগুলোয় পৌঁছেছে', প্রশ্ন রাখেন অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) মধ্য এশিয়া বিভাগের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক প্যাট্রুচিচ।

করোনা পরিস্থিতির কারণে বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি কর্মকর্তারা এখন উন্মুক্ত বৈঠকের বদলে প্রাইভেট অনলাইন সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নথিপত্র প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে বা গোপন রাখা হচ্ছে। বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান প্যাট্রুচিচ।

এটা ঠিক, অনেক সরকারের কর্মকাণ্ডই এই সময়টায় স্বচ্ছ ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে দোষারোপের চেয়ে আমাদের বরং তথ্য পাওয়ার নতুন নতুন সব উপায় ও সোর্স খুঁজে বের করা দরকার। সব দেশের সরকারই শুরুতে অপ্রস্তুত ছিল

'গত ছয় মাসে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, আর অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে রাতারাতি বদলে ফেলা নিয়মনীতিগুলো। কারণ, সরকারি অনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনলাইনে, যার কথা অনেক ক্ষেত্রেই গোপন থেকে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও সভাগুলোর কার্যবিবরণীও হারিয়ে গেছে। আমার এলাকায় অন্যায়ভাবে বাঁধ তৈরির নজির থেকে বলতে পারি, লকডাউনের এই সময়ে এমন অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেগুলো অন্য সময়ে নেওয়া হলে মানুষ প্রতিবাদ করত', বলেন প্যাট্রুচিচ।

বসনিয়ার এই সাংবাদিকের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচন, 'জনসাধারণ কতটা ঝুঁকির মুখে আছে এবং সরকারগুলো তাদের ক্ষমতা সংহত করার জন্য কী কী করছে, তা বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি বড়ো ইস্যু। নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সরকারগুলো এই মহামারিকে নানাভাবে ব্যবহার করছে এবং সমর্থন আদায় করছে।'

আরেকটি মারাত্মক বিষয় সাংবাদিকদের মনোযোগ দাবি করে। তা হলো– মহামারির সময়ে অনেক সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র তাদের ভাবমূর্তি উন্নয়নের চেষ্টা করছে। প্যাট্রুচিচ জানান, 'আমি এমন কিছু ঘটনা দেখছি, যেখানে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সদস্যরা সামনে আসছেন কোভিডের ত্রাণ নিয়ে। এমনকি তারা প্রচার-প্রচারণাও চালাচ্ছেন। এদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি পাওয়া ব্যক্তিও আছেন।'

চিকিৎসাবিষয়ক মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও লেখক জিন লেনজার বলেছেন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন বিশেষজ্ঞরাও মহামারির কাভারেজে বড়ো ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক এই তালিকা রিপোর্টারদের জন্য একটি শক্তিশালী রিসোর্স হয়ে উঠছে। তিনি জানান, খুব সতর্ক পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি তৈরি করা হয়েছে, যা ক্রমাগত বড়ো হচ্ছে। এই তালিকা প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা ও সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। আমি সব সাংবাদিককে বলব, এটি কাজে লাগান। চাইলে আপনিও এখানে নাম যোগ করতে পারেন। তাদের কোনো স্বার্থসংঘাত আছে কি না, তা যাচাই করে আমরা সেটি প্রকাশ করব।' একই সঙ্গে মহামারির সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা দাবির সত্যতা যাচাইয়ের এই টিপশিটের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

অস্বস্তিকর কিন্তু সত্যি এমন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের নতুন করে ভাবার আহ্বান জানান লেনজার। আর তা হলো– কর্তৃত্বপরায়ণ বা উগ্র ডানপন্থি কোনো নেতা কোভিড-১৯ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভাষ্য প্রচার করছেন বলেই সেটি মিথ্যা হতে হবে অথবা সেটি আমলে আনা যাবে না, এমন কোনো কথা নেই। অতীতের মহামারি এবং গত ছয় মাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমরা জানতে পারিনি কোন ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভালো কাজ করে। ব্যাপারটিকে বেশ অবাক করার মতো বলেই মনে করেন লেনজার। তিনি বলেন, প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ভাইরাসটির চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। কর্তৃত্ববাদী নেতাদের এমন দাবির পক্ষেও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধান দরকার।

'আমি জানি, প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসেবে এই কথাগুলো হয়তো আমার বলার কথা না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, মানুষ প্রতিদিন কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছে। হয়তো প্রতি ১০ হাজারে একজন; কিন্তু এটি একটি বাস্তব ঝুঁকি। আবার অন্যদিকে কালই হয়তো আমাকে গৃহহীন হতে হবে আমার কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে', বলেন লেনজার।

'আমরা জানি, চাকরি হারানো ও সম্পদবৈষম্যের কারণেও মানুষ মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সহিংসতা ও হতাশাজনিত মৃত্যু বাড়ছে কি না, সেদিকেও আমরা নজর দিতে পারি। কোভিড মোকাবিলায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর ক্ষতিকর দিকের পাশাপাশি সুবিধাজনক দিকগুলো নিয়েও আমাদের রিপোর্ট করা উচিত।' এ বিষয়ে শেলডন ওয়াটসের 'মহামারি ও ইতিহাস: অসুখ, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদ' বইটির কথা উল্লেখ করেন লেনজার।

আফ্রিকান সেন্টার ফর মিডিয়া এক্সিলেন্সের (এসিএমই) সহ-প্রতিষ্ঠাতা পিটার মোয়েসিজও লেনজারের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনিও সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ-নীতিমালার ক্ষতিকর দিকগুলো খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, কোন উদ্দেশ্যে এসব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কারা সম্পৃক্ত ছিল, তা-ও সাংবাদিকদের খুঁজে দেখা দরকার।

রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে কোনো নীতিমালা বা পদক্ষেপের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগে কীভাবে সেই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় বা এর পেছনে কী ধরনের প্রভাব বা তৎপরতা থাকে, এ নিয়ে পর্যাপ্ত রিপোর্টিং আমার চোখে পড়েনি, বলেছেন মোয়েসিজ। তিনি আরও বলেন, এসিএমই'র সাম্প্রতিক একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে, উগান্ডার গণমাধ্যমে কোভিড-১৯ কাভারেজে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের অবদান ছিল মাত্র ০.৪ শতাংশ। অনুসন্ধানের কাজে অনভিজ্ঞতা, লকডাউনের সীমাবদ্ধতা, সূত্র ও সম্ভাব্য হুইসেলব্লোয়ারদের মধ্যে ভীতি– এসব কারণ মিলিয়ে এই ভঙ্গুর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দিল্লিভিত্তিক ডেটালিডসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সোসাইটি অব এশিয়ান জার্নালিস্টসের সভাপতি সৈয়দ নাজাকত বলেন, টানা ছয় মাস প্রতিক্রিয়াধর্মী কোভিড কাভারেজ দেখতে দেখতে পাঠকের মধ্যে ক্লান্তি চলে এসেছে। ফলে এখন প্রতিবেদনের অ্যাঙ্গেল নিয়ে খুবই সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে হবে সম্পাদক ও রিপোর্টারদের। নাজাকাত বলেন, এই প্রতিবেদনগুলো পাঠক-দর্শকের জন্য আরও বেশি আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাটা এখন রিপোর্টারের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং পরিস্থিতিও এখন খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। ফলে প্রমাণভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের দিকে তাদের বেশি মনোযোগ দিতে হবে। যেন তারা নতুন ঝুঁকি ও গৃহীত পদক্ষেপের ফাঁকফোকর সম্পর্কে পাঠককে ভালোভাবে জানাতে পারেন। কোন কোন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, তা নির্ধারণ করতে পারাটাও সম্পাদকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। শুধু প্রতিক্রিয়াভিত্তিক প্রতিবেদন না করে রিপোর্টারদের কাজে লাগাতে হবে বড়ো ও পরিকল্পিত প্রতিবেদন তৈরিতে।

কোভিড মহামারির প্রভাব দিন দিন যেভাবে জটিল আকার ধারণ করছে, তা তুলে আনার জন্য আগামী দিনগুলোয় অনেক গভীর ও সৃজনশীলধারার সহযোগিতামূলক কাজ প্রয়োজন হবে বলে মন্তব্য করেন নাজাকাত। তিনি বলেন, বিষয়টির পরিধি অনেক বড়ো। এটি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এখানে স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত নানা আঙ্গিক জড়িয়ে আছে। এখানে আধাআধি ধরনের কিছু করার সুযোগ নেই। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে– কোন ক্ষেত্রগুলোয় আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি। সাংবাদিকদের বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য। আপনি ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে জানতে পারেন একটি এলাকায় কারা অসুস্থ বা মারা গেছে; সাবেক সেনা কর্মকর্তারাও হতে পারেন ভালো সূত্র। আইনজীবীদের কাছে বিপুল নথিপত্রের ভাণ্ডার আছে। এগুলো থেকেও কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দারুণ সব তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

মহামারির সময়ে দারুণ কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উদাহরণও উঠে এসেছে এই ওয়েবিনারে। এগুলোর মধ্যে ছিল:

১. দোজ উই হ্যাভ লস্ট– নিউইয়র্ক টাইমসের এই সিরিজে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যার পেছনের মানবিক গল্পগুলো তুলে আনা হয়েছে। এই ধরনের বেশকিছু প্রতিবেদন বিশ্বজুড়েই দেখা গেছে।

২. কোশ্চেনেবল পেপারওয়ার্ক লেটস ফেক অ্যান্ড ফল্টি মাস্কস ফ্লাড ইউরোপ– ওসিসিআরপির এই ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধানী রিপোর্টিং থেকে দেখা গেছে, অনুমোদন সনদে সমস্যার কারণে গোটা ইউরোপে কীভাবে নিম্নমানের পিপিই আমদানি করা হয়েছে।

৩. 'ডার্ক মানি' পস পুশড ট্রাম্প টু ব্যাক আনপ্রুভেন কোভিড-১৯ ট্রিটমেন্ট– ওপেনসিক্রেটসের জন্য এই অনুসন্ধানটি করেছেন তাতিয়ানা মোনে। তিনি দেখিয়েছেন, কোভিড-১৯-এর একটি অপ্রমাণিত চিকিৎসা পদ্ধতির কথা প্রচার করতে কীভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে একটি রক্ষণশীল গ্রুপ এবং এই কাজের জন্য তাদেরকে অনুদান দিয়েছে ওষুধ ব্যবসায়ীদের একটি বড়ো সংগঠন।

৪. দ্য আয়েস হ্যাভ ইট– মহামারি মোকাবিলার জন্য যে বাজেট তৈরি করা হয়েছিল, সেখান থেকে কীভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন উগান্ডার সংসদ সদস্যরা। এনবিএসের এই বিশেষ টিভি প্রতিবেদনে সেটিই দেখিয়েছেন সলোমন সেরওয়ানজিয়া।

৫. কাউন্টিং দ্য কস্টস অব লকডাউন রাইটস অ্যাবিউজ– উগান্ডায় পুলিশ কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তার বিশদ অনুসন্ধান করা হয়েছে ডেইলি মনিটরের এই প্রতিবেদনে।

৬. হোয়াট লকডাউন? ওয়ার্ল্ডস কোকেইন ট্রাফিকার্স স্লিফ অ্যাট মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন– প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ওসিসিআরপি।

৭. দ্য লাস্ট চ্যান্স– ৬০ লাখ নথিপত্র বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক বন্যপ্রাণী কেনাবেচার ওপর এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে হেলথ অ্যানালিটিক এশিয়া। এখানে দেখানো হয়েছে সার্স ভাইরাস উদ্ভবের সঙ্গে গভীর সংযোগ থাকা সত্ত্বেও গত ৩৩ বছরে জীবিত বন্যপ্রাণী কেনাবেচার পরিমাণ বেড়েছে ৭৫০ শতাংশ। আর প্রতিরোধের জন্য নেওয়া নীতিমালা তেমন কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের এই প্যানেল যে বিষয়টিতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে: অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তাদের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করতে হবে। প্যাট্রুচিচ যেমন বলেছেন, 'কোভিড এখন আমাদের সঙ্গেই থাকবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে আমাদের এখন গুরুত্বপূর্ণ অনেক দিকে নজর রাখতে হবে। অন্যান্য বিষয় নিয়েও ফের অনুসন্ধান শুরু করতে হবে।'

সৌজন্যে: জিআইজেএন
সম্পাদনা: দুলাল আচার্য

বাংলাদেশে করোনাকালীন সাংবাদিকতা

আক্রান্ত সাংবাদিকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সুরক্ষা কৌশল অনুসন্ধান

মাহামুদুল হক

‘Journalists are on the frontline and put their safety in peril every day to bring citizens reliable and verified information on the pandemic. Their contribution has been invaluable for us all. But many lack protective equipment and access to healthcare, and some have been made to pay the ultimate price for their coverage of the health crisis.’ -Audrey Azoulay, Director-General of Unesco.

ক. ভূমিকা

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য সাংবাদিককে ঝুঁকি এড়াতে বিভিন্ন সতর্কতামূলক নিরাপত্তা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এসব কৌশল নির্ভর করে একজন রিপোর্টার কোন ধরনের বিষয় নিয়ে রিপোর্টিং করছেন তার ওপর। যুদ্ধ, হরতাল-সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের জন্য পৃথক পৃথক নিরাপত্তা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এসব সুরক্ষা বা নিরাপত্তা কৌশলের রকমফের হয় ওইসব বিষয়ের বিস্তার ও ভয়াবহতার মাত্রার ওপর। যেমন– ম্যালেরিয়া,

“যুদ্ধ, হরতাল-সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের জন্য পৃথক পৃথক নিরাপত্তা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এসব সুরক্ষা বা নিরাপত্তা কৌশলের রকমফের হয় ওইসব বিষয়ের বিস্তার ও ভয়াবহতার মাত্রার ওপর”

ইবোলা, নিপাহ, মার্স, সার্স এবং চিকুনগুনিয়াও সংক্রামক রোগ। কিন্তু এসব সংক্রামক রোগের বিস্তার ও ভয়াবহতা বর্তমানে চলমান নভেল করোনাভাইরাসের মতো এত ব্যাপকভবে বিস্তারলাভ করেনি। বিশ্বে নভেল করোনাভাইরাস এ যাবৎকালের মধ্যে ভয়াবহতম স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অতিমারিরূপে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ জনগণ, ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন নভেল করোনাভাইরাসে। করোনার কারণে সাংবাদিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। কারণ সাংবাদিকদের বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যারা রিপোর্টিং করেন, তাদেরকে সংক্রামক এলাকা ও হাসপাতাল পরিদর্শন করতে হয়। কথা বলতে হয় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, নীতিনির্ধারক এমনকি সাধারণ জনগণ এবং আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে রিপোর্টের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় সাংবাদিককে। এজন্য ব্রিটেনের স্বাস্থ্যবিষয়ক ম্যাগাজিন Pulse editor Kaffash (2020) বলেন, '... we are almost on a wartime footing and there are similar principles in play as there are to wartime reporting.' যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যেসব নিয়ম মানতে হয়, করোনার খবর বা করোনাকালীন যে কোনো খবর সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও তেমনটাই। করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা কৌশল মেনে না চললে সাংবাদিকের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। সাংবাদিকদের ফেসবুক গ্রুপ 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার'-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে ৮৩৩ জন সাংবাদিকের। এর মধ্যে করোনায় ১৯ জন সাংবাদিক মারা গেছেন এবং কোভিড-১৯ উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ১১ জন সাংবাদিক। আরও বহু সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন, যা অপ্রকাশিত রয়েই গেছে। কেন এত সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন, কোন ধরনের বা কোন গণমাধ্যমের সাংবাদিক বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন, কেন আক্রান্ত হচ্ছেন– এসব বিষয় অনুৎঘাটিত রয়েই গেছে। কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিক কীভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন, কী কী নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন, কোন পরিস্থিতিতে করছেন এবং সুরক্ষা কৌশলগুলো কি রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বা সংবাদ ব্যবস্থাপনায়, তা অনুসন্ধান করে করণীয় নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। কিন্তু এসব বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণাও হয়নি। তাই এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

বিশ্বে নভেল করোনাভাইরাস এ যাবৎকালের মধ্যে ভয়াবহতম স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অতিমারিরূপে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে

খ. গবেষণার উদ্দ্যেশ্যসমূহ

* করোনায় মৃত সাংবাদিক এবং করোনায় শনাক্তকৃত সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রের ধরন, কাজের ধরন ও স্থানভেদজনিত সংখ্যাগত বিশ্লেষণ এবং
* করোনাকালে সাংবাদিকের সুরক্ষা কৌশল পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ।

গ. গবেষণা পদ্ধতি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় তথ্যের ওপর নির্ভর করে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। তাই এটি পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণার সংমিশ্রণ। করোনাকালীন ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে সাংবাদিকদের রিপোর্টিং প্রক্রিয়া বিশেষ করে টেলিভিশন রিপোর্টিং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন অনলাইন গ্রুপ বা পোস্ট পর্যবেক্ষণের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এই গবেষক একজন সাংবাদিকও। সাংবাদিক হিসেবে নিজেও সাংবাদিক সংগঠন এবং ওই অনলাইন গ্রুপের সদস্য। সাংবাদিকদের মধ্য থেকে প্রধান তথ্য প্রদায়ক (Key Informant) নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পর্যবেক্ষণ টেলিফোন করে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষক ফেসবুকে এ সংক্রান্ত পোস্ট দিয়ে মতামত এবং পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান ও যাচাই করেছেন।

ঘ. করোনায় মৃত ও শনাক্ত সাংবাদিকদের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনাভাইরাসে ৯ লাখেরও ওপর মানুষ মারা গেছেন। আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ লাখের ওপর মানুষ। এ সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। বাংলাদেশে এ সময় পর্যন্ত ৪ হাজার ৭০২ জন করোনায় মারা গেছেন এবং শনাক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৪৪ জন। বিশ্বে কতজন সাংবাদিক করোনায় মারা গেছেন এবং কতজন আক্রান্ত হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। ২৪ মার্চ বিশ্বে সাংবাদিক হিসেবে প্রথম করোনায় মারা যান জিম্বাবুয়ের ৩০ বছর বয়সি টেলিভিশন সাংবাদিক জোরোরা মুকাম্বে। জেনেভাভিত্তিক প্রেস ইমব্লেম ক্যাম্পেইনের হিসাব অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ৪৩টি দেশে ২৬১ জন সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সব আক্রান্ত দেশের হিসাব এ গণনায় নেই। আবার যেসব

দেশের হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেখানেও সব আক্রান্ত ও মৃত সাংবাদিকদের সংখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি বা জানা যায়নি। প্রেস ইমব্লেম ক্যাম্পেইনের মহাসচিব Blaise Lempen বলেন, 'The actual figure is certainly higher, as journalists who died during this period have not been tested or their deaths have not been publicly announced.' কেননা পেরুতেই মার্চ-আগস্ট সময়ে কমপক্ষে ৮২ জন সাংবাদিক করোনায় মারা গেছেন। যদিও মৃত্যুর আগে অনেকে অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন এবং অনেকের বয়স ৬৫ বছরের ওপরে ছিল। পেরুর জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার মহাসচিব Zuliana Lainez বলেন, অনেক ক্ষেত্রে সংবাদ সম্মেলন অথবা সংবাদ কাভার করতে আসা-যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত করোনা সুরক্ষাসামগ্রী না থাকার কারণে ওইসব সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং অর্থের জন্য তারা কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি জানান, তার ওই সংস্থা দেখেছে যে করোনায় মৃত সাংবাদিকদের মধ্যে অর্ধেক আক্রান্ত হয়েছেন সাংবাদিকতার কাজ করতে গিয়ে বা অন্যান্য কারণে (Deccan Herald, 2020)। ৭ আগস্ট ইন্টার-আমেরিকা প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (আইএপিএ) করোনায় মৃত একশ সাংবাদিক এবং প্রেসকর্মীকে মরণোত্তর প্রেস ফ্রিডম গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে; কিন্তু কীভাবে করোনায় মারা গেলেন এসব সাংবাদিক, তার বিশ্লেষণ দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি (IAPA, 2020)। অসমর্থিত সূত্রমতে, ভারতে একশর বেশি গণমাধ্যমকর্মী করোনায় মারা গেছেন (Mujtaba, 2020)। এর মধ্যে রিপোর্টার, ফটোসাংবাদিক, ড্রাইভার এমনকি ডেস্ক স্টাফ রয়েছেন, যারা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র এবং অনলাইন মিডিয়ায় কাজ করতেন। অনেক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড-১৯ রোগীর সংস্পর্শে। এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এক সতর্কতামূলক বার্তায় সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যরত অবস্থায় যথাযথ স্বাস্থ্য এবং এ সংশ্লিষ্ট পূর্বসতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে (Mujtaba, 2020)।

বাংলাদেশে করোনায় মৃত সাংবাদিকদের পরিচিতি ও সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ৩ এপ্রিল সাংবাদিকদের মধ্যে প্রথম এক টেলিভিশন ক্যামেরাপারসন আক্রান্ত হন। তবে ২৮ এপ্রিল দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক ও প্রধান প্রতিবেদক হুমায়ুন কবীর খোকন সাংবাদিকদের মধ্যে প্রথম করোনায় মারা যান। সাংবাদিকদের ফেসবুক গ্রুপ 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার'-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে ৮৩৩ জন সাংবাদিকের। এর মধ্যে করোনায় ১৯ জন সাংবাদিক মারা গেছেন। এসব করোনা ভিকটিম ১৮৪টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক। উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ১১ জন সাংবাদিক, যারা ওই আক্রান্ত হওয়া সংখ্যার বাইরে। কেননা তাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়নি বলে জানান ওই ফেসবুক গ্রুপের প্রধান সমন্বয়ক আহম্মদ ফয়েজ। তিনি বলেন, বিভিন্ন জেলা-উপজেলার সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যোগাযোগ করে সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়ার পর তা যাচাই-বাছাই করে 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার' পেজে আপডেট করা হয়। তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, আক্রান্ত হওয়া সাংবাদিকদের সংখ্যা বাংলাদেশে তার চেয়েও অনেক বেশি।

টেবিল-১: করোনায় মৃত এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিকদের তালিকা (২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

করোনায় মৃত সাংবাদিক			করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিক		
গণমাধ্যমের নাম	করোনায় মৃত সাংবাদিকের পদবি, নাম ও সংখ্যা	মৃত্যুর তারিখ	গণমাধ্যমের নাম	কোভিড-১৯ উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিকের পদবি, নাম ও সংখ্যা	মৃত্যুর তারিখ
দৈনিক সময়ের আলো	নগর সম্পাদক ও প্রধান প্রতিবেদক হুমায়ুন কবীর খোকন (১)	২৮ এপ্রিল	দৈনিক সময়ের আলো	সিনিয়র সাব-এডিটর মাহমুদুল হাকিম অপু (১)	৬ মে
দৈনিক জবাবদিহি	সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার শেখ বারিউজ্জামান (১)	২৯ মে	দৈনিক ভোরের কাগজ	ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান (১)	৭ মে
এনটিভি	অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান মোস্তফা কামাল সৈয়দ এবং যুগ্ম প্রধান বার্তা সম্পাদক আবদুস শহীদ (২)	৩১ মে এবং ২৩ আগস্ট	দৈনিক বাংলাদেশের খবর	প্রধান আলোকচিত্রী মিজানুর রহমান খান (১)	২০ মে
ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল মোনায়েম খান এবং বার্তা সম্পাদক আব্দুল্লাহ এম হাসান (২)	৭ জুন এবং ১৭ জুলাই	দৈনিক বগুড়া	বার্তা সম্পাদক ওয়াসিউর রহমান রতন (১)	১১ জুন
দৈনিক উত্তরকোণ (বগুড়া)	সম্পাদক মোজাম্মেল হক (১)	১১ জুন	আজকের সিলেট ডটকম	বালাগঞ্জ প্রতিনিধি লিটন দাস (১)	১৪ জুন
দৈনিক ভোরের ডাক	চান্দিনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা (১)	১১ জুন	-	মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সিনিয়র সাংবাদিক সুমন মাহমুদ (১)	২২ মে
-	প্রবীণ সাংবাদিক কামাল লোহানী (১)	২০ জুন	দৈনিক সমাচার ও চাঁদপুর জমিন	ফরিদগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক আবুল হাসনাত (১)	৩০ মে

করোনায় মৃত সাংবাদিক			করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিক		
দৈনিক নওয়াপাড়া (যশোর)	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বেলাল হোসেন (১)	২৪ জুন	দৈনিক সোনলী সংবাদ (রাজশাহী)	প্রধান প্রতিবেদক তবিবুর রহমান মাসুমের (১)	২৮ জুন
সাপ্তাহিক হাতিয়ার (বগুড়া)	নির্বাহী সম্পাদক সাইদুজ্জামান তারা (১)	২৬ জুন	সাপ্তাহিক হকার্স (ফেনী)	প্রকাশক ও সম্পাদক নূরুল করিম মজুমদার (১)	৫ জুলাই
সাপ্তাহিক আজকের সূর্যোদয়	সম্পাদক খন্দকার মোজাম্মেল হোসেন (১)	২৯ জুন	দৈনিক আজকের সাতক্ষীরা	সম্পাদক ও প্রকাশক মহসিন হোসেন (১)	১৯ জুলাই
সাপ্তাহিক উত্তমাশা	সম্পাদক খন্দকার ইকরামুল হক (১)	৫ জুলাই	-	খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ওয়াদুদুর রহমান পান্না (১)	২২ আগস্ট
এটিএন বাংলা	অর্থ ও হিসাব বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আহসান হাবীব (১)	৬ জুলাই	-	-	-
পাক্ষিক মকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)	সংবাদকর্মী এম ওমর আলী (১)	১৩ জুলাই	-	-	-
-	ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান (১)	২৪ জুলাই	-	-	-
দৈনিক জাহান (ময়মনসিংহ)	সম্পাদক রেবেকা ইয়াসমীন (১)	২৭ জুলাই	-	-	-
ডেইলি স্টার	স্টোর বিভাগের কর্মী শ্যামল বিশ্বাস (১)	৩ সেপ্টেম্বর	-	-	-
দৈনিক ইত্তেফাক	বরগুনা (দক্ষিণ) প্রতিনিধি আব্দুল আলীম (১)	৯ সেপ্টেম্বর	-	-	-
করোনায় মোট মৃত	১৯ জন		কোভিড উপসর্গ নিয়ে মোট মৃত	১১ জন	
সর্বমোট	৩০ জন				
তথ্যের উৎস: 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার'					

উপরের টেবিল-১-এ দেখা যায়, করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৯ জন এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ১১ জন। করোনাকালে মোট মৃত ৩০ জন সাংবাদিকের মধ্যে ১৭ জন ঢাকার এবং ১৩ জন মফস্বল এলাকার বা ঢাকার বাইরের। এর মধ্যে ছয়জন সম্পাদক বা প্রকাশক রয়েছেন। নয়জন মাঠপর্যায়ে রিপোর্টিং করতেন। ১১ জন অফিসে কর্মরত সাংবাদিক যেমন– নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও অন্যান্য স্টাফ এবং চারজন প্রবীণ সাংবাদিক, যারা বিভিন্ন প্রেস ক্লাবের সদস্য। করোনায় মৃত সাংবাদিকদের বেশির ভাগ (২৭ জন) প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক এবং তিনজন টেলিভিশন সাংবাদিক। আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে, করোনায় যেসব সাংবাদিক মারা গেছেন তাদের বেশির ভাগ সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক বা সাধারণ স্টাফ, যারা সাধারণত অফিসে কর্মরত থাকেন। বাইরে যেতে হয় বা মাঠপর্যায়ে রিপোর্টিং করতে হয় এমন সাংবাদিক ৩০ জনের মধ্যে মাত্র নয়জন। সুতরাং জনসমাগমে যাওয়া ছাড়াও অফিসে বা ব্যক্তিগত-পারিবারিক কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিক আক্রান্ত হতে পারেন। করোনায় মৃত এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত সাংবাদিকদের চিত্রওয়ারি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

চিত্র-১: করোনায় মৃত এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত উভয় সাংবাদিকদের কাজের ধরন অনুযায়ী বিভাজন

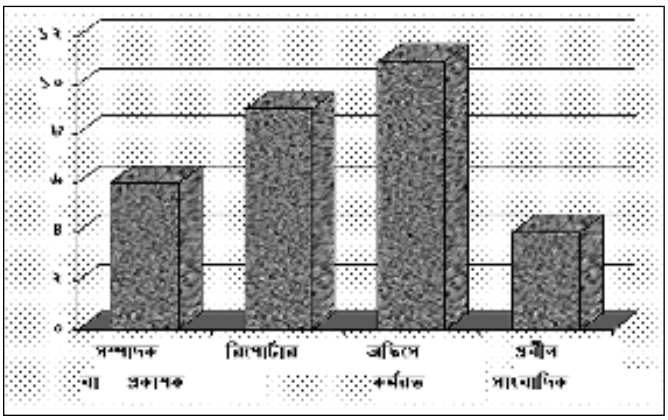

কোভিড-১৯ শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা

টেবিল-২: কোভিড-১৯ শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা

গণমাধ্যমের ধরন	ঢাকায় অবস্থানরত করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ও শতকরা হার	ঢাকার বাইরে করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ও শতকরা হার	মোট সংখ্যা	শতকরা
সংবাদপত্র	২১৫	১৬৯	৩৮৪	৪৬.১%
রেডিয়ো	০৭	০১	০৮	০.৯৬%
টেলিভিশন	২৮৩	৮১	৩৬৪	৪৩.৭%
অনলাইন	৪৮	২৯	৭৭	৯.২৪
সর্বমোট	৫৫৩ (৬৬.৩৯%)	২৮০ (৩৩.৬১%)	৮৩৩	১০০%

তথ্যের উৎস: 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার'

টেবিল-২-এ দেখা যায়, করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকদের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৬৬.৩৯ শতাংশ (৫৫৩ জন) ঢাকার এবং ঢাকার বাইরে করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ৩৩.৬১ শতাংশ (২৮০ জন)। এ হিসাব বাংলাদেশের জাতীয় হিসাবের কাছাকাছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশে Morbidity and Mortality Weekly Update রিপোর্ট অনুযায়ী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে যত কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন তার প্রায় ৬৪ শতাংশ ঢাকার, বাকি অন্যান্য বিভাগ থেকে শনাক্ত হয়েছেন। 'আমাদের গণমাধ্যম-আমাদের অধিকার' ফেসবুক গ্রুপের প্রধান সমন্বয়ক আহম্মদ ফয়েজ জানান, তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, আক্রান্ত হওয়া সাংবাদিকের সংখ্যা বাংলাদেশে এর চেয়েও অনেক বেশি। অনেকে তথ্য গোপন করায় বা করোনা টেস্ট না করায় ওইসব আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় না বা দেওয়া যায় না বলে তিনি মনে করেন।

চিত্র-২: করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিক ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে

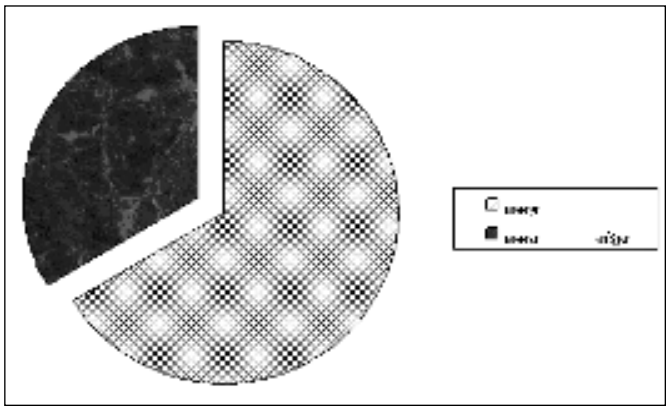

টেবিল-২-এ আরও দেখা যায়, মোট করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের মধ্যে সংবাদপত্রের (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক) সাংবাদিক এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকের শতকরা হার প্রায় সমান, যা যথাক্রমে ৪৬.১ শতাংশ (৩৮৪ জন) এবং ৪৩.৭ শতাংশ (৩৬৪ জন)। এছাড়া করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের মধ্যে রেডিয়োর ০.৯৬ শতাংশ (৮ জন) এবং অনলাইন মিডিয়ার ৯.২৪ শতাংশ (৭৭ জন) সাংবাদিক রয়েছেন।

চিত্র-৩: করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রের ধরন

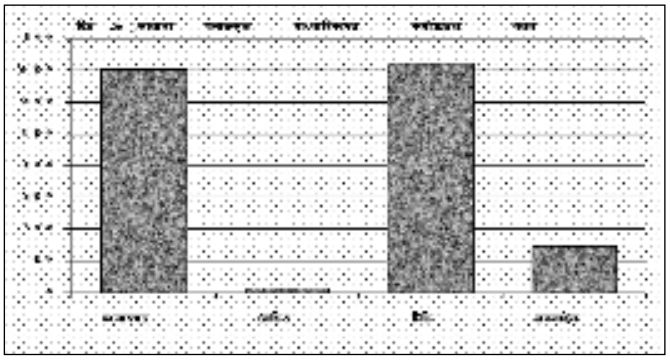

উল্লেখ্য, তথ্যের শ্রেণিবিভাজন করার সময় অনলাইন টিভি এবং সংবাদ সংস্থা অনলাইন মাধ্যমের মধ্যে ধরা হয়েছে। তবে প্রিন্ট মিডিয়ার অনলাইন ভার্সনের সাংবাদিককে সংবাদপত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে।

ঙ. করোনায় সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান

বাংলাদেশে সামাজিক দূরত্ব বা মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি পালনের হার সন্তোষজনক নয়। ৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর ভয় বা আতঙ্কের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি কিছুটা পালন করা হলেও ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। এপ্রিলে ব্র্যাক এবং জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ১,৩০৯ জনের ওপর পরিচালিত এক জরিপে বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে তারা (৮৬ শতাংশ) হাত ধৌত করেন। এছাড়া বাসায় অবস্থান করেন ৭০ শতাংশ এবং যখন বাইরে যান, তখন মাস্ক পরেন ৫৬ শতাংশ (BRAC JPGSPH, 2020)।

সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সাংবাদিককে বাড়তি কিছু সতর্কতা বজায় রাখতে হয়। সাংবাদিককে বিশেষ করে রিপোর্টারকে বাইরে থেকে রিপোর্ট করতে হয়। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন কি না বা করোনা প্রতিরোধে রিপোর্টিং করার সময় বা অফিসে কর্তব্যরত থাকার সময় বিশেষ কোনো গাইডলাইন অনুসরণ করেন কি না, এর কোনো গুণগত বা পরিমাণগত গবেষণা হয়নি। সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশের দুই শ সাংবাদিকের ওপর অনলাইনে জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপে দেখা যায়, ৫৭ শতাংশ সাংবাদিক সরাসরি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সংবাদ কাভার করেন করোনাকালে। ৬৭.৫ শতাংশ সাংবাদিক কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সংবাদ বা অন্যান্য সংবাদ কাভার করেন (SACMID, 2020)। তবে এই জরিপে সাংবাদিক সামাজিক দূরত্ব পালন করেন কি না বা ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করেন কি না– সেসব বিষয় বা কেন তারা আক্রান্ত হচ্ছেন, এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়নি। সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে কয়েকটি ঘটনার পর্যবেক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

ঘটনা-১

১০ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার যোগদান করেন। যোগদান উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল টানিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর 'মিট দ্য প্রেস' আয়োজন করা হয়। রাজশাহী মহানগরীর বেশকিছু সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এক সাংবাদিকের ফেসবুকে পোস্টকৃত ছবিতে দেখা যায়, বেশির ভাগ সাংবাদিক মাস্ক পরেননি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ওই পোস্টে মন্তব্য করেন, 'No musk, no physical distancing'। করোনার সময় এভাবে 'মিট দ্য

২৫ মার্চ করোনাকালীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ৬ মাসের জন্য জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংবাদিকদেরও দেখা যায় ক্যামেরা হাতে। কেউ সামাজিক দূরত্ব বজায় তো দূরের কথা, স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি *ছবি: ডেইলি স্টার*

প্রেস' আয়োজন করাও ঠিক হয়নি আর এ ধরনের ইভেন্টের সংবাদমূল্য করোনাকালে নতুন করে ভাবার বিষয় ছিল। একজন সাংবাদিকের সোর্সের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা সম্পর্ক বজায় রাখতে কখনো কখনো এ ধরনের ইভেন্ট কাভার করার প্রয়োজন পড়ে। এটাও সাংবাদিকতারই অংশ। কিন্তু করোনাকাল হওয়ায় তা সরাসরি কাভার না করলেও চলত। রাজশাহী মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোন বা অনলাইনে কথা বলে ওই নতুন কমিশনারের পদক্ষেপ কী জেনে রিপোর্ট করা যেত।

ঘটনা-২

২৫ মার্চ করোনাকালীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের জন্য জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। শত শত নেতাকর্মীর সঙ্গে সাংবাদিকরাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল ইউনিভার্সিটির সামনে জড়ো হন। কেউ সামাজিক দূরত্ব বজায় তো দূরের কথা, স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি। জনাকীর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংবাদিকদেরও দেখা যায় ক্যামেরা হাতে (উপরে ছবি)। দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুইবারের প্রধানমন্ত্রী জেল থেকে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি পাচ্ছেন– এটা অবশ্যই সংবাদযোগ্য বড়ো ঘটনা। করোনাকালে এভাবে জনাকীর্ণ অবস্থার মধ্যে গিয়ে ছবি তোলা বা লাইভ করা সাংবাদিকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধিসহ সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা পালন করে এসব ঘটনা কাভার করা প্রয়োজন।

ঘটনা-৩

৩০ আগস্ট একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলে শিরোনাম 'পবিত্র আশুরা পালন: অনেকেই ভাঙছে স্বাস্থ্যবিধি, বাড়ছে ঝুঁকি'। রিপোর্টারও লাইভ রিপোর্টিংয়ে বলছেন তাজিয়া মিছিলে স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হচ্ছে না। টিভির স্ক্রলেও দেখা যাচ্ছে (অপর পৃষ্ঠায় ছবি)। রিপোর্টার এসব বলছেন; কিন্তু তিনি নিজেই স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালন করছেন না। মাস্ক ঝুলানো আছে গলায় অথচ রিপোর্টার জনসমাগম থেকে রিপোর্টিং করছেন। মিছিলটি তার দিকেই আসছে। সাংবাদিকতার অন্যতম কাজ সচেতন করা। স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় সচেতনতা সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা থাকতে হয়। জনগণ সচেতন হবেন কী করে? আমি যে বিষয়ে সচেতন করছি বা তথ্য দিচ্ছি, সেটা যদি আমি নিজেই না মানি তাহলে সে তথ্য বা বার্তা কার্যকরী হয় না। বিষয়টি নিয়ে মতামত জানতে আমি আমার ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিই। পোস্টটি দেখে ১১৬ জন লাইক চিহ্ন দেয়, ২৩ জন হা-হা, ১৯ জন দুঃখিত, তিনজন লাভ, একজন রাগান্বিত হওয়ার এবং একজন ওয়াও চিহ্ন দেন। পোস্টটিতে ২১ জন মন্তব্য করেন। এর মধ্যে ১৯ জনের মন্তব্যের সারাংশ করলে দেখা যায়, সবাই মনে করেন এভাবে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রিপোর্টিং করা ঠিক হয়নি। তবে দুইজন ভিন্নমত দেন। ভিন্নমত পোষণকারী একজন সাংবাদিক বলেন, যদি পাশে লোকজন না থাকে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেন তাহলে মাস্ক খুলে রিপোর্টিং করতে পারেন। আরেকজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন, 'অডিয়ো (ভয়েস) স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনে মাস্ক খুলতে হয়। স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা বেশি প্রয়োজন।' মিছিলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন। কারণ রিপোর্টার যখন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লাইভ করবেন, তখন মিছিলকারী তার চারদিকে চলে আসতে পারে। মাস্ক পরে ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে টেলিভিশন রিপোর্টিং সারাবিশ্বেই হচ্ছে।

৩০ আগস্ট বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলে শিরোনাম 'পবিত্র আশুরা পালন: অনেকেই ভাঙছে স্বাস্থ্যবিধি, বাড়ছে করোনা ঝুঁকি'। রিপোর্টারও লাইভ রিপোর্টিংয়ে বলছেন তাজিয়া মিছিলে স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হচ্ছে না। রিপোর্টার বলছেন; কিন্তু তিনি নিজেই স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালন করছেন না। মাস্ক ঝুলছে মুখের নিচে!

চ. গবেষণার ফলাফল

* টেলিভিশন রিপোর্টিং এবং সাংবাদিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট পর্যবেক্ষণ করার সময় দেখা যায় সাংবাদিকরা সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন না। কখনো মাস্ক থাকলেও তা সঠিকভাবে পরিধান করেন না। আবার যেসব ইভেন্ট কাভার না করলেও চলত বা সংবাদমূল্য তেমন নেই, সেসব ইভেন্টও স্বাস্থ্যবিধি পালন না করে কাভার করতে দেখা গেছে সাংবাদিকদের।
* অফিসের বাইরে কাজ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিক স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না। অনেক গণমাধ্যম অফিসেও সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হচ্ছে না। সাংবাদিকরা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন, জ্ঞানও আছে; কিন্তু অনেকে তা পালন করছেন না।
* বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের বাসা থেকে কাজের অনুমতি দিয়েছে। সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্টের জরিপে জানা যায়, ৭৩ শতাংশ সাংবাদিক বলেছেন করোনার কারণে তারা বাসা থেকে কাজ করতে পারেন (SACMID, 2020)। অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বাসা-অফিস সাপ্তাহিক কর্মবণ্টন করেছে (রোস্টার ডিউটি) অর্থাৎ একদল সাংবাদিক টানা এক সপ্তাহ বাসা থেকে অফিস করে এবং পরের সপ্তাহে অফিস এসে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদল যারা সরাসরি অফিস করেছেন, তারা পরবর্তী সপ্তাহে বাসা থেকে অফিস করেন। রোস্টার ডিউটি সাংবাদিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এক সপ্তাহ আসা-যাওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।
* অফিসে যাওয়া-আসার সময় পাবলিক পরিবহণ ব্যবহার করতে হয় বেশির ভাগ সাংবাদিককে। অফিসের পরিবহণ সুবিধা পেলেও তাদের একসঙ্গে বেশ কয়েকজনকে যেতে হয়। অফিসে একসঙ্গে কয়েকজন লিফট ব্যবহার করেন স্বাস্থ্যবিধি না মেনে। খাবারের বাসনপত্রও অলাদা নেই অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের।
* বুমপোল, পেন, বেল্ট, জুতা-সেন্ডেল, সেলফোন, মানিব্যাগ অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল ওয়াইপ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয় না।
* পরিবার বা বাসার হাটবাজার বা অন্যান্য কাজ করতে গিয়েও সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন।
* গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো করোনায় কীভাবে রিপোর্টিং করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেয়নি। চীনের উহান প্রদেশ থেকে করোনা সারাবিশ্বে যখন ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম 'দেশের সার্বিক প্রস্তুতি' নিয়ে কথা বলেছে; কিন্তু দীর্ঘ তিন মাস সময় পাওয়ার পরও গণমাধ্যমগুলো 'উল্লেখ করার মতো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়নি' এবং নিজেদের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়নি। হাতেগোনা কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সংবাদকর্মীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছিল এবং একটি মাত্র সংবাদপত্র কিছু নির্দেশনা দিয়েছে বলে জানা যায় (ফয়েজ, ২০২০)। দেশের সাংবাদিক সংগঠনগুলো, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মিলে অবশ্যই একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করতে পারতেন যে কীভাবে করোনাকালে গণমাধ্যমকর্মীরা কাজ করবেন। কিন্তু তার কিছুই হয়নি (ফয়েজ, ২০২০)। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) দেশের প্রতিটি বিভাগে করোনাকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ে ওয়েবিনার আয়োজন করেছে। প্রায় ৪০০ সাংবাদিককে যুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি এসব আলোচনায়। করোনায় রিপোর্টিং বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সেই অর্থে প্রশিক্ষণ নয়।
* সাংবাদিকদের কিছু সংগঠন বাইরে থেকে পিপিই অনুদান হিসেবে এনে ঢাকার সাংবাদিকদের কিছু পিপিই দিয়েছে, যা পর্যাপ্ত নয়।

স্বাস্থ্যবিমাও নেই বেশির ভাগ গণমাধ্যমের। সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্টের ওই জরিপে জানা যায়, ৬২ শতাংশ সাংবাদিক বিভিন্ন উৎস থেকে পিপিই পেয়েছেন যখন ৩২ শতাংশ জরিপকালীন কোনো পিপিই পাননি। ৭৬ শতাংশ সাংবাদিক জানিয়েছেন তাদের জন্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোনো স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা করেনি বা কোনো চিকিৎসা ভাতা দেয় না (SACMID, 2020)। বেশির ভাগ সাংবাদিক নিয়মিত বেতনভাতা না পাওয়ার কারণে এমনিতেই আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকেন। করোনাকালীনও এ সংকট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে সুরক্ষাসামগ্রী কেনা এবং ব্যবহার করা অনেক সাংবাদিকের জন্য সহজ নয়।

* বাংলাদেশে করোনাকালীন কয়েক হাজার সাংবাদিকের চাকরি গেছে। প্রতিদিন সাংবাদিকদের চাকরি যাচ্ছে। বাংলাদেশে করোনায় কমপক্ষে চার হাজার সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নানা ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন বলে বিবিসি এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে কমপক্ষে ছয় শ সরাসরি চাকরিচ্যুতি ও ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন (বিবিসি, ২০২০)। মাসের পর মাস বেতন বাকি থাকছে। বেতন-বোনাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশকিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে। বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে অনেক সাংবাদিককে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য (৬০-৭০ শতাংশ) হারে হ্রাস পেয়েছে করোনাকালীন। অনেক সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে। টেলিভিশন এবং অনলাইন মাধ্যমের দর্শক বেড়েছে; কিন্তু বিজ্ঞাপন বাড়েনি। বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট জার্নালিস্টস নেটওয়ার্কের এক জরিপে জানা যায়, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ৩৪ জেলার ৪৫৬টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে ২৭৫টি করোনার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ১,৬০০ সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন। এসব কারণে বেশির ভাগ সাংবাদিক হতাশায় ভুগছেন। প্রতিদিন হতাশার চিত্র তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিচ্ছেন। এসব হতাশা স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
* করোনায় মারা গেছেন ১৯ জন এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ১১ জন সাংবাদিক। মৃত সাংবাদিকদের বেশির ভাগ (২৭ জন) প্রিন্ট মিডিয়ার এবং তিনজন টেলিভিশন সাংবাদিক। করোনায় যেসব সাংবাদিক মারা গেছেন তাদের বেশির ভাগ যেমন সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক বা সাধারণ স্টাফ যারা সাধারণত অফিসে কর্মরত থাকেন। বাইরে যেতে হয় বা মাঠপর্যায়ে রিপোর্টিং করতে হয়– এমন সাংবাদিক মাত্র ৩০ জনের মধ্যে ৯ জন। সুতরাং শুধু বাইরে নয়, অফিসে বা ব্যক্তিগত-পারিবারিক কাজ করতে গিয়েও সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন।
* করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকদের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৬৬.৩৯ শতাংশ (৫৫৩ জন) ঢাকার এবং ঢাকার বাইরে করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ৩৩.৬১ শতাংশ (২৮০ জন)। এ হিসাব বাংলাদেশের জাতীয় হিসাবের কাছাকাছি।
* মোট করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের মধ্যে সংবাদপত্রের (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক) সাংবাদিক এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকের শতকরা হার প্রায় সমান, যা যথাক্রমে ৪৬.১ শতাংশ (৩৮৪ জন) এবং ৪৩.৭ শতাংশ (৩৬৪ জন)। এছাড়া করোনা শনাক্তকৃত সাংবাদিকের মধ্যে রেডিয়োর ০.৯৬ শতাংশ (৮ জন) এবং অনলাইন মিডিয়ার ৯.২৪ শতাংশ (৭৭ জন) সাংবাদিক রয়েছেন।

ছ. সুপারিশ ও সুরক্ষা কৌশল

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কেভিড-১৯ কোনো বায়ুবাহিত ভাইরাস নয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে বা তার দুই হাত দূরত্বের (তিন ফুট) মধ্যে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে অন্যজন সংক্রমিত হয়। করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে হলে সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করাসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

* মাস্ক
* গ্লাভস
* হ্যান্ড স্যানিটাইজার
* অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল ওয়াইপ বা ওয়েট ওয়াইপ (টিসু)
* প্রতিরক্ষামূলক চশমা
* গাউন
* ডিসপোজেবল জুতা অথবা পানিনিরোধী ওভার শু।

পরিস্থিতি অনুযায়ী এসব নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। এমনকি এসব সরঞ্জাম সবাইকে ব্যবহার করতে বলেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ক্লিনার ও ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্য আলাদা সরঞ্জাম ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)। করোনা প্রতিরোধে এসব সরঞ্জাম ব্যবহারে এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষায় যেসব নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি, সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

অ্যাসাইনমেন্ট-পূর্ব

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) মতে, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ, তারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তবে বর্তমানে যে কোনো বয়সের মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে দিয়েছে। সাংবাদিক যদি বয়স্কদের মধ্যে পড়েন এবং সংবাদ সংগ্রহে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাহলে ওই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। গর্ভবতী যে কোনো নারী সাংবাদিক বা কর্মচারীর জন্য বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

২. দায়িত্ব পালন করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে নির্দিষ্ট সময় সম্ভাব্য নিজস্ব আইসোলেশন অথবা কোয়ারেন্টিন/লকডাউনে থাকার সময় ব্যবস্থাপনা দলের কীভাবে সহায়তার করবে, সেই বিষয়টি আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষা/কল্যাণ

৪. সাংবাদিক যদি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব কাভার করার পরিকল্পনা করেন তবে তার পরিবারের সদস্যরা উদ্‌বিগ্ন বা বিষণ্ন হতে পারেন। ঝুঁকিগুলো এবং তাদের উদ্‌বেগগুলো সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা পরামর্শদাতাদের মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত এলাকা বিশেষ করে হাসপাতাল অথবা পৃথকীকরণ বা কোয়ারেন্টিন অঞ্চল থেকে রিপোর্টিং করার সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিবেচনা করতে হবে। ট্রমাজনিত পরিস্থিতি কাভার করার জন্য DART Center for Journalism and Trauma-এর নির্দেশনাগুলো মেনে চলা যেতে পারে।

সংক্রমিত না হওয়া এবং সংক্রামিত না করা

৫. অনেক দেশ এখন সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখছে। যদি সাংবাদিক কোনো হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, অসুস্থ ব্যক্তির বাড়ি, মর্গ, কোয়ারেন্টিন এলাকা, শহরে ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি বা পশুবাজার, খামার ইত্যাদি পরিদর্শন করতে চান তাহলে এসব জায়গার স্বাস্থ্যবিধির অবস্থা খোঁজ নিতে হবে। যদি কোনো সন্দেহ হয়, তাহলে পরিদর্শন করা যাবে না। সংক্রমণ এড়াতে সিপিজে সাংবাদিকদের জন্য যেসব সুপারিশ করেছে, তা হলো:

* সবার সঙ্গে ন্যূনতম দুই মিটার (চার হাত যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে দুই হাত) দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার লক্ষণ যেমন কাশি এবং হাঁচি হচ্ছে– এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে।
* বয়স্ক, স্বাস্থ্য অবনতি হয়েছে এমন ব্যক্তি, আক্রান্তের লক্ষণ বহনকারী ব্যক্তিদের নিকটবর্তী যে কেউ, কোভিড-১৯ রোগীদের সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মী বা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।
* গরম পানি এবং সাবান ব্যবহার করে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড নিয়মিত, সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। হাত উপযুক্ত উপায়ে শুকানো হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে হবে।
* অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল বা ওয়াইপগুলো ব্যবহার করতে হবে যদি গরম পানি এবং সাবান পাওয়া না যায়। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরম পানি এবং সাবান ব্যবহার করতে হবে। (সিডিসি ৬০ শতাংশ ইথানল বা ৭০ শতাংশের বেশি আইসোপ্রোপানলসহ অ্যালকোহলভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে)। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা নিয়মিত বিকল্প হিসেবে না নেওয়ার সুপারিশ করেছে সিপিজে।
* কাশি ও হাঁচি দেওয়ার সময় সর্বদা নাক ও মুখ ঢাকতে হবে। তবে টিসু ব্যবহার করলে অবিলম্বে তা নিরাপদ এবং উপযুক্ত উপায়ে ফেলার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টিসু না পেলে কনুই ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে।
* নাক, মুখ, কান ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না।
* করমর্দন (হ্যান্ডশেক), কোলাকুলি, অথবা চুম্বন এড়িয়ে চলতে হবে। এর পরিবর্তে কনুইমর্দন (elbow bump) বা পদমর্দন (legshake) দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করতে হবে।
* অন্যের ব্যবহার্য হতে পারে এমন কাপ, ক্রোকারি বা কাটারি দিয়ে পান করা/খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
* কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে গহনা এবং ঘড়ি খুলে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ ভাইরাস বিভিন্ন সময় পর্যন্ত একেকটি জিনিসে জীবন্ত থাকতে পারে।
* ব্যবহৃত চশমা সাবধানে গরম পানি এবং সাবান দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
* কোন ধরনের কাপড়ের পোশাক পরতে হবে, তা বিবেচনা করতে হবে। নির্দিষ্ট কিছু পোশাক অন্যটির তুলনায় আরও সহজে ওয়াইপ দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে, তা বিবেচনা করা যেতে পারে। সব পোশাক গরম পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার পর।
* অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়া বা আসার সময় কোন ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করা দরকার, তা বিবেচনা করতে হবে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে গণপরিবহণ (যেমন, বাস বা ট্রেন) পরিহার করতে হবে। যদি গণপরিবহণ ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে নামার পর হাত অ্যালকোহল-সমৃদ্ধ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। নিজের গাড়িতে যাতায়াত করলেও অন্য কোনো যাত্রী থাকলে তার দ্বারা ভাইরাস সংক্রমিত হতেও পারে, সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
* নিয়মিত বিরতি নিতে হবে এবং ক্লান্তি বা শক্তির মাত্রাগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ক্লান্ত ব্যক্তিরা তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে ভুল করার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও কাজের আগে এবং পরে দীর্ঘসময় বা দীর্ঘপথ গাড়ি চালাতে হতে পারে।
* আক্রান্ত হওয়ার আগে, থাকার সময় এবং ছাড়ার পর সর্বদা হাত গরম পানি ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে।
* যদি সাংবাদিকের মধ্যে করোনার লক্ষণ বিশেষ করে জ্বর বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে, তা বিবেচনা করতে হবে। বেশির ভাগ সরকারি সংস্থা অন্যকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টিনের পরামর্শ দিচ্ছে। বেশি সংক্রমিত এলাকায় থাকলে জনাকীর্ণ চিকিৎসা কেন্দ্রে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর মুখোমুখি হতে হয়, যা সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে।
* রান্না করা মাংস ও ডিম খেতে হবে। (বাংলাদেশে রান্না বা সিদ্ধ করেই মাংস বা ডিম খাওয়া হয়)

সরঞ্জামের নিরাপত্তা

৬. ক্লিপযুক্ত মাইক্রোফোনের পরিবর্তে নিরাপদ দূরত্বে দিকনির্দেশক 'ফিশপোল' বা বুমপোল মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে।

৭. প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট শেষে মাইক্রোফোনের কভারগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে। কোনো সম্ভাব্য ক্রস-দূষণরোধ করতে কীভাবে নিরাপদে কভারটি সরাতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা/ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৮. মেলিসেপটলের মতো দ্রুত কার্যকরী অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল ওয়াইপ দিয়ে সব সরঞ্জাম দূষণমুক্ত এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যেমন মোবাইল ফোনসেট, ট্যাবলেট, সিসা, প্লাগ, ইয়ারফোন, ল্যাপটপ, হার্ড ড্রাইভ, ক্যামেরা, প্রেস পাস, মানিব্যাগ ইত্যাদি।

৯. সব সরঞ্জাম অফিসে এসে ফেরত দেওয়ার সময় পুনরায় জীবাণুমুক্ত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যে, যারা সরঞ্জামগুলোর দায়িত্বে রয়েছে তারা পুরোপুরি সচেতন আছে এবং কীভাবে সরঞ্জামগুলো নিরাপদে পরিষ্কার করতে হয় তা তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১০. যদি কোনো জীবাণুনাশক না থাকে তবে সরাসরি সূর্যের আলো ভাইরাসকে নির্মূল করতে পারে। সুতরাং সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সময় যদি কোনো বিকল্প না থাকে তবে সব সরঞ্জামকে বেশ কয়েক ঘণ্টা সরাসরি সূর্যের আলোয় রাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, সূর্যের আলোয় এসবের রং নষ্ট হতে পারে বা অন্য কোনো ক্ষতি হতে পারে।

১১. অ্যাসাইনমেন্টের জন্য যদি কোনো যানবাহন ব্যবহার করা হয় তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিম গাড়ির ভেতর পুরোপুরি পরিষ্কার করেছে। বিশেষ করে দরজার হাতল, স্টিয়ারিং হুইল, উইং মিরর, সিট, সিট বেল্ট, ড্যাশবোর্ড এবং উইন্ডো উইন্ডার/ক্যাচ/বাটনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

১২. নিরাপদে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমন– ডিসপোজেবল গ্লাভস, মাস্ক, অ্যাপ্রোন এবং ডিসপোজেবল জুতার কভার) পরিধান এবং খুলে ফেলার সময় সুরক্ষার নিয়মগুলো কঠোরভাবে পালন এবং অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-সিডিসির নির্দেশনাগুলো জেনে নিতে হবে। এসব সরঞ্জাম একটার সঙ্গে অন্যটা সংস্পর্শে এসে দূষিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

১৩. যদি কোনো আক্রান্ত স্থান যেমন হাসপাতাল বা মর্গে কাজ করতে হয় তবে ডিসপোজেবল জুতা বা পানিরোধী ওভার শু পরতে হবে এবং বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতে হবে। ওভার শু নিরাপদ উপায়ে ফেলে দেওয়া উচিত এবং পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৪. সংক্রামিত স্থানে যেমন হাসপাতাল পরিদর্শন বা সেখান থেকে রিপোর্টিং করতে হলে প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য পিপিই যেমন গাউন এবং মুখমণ্ডলে ফুল মাস্কও প্রয়োজনীয় হতে পারে।

১৫. সিডিসি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, মাস্ক পরার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানতে হবে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থান যেমন হাসপাতালে বা সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে মাস্ক পরতে হবে। অনেক দেশে সার্জিক্যাল পিপিইর স্বল্পতা রয়েছে। সুতরাং এই জাতীয় সরঞ্জাম ব্যবহারে ঘাটতি হতে পারে। মাস্ক পরলে নিচের নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে।

* মাস্ক পরলে এন৯৫ মাস্ক (বা FFP2 / FFP3) পরার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, মাস্কটি নাক এবং চিবুকের উপরে সুরক্ষিতভাবে সেট হয়েছে। এর মধ্যে ফাঁকা যেন না থাকে। মুখমণ্ডল নিয়মিত শেভ করে রাখতে হবে।
* খোলার সময় মাস্ক স্পর্শ করা যাবে না। কেবল ফিতা ধরে সরিয়ে ফেলতে হবে। সামনের অংশ কখনোই স্পর্শ করা যাবে না।
* মাস্ক খোলার পর হাত সর্বদা গরম পানি ও সাবান দিয়ে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার (৬০ শতাংশের চেয়ে বেশি ইথানল বা ৭০ শতাংশ আইসোপ্রোপানল) দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
* ব্যবহৃত মাস্কটি ভেজা /আর্দ্র হলে তা ফেলে দিয়ে আরেকটি নতুন মাস্ক পরতে হবে।
* ব্যবহৃত মাস্ক কখনোই পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না এবং সর্বদা তা তৎক্ষণাৎ সিলড ব্যাগের মধ্যে ফেলে দিতে হবে।
* মনে রাখতে হবে, মাস্ক ব্যক্তিগত সুরক্ষার মাত্র একটি অংশ, যা অবশ্যই ব্যবহারের পর গরম পানি এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং মুখ, নাক-কানসহ মুখমণ্ডল স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* তুলা/গজ কাপড়ের মাস্ক কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা যবে না।
* সচেতন থাকতে হবে যে, মাস্কের সরবরাহ কমে যেতে পারে বা দাম অনেক বেড়ে যেতে পারে।

অ্যাসাইনমেন্ট শেষে

১৬. কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না, তা বোঝার জন্য স্বাস্থ্য নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১৭. যেখানে আক্রান্তের হার বেশি এমন জায়গা থেকে এলে নিশ্চিতভাবেই স্বেচ্ছায় পৃথকীকরণ প্রয়োজন। এজন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

১৮. নিজস্ব এলাকা ও গন্তব্যস্থলে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য এবং কোয়ারেন্টিন ও পৃথকীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে।

১৯. ফিরে এসে ১৪ দিনের মধ্যে কার কার সংস্পর্শে আসা হচ্ছে তাদের নাম ও ফোন নম্বর রাখতে হবে।

যদি আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়

২০. যদি কোভিড-১৯ এর মৃদু লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে।

২১. নিজেকে এবং নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সিডিসি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসরণ করতে হবে।

২২. যেখান থেকে লক্ষণগুলো দেখা গেছে, সেখানে কমপক্ষে সাতদিন ঘরে থাকতে হবে। আক্রান্ত হলে তা অন্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

২৩. নিজে পরিকল্পনা করতে হবে এবং অন্যের সহায়তা চাইতে হবে। কী প্রয়োজন, তা নিয়োগকর্তা, বন্ধু এবং পরিবারের কাছে চাইতে হবে।

২৪. যতদূর সম্ভব বাসার অন্য সদস্যদের থেকে কমপক্ষে চার হাত (দুই মিটার) দূরত্বে অবস্থান করতে হবে।

২৫. যদি সম্ভব হয় ঘরে একাকী ঘুমাতে হবে।

২৬. যদি অন্য কারও সঙ্গে একরুমে ঘুমাতে হয় তাহলে সবার জন্য ১৪ দিনের পৃথকীকরণ অবস্থায় থাকতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে সংক্রমণ যাতে না ঘটে, সেজন্য বাথরুম, টয়লেট এবং রান্নাঘর ব্যবহার করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২৭. সাবান ও গরম পানি দিয়ে নিয়মিত এবং যথাযথভাবে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুতে করতে হবে।

২৮. ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বিশেষ করে বয়স্ক এবং ভঙ্গুর স্বাস্থ্য যাদের, তাদের থেকে যতদূর সম্ভব শারীরিক দূরত্বে অবস্থান করতে হবে।

২৯. স্বেচ্ছায় পৃথকীকরণ থাকা অবস্থায় করোনার লক্ষণগুলোর উল্লেখযোগ্য অবনতি না হলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজন নেই।

এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টিভি সাংবাদিকসহ ব্রডকাস্ট পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন স্যাগ-আফট্র (SAG-AFTRA) করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর সদস্যদের বিছু পরামর্শ দিয়েছে। যেমন, সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় মাইক্রোফোনের ওপর ডিসপোজেবল কভার লাগিয়ে নিতে হবে এবং ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হবে। লিপ মাইক্রোফোন কারও সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের মতামত সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সাক্ষাৎকার নেওয়ার ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। কোভিড-১৯ আক্রান্ত বা যারা আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সামনাসামনি সাক্ষাৎকার না নিয়ে ফোন বা অনলাইনে ভিডিয়ো চ্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে। সংবাদকক্ষেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। সংবাদকক্ষকে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

উপসংহার

সাংবাদিকদের করোনা থেকে সুরক্ষা পেতে স্বাস্থ্যবিধি পালনের কোনো বিকল্প নেই। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাংবাদিকদের করোনা থেকে সুরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। গণমাধ্যমের সংবাদকে প্রয়োজনীয় সেবা (Essential Service) হিসেবে ঘোষণা করতে হবে সরকারকে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে করোনাকালীন সাংবাদিকদের আর্থিক সাহায্য আরও বাড়াতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ সাংবাদিককে সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সাংবাদিকের চাকরি এবং নিয়মিত বেতনভাতা ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে অবশ্যই। সাংবাদিককে জনসমাগমে রিপোর্টিং যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। করোনাকালীন ঘটনার সংবাদমূল্যও সঠিকভাবে হিসাব করতে হবে। শুধু করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই চলবে না, সাংবাদিককে শতভাগ সতর্ক থেকে তা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গণমাধ্যম সংকটে পড়লে গণতন্ত্রও সংকটে পড়বে। এজন্য সরকার, সাংবাদিক সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনা মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

* ফয়েজ, আহম্মদ (২০২০), করোনাভাইরাস: সরকার সময় পেয়েছিল তিন মাস; গণমাধ্যম পায়নি? রিপোর্টার্স ভয়েস, ভলিউম ২০, সংখ্যা ৩, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি।
* Alam, Ahmed Shatil & Alam, Wahida (2020). Covid-19 challenges for journalists, The News Age, May 12, 2020.
* BRAC JPGSPH (2020), Awareness and knowledge about Covid-19 during the early onslaught of the pandemic, BRAC JPGSPH Covid-19 Rapid Survey Brief.
* বিবিসি (২০২০), বাংলাদেশ করোনায় কাজ হারাচ্ছেন সাংবাদিকরা [Online], Available at www.dw.com/bn [Retrieved on 15 Sept 2020].
* Deccan Herald, 2020). Covid-19 pandemic's toll among journalists in Peru is especially high
* [Online], Available at https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/covid-19-pandemics-toll-among-journalists-in-peru-is-especially-high-875898.html [Retrived on 12 Sept 2020].
* Kaffash, Jamie (2020). Pulse editor on covering coronavirus: 'We are almost on a wartime footing and with similar principles in play' [Online], Available at https://www.pressgazette.co.uk/pulse-editor-jamie-kaffash-journalist-tips-covering-coronavirus/ [12 September 2020].
* IAPA (2020). The IAPA awards the 2020 Press Freedom Grand Prize to journalists and press workers killed by Covid-19 [Online], Available athttps://en.sipiapa.org/notas/1214043-the-iapa-awards-the-2020-press-freedom-grand-prize-to-journalists-and-press-workers-killed-by-covid-19 [Retrieved on 12 Sept 2020].
* Mujtaba, Syed Ali (2020). Coronavirus crises has exposed the vulnerability of Journalists in India, Muslim Mirror [Online], Available at http://muslimmirror.com/eng/coronavirus-crises-has-exposed-the-vulnerability-of-journalists-in-india/ [Retrieved on 13 Sept 2020].
* SACMID (2020). Journalism in Corona Pandemic in Bangladesh, South Asian Centre for Media in Development, Dhaka.
* The Daily Star (2020). Over 60pc local newspapers have shut down amid pandemic: BIJN survey [Online], Available at https://www.thedailystar.net/country/news/over-60pc-local-newspapers-have-shut-down-amid-pandemic-bijn-survey-1928765 [Retrieved on 13 Sept 2020].
* The Daily Star (2020). Khaleda's release: Hundreds throng BSMMU amid concern of coronavirus, [Online] Available at https://www.thedailystar.net/khaleda-zia-release-hundreds-throng-bsmmu-amid-concern-coronavirus-spread-1885768 [Retrived on 10 September 2020].

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

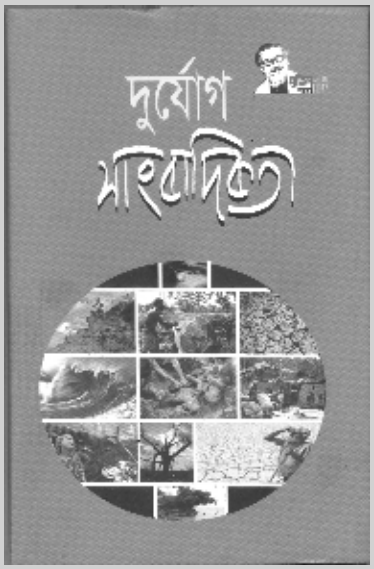

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনা নিয়ে করোনাকালে সাংবাদিকতা

ইফতেখার মাহমুদ

সময়টা মার্চের মাঝামাঝি। দেশে করোনা সংক্রমণ মাত্র শুরু হয়েছে। তখনও রোগটি পুরোদমে ছড়িয়ে পড়েনি। তবে সবার মধ্যে আশঙ্কা ও শঙ্কা শুরু হয়ে গেছে। ঘরে থাকব, না নিয়মিত অফিস করব– এ নিয়ে দোলাচল শুরু হয়েছে। বাসা থেকে বের হওয়ার পর রাস্তা দিয়ে চলাচলে নগরবাসী, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান– সবকিছুতেই পড়ছে এর প্রভাব। আশপাশে অনেকের মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা যাওয়ার খবর আসছে। এর মধ্যেই নিজের শরীরে করোনার লক্ষণ দেখা দিল কি না, সেই ভয় পেয়ে বসল। নাক দিয়ে পানি ঝরছে, গলায় হালকা ব্যথা– সবই আছে।

“কয়েক দফা এমনটা হতেই ফ্লোরের সবাই আড়চোখে তাকাচ্ছে। মৃদু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণও টের পেলাম। কয়েকজন সহকর্মী এসে ভয় মাখানো কণ্ঠে বললেন, ‘অফিসে এসেছেন কেন। দ্রুত বাসায় যান”

প্রথম আলো কার্যালয়ে প্রবেশ করে নিজের ডেস্কে বসে কাজ করতে করতে নাক মোছা আর টিসু পেপার দিয়ে হাঁচি দিতে শুরু করলাম। কয়েক দফা এমনটা হতেই ফ্লোরের সবাই আড়চোখে তাকাচ্ছে। মৃদু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণও টের পেলাম। কয়েকজন সহকর্মী এসে ভয় মাখানো কণ্ঠে বললেন, ‘অফিসে এসেছেন কেন। দ্রুত বাসায় যান।’ একজন সংবাদ ব্যবস্থাপক বললেন, ‘তুমি এখনই বাসায় যাও। অফিসের ছুটিছাঁটার বিষয়টি পরে দেখা যাবে।’ রওয়ানা দিলাম বাসার

দিকে। যেতে যেতেই এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানালাম। কয়েকটি ওষুধের নাম লিখে এসএমএস করল ওই বন্ধু। বলল কিনে নিয়ে খাওয়া শুরু করতে। দ্রুত যাতে ওষুধের দোকান থেকে কিনে ফেলি, কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আর পাওয়া যাবে না।

দ্রুত মিরপুর ১০ নম্বরের লাজ ফার্মায় গেলাম ওষুধ কিনতে। সামনে টিসু দিয়ে নাক-মুখ মুছতে দেখে দোকানদার যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। কোন ওষুধ চাই জানতে চাইল। নাম শুনে বলল, 'এতগুলো পাবেন না। এক পাতা করে দিলাম।' বাসায় স্ত্রীকে ফোন দিয়ে বললাম গরম পানি বসাও, আসছি। আর অতিথি কক্ষটি ঠিকঠাক করো, কয়েক দিন থাকতে হবে সেখানেই। বাসায় ফিরে গরম পানি দিয়ে গোসল করলাম। ঢুকে পড়লাম আলাদা ঘরে। শুরু হলো যেন এক নতুন জীবন। করোনা হয়েছে কি হয়নি, সেটা নিয়ে ভাবতে চাইলাম না। শরীরে জ্বর নেই, ঠান্ডাসর্দি ছাড়া নেই অন্য কোনো সমস্যাও। তাই আপাতত করোনা হয়েছে কি হয়নি, সেটি নিয়ে না ভাবলেও চলবে। বরং ঘরে বসে কী ধরনের রিপোর্ট করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকলাম।

ঘরবন্দি অবস্থায় শুরু করলাম টেলিফোনে নানা সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে যোগাযোগ। করোনাকালে কোথায় কী হচ্ছে, ঘটছে, সব জানার চেষ্টা করলাম। করোনার প্রভাব দেশের কোন খাতে কীভাবে পড়ছে, সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করলাম। সম্পাদক ফোন করে এপ্রিলে কী ধরনের রিপোর্ট করব জানতে চাইলেন। ২০টি রিপোর্টের আইডিয়া পাঠালাম। এর মধ্যে দুইদিনের মাথায় ঠান্ডা-কাশি ঠিক হয়ে গেল। শরীরের ম্যাজমেজে ভাবও চলে গেল। এর মধ্যেই অফিস থেকে জানানো হলো সব কর্মীকে হোম অফিসে পাঠানো হয়েছে। আমিও তার মধ্যে আছি। ফলে এখন কাজ চলবে বাসা থেকে। কৃষি, খাদ্য, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়া নিয়ে এক মাসের পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি ছিল। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও শুরু করে দিলাম।

“নতুন চ্যালেঞ্জ, কাজের নতুন ধরন। ভালোই লাগছিল, যে আমি জীবনে কোনো দিন ২০ ঘণ্টা ঘরবন্দি থাকিনি, এক মিনিটের জন্য হলেও ঘর থেকে বের হয়েছি; সেই আমি সপ্তাহ-মাস পেরিয়ে গেল ঘরে থাকছি”

নতুন চ্যালেঞ্জ, কাজের নতুন ধরন। ভালোই লাগছিল, যে আমি জীবনে কোনো দিন ২০ ঘণ্টা ঘরবন্দি থাকিনি, এক মিনিটের জন্য হলেও ঘর থেকে বের হয়েছি; সেই আমি সপ্তাহ-মাস পেরিয়ে গেল ঘরে থাকছি।

নতুন এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ আছে আবার ভয়ও আছে। এতদিন ধরে সংবাদের এতদিনকার সোর্স বা তথ্যের সূত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকতাম, তা এখন ঠিকমতো কাজ করবে তো? তারা নির্ভরযোগ্য তথ্য দেবে কি না, কেউ আবার ফাঁসিয়ে দেবে কি না– এমন সব ভয়ও পেয়ে বসল। কিন্তু কী করব, কাজ তো চালিয়ে যেতে হবে। একটু পরখ করে দেখার মতো বিষয়। এতদিনের সোর্সরা আসলেই নির্ভরযোগ্য কি না, তা পরখ করে দেখারও একটা সুযোগ তৈরি হলো। সাংবাদিকতায় যাদের সঙ্গে আড্ডা, আলাপ, ভাববিনিময় ও তথ্য সংগ্রহের সম্পর্ক তারা এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে, না একদম নিরাশ হব– এসব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না।

তবে হতাশা না, আশাবাদী হওয়ার মতোই অনেক কিছু ঘটল। আমার মতো তো ঘরবন্দি অন্যরাও, ঘরে বসেই অফিস করছেন বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। বরং আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে টেলিফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। নানা তথ্য-উপাত্ত বেশি বেশি দিচ্ছেন। মোবাইল ফোনে ক্যামেরায় ছবি তুলে ইমেইলে বা হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য-উপাত্ত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর যেগুলো কম্পোজ করা বা সফট কপি ভার্সনে আছে, সেগুলো দ্রুত পেয়ে যাচ্ছি। অন্য সূত্র থেকে সেগুলো যাচাই-বাছাই করেই এসব সংবাদ করছি। পত্রিকার অনলাইন ও প্রিন্ট ভার্সনে ছাপা হচ্ছে। ভালোই লাগছে।

এভাবে সময় ভালোই কাটছিল। এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা সবকিছু আবার থামিয়ে দিল। এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ দুচোখ লাল বর্ণ ধারণ করল। দুই চোখে প্রচণ্ড ব্যথা, অঝোর ধারায় ঝরছে পানি। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার উপায় নেই। কোনো ডাক্তার তখন চেম্বারে ছিলেন না। পরিচিত এক ডাক্তারকে চোখের ছবি তুলে পাঠালাম। তিনি টেলিফোন করে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে চোখ দেখলেন। বললেন, সমস্যা গুরুতর, সম্ভবত কোনো ভাইরাস আক্রমণ করেছে। না দেখে ওষুধ দেওয়া যাবে না। চোখের অসুখ নিয়েই কাজ চলল। এর মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। লঘুচাপ থেকে নিম্নচাপ, নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপ, এরপর তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পুরো সময়ই প্রতিবেদন করতে হচ্ছে। চোখে ব্যথার কারণে কম্পিউটারের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কষ্ট হচ্ছিল। অফিসকে জানাতেই পরামর্শ দিল এক সহকর্মীর সহায়তা নেওয়ার। তথ্য সংগ্রহ করতে আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং কয়েকজন সাবেক আবহাওয়াবিদের সঙ্গে নিয়মিত কথা হতো। তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার চোখে সমস্যা, আপনাদের সহায়তা চাই। বলতেই তারা পূর্ণ সহযোগিতা দিলেন। আমি নিজে পড়তে পারব না, আপনারা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে আমাকে টেলিফোনে জানাবেন, এই দাবি করতে তারা তা-ও পূরণ করলেন। ওই

পূর্বাভাস শুনে ও রেকর্ড করে পুরো সংবাদটি সাজিয়ে নিতাম। আমার ওই সহকর্মীকে বলতাম, উনি সেগুলো সুন্দর করে লিখে আবার আমাকে পড়ে শুনিয়ে তারপর তা অফিসে পাঠিয়ে দিতেন।

এর মধ্যেই ডাক্তার ফোন করে জানালেন গুরুতর রোগীদের জন্য একদিন চেম্বারে বসবেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। চোখে চশমা, মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস– তার কাছে হাজির হলাম। তিনি দেখে বললেন, ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে। নিয়মিত ওষুধ দিলে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ নিয়ে ফিরে এলাম। চিকিৎসা আর রিপোর্টিং– দুটি পাশাপাশি চলতে থাকল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে ঘূর্ণিঝড় যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করল, তখন চোখের অবস্থা এতটাই গুরুতর যে বেশির ভাগ সময় বন্ধ করে রাখতে হতো। তাই সেই অর্থে বলা যায়, চোখ বন্ধ করেই আম্পানের সব সংবাদ বলতে হয়েছে, পাঠাতে হয়েছে। তবে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল এ কারণে যে, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের গতিপথ ও আঘাতের সময় থেকে শুরু করে সব তথ্য-উপাত্ত– কোনোটাই ভুল হয়নি। সহকর্মী সাদ্দাম হোসেন, আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ, বুয়েটের মোহন কুমার দাস, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূঁইয়ার উপকারের কথা সারাজীবন ভুলব না। ঘূর্ণিঝড়ের ওই তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে তারা নিয়মিত ফোনে কথা বলে সময় দিয়েছেন। তাদের সহায়তা যথার্থভাবে পাওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আম্পান কেটে যাওয়ার পর এর ক্ষয়ক্ষতি প্রভাব নিয়ে কয়েকদিন টানা লিখলাম। এর মধ্যে চোখের অবস্থারও উন্নতি হলো।

এর কিছুদিন পরেই শুরু হলো আবার বন্যা। জুনের শেষ সপ্তাহে বন্যা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, এবারের বন্যা তীব্র হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কুড়িগ্রাম দিয়ে বন্যার পানি দেশে ঢুকবে। উত্তর থেকে মধ্যাঞ্চল তো বটেই, পদ্মা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েও এবার বন্যার আশঙ্কা আছে। বন্যার এই আশঙ্কা তুলে ধরে বিস্তারিত প্রতিবেদন করলাম। শুরু হলো বন্যা নিয়ে প্রতিদিনের প্রতিবেদন। বন্যা নিয়ে সংবাদ করতে গিয়ে সাধারণত এ ধরনের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিজে যাই। সরেজমিনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেও প্রতিবেদন লেখি। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্পানের মতোই এবারের বন্যাও সরাসরি নিজে না দেখে, সরেজমিন প্রতিবেদন না করেই কাটাতে হয়েছে। সম্ভবত এত বড়ো দুটি দুর্যোগ পরপর আসার পরও মাঠপর্যায়ে না গিয়ে প্রতিবেদন করার অভিজ্ঞতাও হলো এবার। স্থানীয় প্রতিনিধি ও বন্যা আক্রান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে প্রতিদিনই টেলিফোনে কথা বলতাম। অবস্থা জানতে চাইতাম। মতামত নিতাম, পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিবেদন লিখতাম।

এই করোনা থেকে নতুন কয়েকটি অভিজ্ঞতা হলো। নিজেদের দুর্বলতা ও সক্ষমতার কয়েকটি দিক চোখে পড়ল। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সরেজমিনের গুরুত্ব বারবার মনে হলো। স্কুলের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া মানুষ, ডুবে যাওয়া ফসলের জমি, গবাদি পশু ও মানুষের এক জায়গায় গাদাগাদি করে সড়কের মধ্যে থাকার দৃশ্য না দেখেই লিখতে হয়েছে। বুঝতে পারলাম সাংবাদিকতায় বিশেষ করে রিপোর্ট করায় সরেজমিন যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তা বারবার টের পেলাম। আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতি বারবার তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো শুনে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। সম্প্রতি বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকেও আবহাওয়া ও কৃষি আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত ইউটিউব ও ফেসবুকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেবল শুনেও আবহাওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। মনে হয়েছে, সরকারের অন্যান্য বিভাগ এমনকি বেসরকারি সংস্থাগুলো সেই পথে হাঁটতে পারে। এই করোনাকালে আরেকটি বড়ো নতুন সংযোজন ছিল বেসরকারি সংস্থা থেকে ভার্চুয়াল আলোচনা ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা। সপ্তাহে তিন থেকে চারটি এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েও যথেষ্ট ভালো ধারণা পাওয়া গেছে। ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা, এমনকি অনেক জায়গায় আলোচনা করারও সুযোগ পাওয়া গেছে। যেগুলোর মধ্য দিয়ে বিকল্প পন্থায় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। করোনার যে সংক্রমণের ভয়াবহতা, এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবে পৃথিবীতে করোনা জীবনে ও চিন্তায় এবং অভিজ্ঞতায় যে ছাপ রেখে গেল, তা অনেকদিন মনে থাকবে।

লেখক: সিনিয়র রিপোর্টার, প্রথম আলো

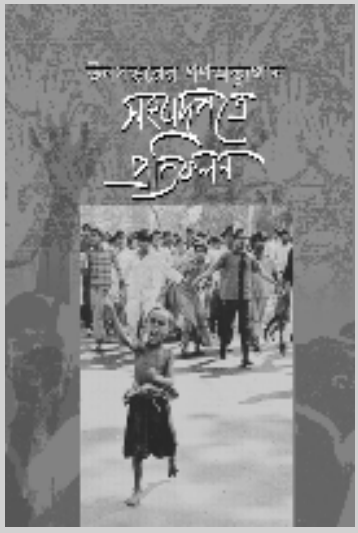

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনাকালে টেলিভিশন সাংবাদিকতা

রুহুল আমিন রুশদ

করোনাকালে সাংবাদিকতায় নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে আমাদের সাংবাদিকতা। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে এই সময়ে। ২০ বছর ধরে আমার বিচরণ টেলিভিশন সাংবাদিকতার জগতে। আমাদের দেশে মার্চে করোনা নামের ভয়াবহ মহামারির আক্রমণের পর এই ছয় মাসে টেলিভিশন সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটেছে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি কাটিয়ে সাংবাদিকতার এই মহান পেশা অব্যাহত রাখতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে তা অভাবনীয়। অনেকে বলেন, করোনা মোকাবিলার বিষয়ে ভাবতে সরকার অন্তত তিন মাস সময় পেয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিকতার জগৎ একেবারেই সময় পায়নি। অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামাল দিতে দিতেই এ দেশের গণমাধ্যম অজস্র নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। টেলিভিশন সাংবাদিকতায় করোনা কী পরিবর্তন বয়ে এনেছে, আমি মনোনিবেশ করতে চাই মূলত সেই দিকে।

“অনেকে বলেন, করোনা মোকাবিলার বিষয়ে ভাবতে সরকার অন্তত তিন মাস সময় পেয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিকতার জগৎ একেবারেই সময় পায়নি। অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামাল দিতে দিতেই এ দেশের গণমাধ্যম অজস্র নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে”

একটু ফিরে দেখা যাক, ৮ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হলো এ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার কথা। একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক নানা পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করা হলো। ভয়ংকর এই মহামারি নিয়ে তখন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানা গুজব। সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে ফেসবুক আর ইউটিউবে সত্য-মিথ্যা নানা গুজব ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে এ দেশেরই অনেকে। এ রকম একটা কঠিন সময়ে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, তা যাচাই করে গণমাধ্যমে পরিবেশন করার কাজটি বেশ দুরূহ ছিল। বিশেষত টেলিভিশনে, যেখানে খুব দ্রুত যাচাই করে পরিবেশনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, সেখানে তো ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঘটেছেও তা-ই। কে কার আগে জানাবেন, টেলিভিশনগুলোর মধ্যে এখনকার তুমুল প্রতিযোগিতার এই সময়ে তাই ভুল হয়েছেও অনেক। তবে আশার কথা হলো, সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের তাগিদ কমবেশি সবার মধ্যেই দেখা গেছে। আর হবেই বা না কেন? দর্শক-শ্রোতার মনে একবার যদি কোনো টেলিভিশনের ক্রেডিবিলিটি অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, তিনি তো সেই স্টেশন দেখতে আর আগ্রহ অনুভব করবেন না। আর দর্শক-শ্রোতা হারালে সেই স্টেশনের বিজ্ঞাপনের বহরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় বৈকি! কাজেই করোনাকালে গণমাধ্যম, বিশেষ করে টেলিভিশনগুলো খুব দ্রুত সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের দক্ষতা আরও বাড়িয়ে নিতে পেরেছে বলে মনে হয়েছে।

আশার কথা হলো, করোনাকালে বিশ্বজুড়ে সংবাদ জানতে উৎসুক মানুষ বেশি নির্ভর করেছেন টেলিভিশন আর অনলাইনের ওপর। কাগজে ছাপা পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা এই সময়ে লক্ষণীয় হারে কমে গেছে। রয়টার্স ইনস্টিটিউট ডিজিটাল নিউজ রিপোর্ট ২০২০-এ এমনই কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসারে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ফাইন্ডিংস হলো:

1. The coronavirus crisis has substantially increased news consumption for mainstream media in all of the countries where we conducted surveys before and after the pandemic had taken effect. Television news and online sources have seen significant up ticks, and more people identify television as their main source of news, providing temporary respite from a picture of steady decline. Consumption of printed newspapers, has fallen as lockdowns undermine physical distribution, almost certainly accelerating the shift to an all-digital future.

2. At the same time, the use of online and social media substantially increased in most countries. WhatsApp saw the biggest growth in general with increases of around ten percentage points in some countries, while more than half of those surveyed (51%) used some kind of open or closed online group to connect, share information, or take part in a local support network.

(http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/overview-key-findings-2020/)

> ধন্যবাদ জানাতে হয় অসীম সাহসী সেসব সাংবাদিককে, যারা ঘর থেকে বের হয়ে শুধু অফিসেই আসা নয়, বরং করোনা চিকিৎসার হাসপাতালগুলোয়ও ছুটে গেছেন সংশ্লিষ্ট টিভি স্টেশন আর দর্শক-শ্রোতাদের জন্য ভালো কিছু পরিবেশন করার তাগিদ থেকে

এদেশে করোনার শুরুর দিকে ভাইরাসটির বিস্তার রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষার নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি গণমাধ্যমগুলোর অফিসগুলোয় কর্মীদের উপস্থিতির সংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। পত্রপত্রিকা ও অনলাইনগুলোয় বেশির ভাগ সাংবাদিকসহ সংবাদকর্মীদের বাসা থেকে অনলাইনে তাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো লিখে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু টেলিভিশন স্টেশনগুলোয় অতটা করা সম্ভব ছিল না। লকডাউন চলাকালে টেলিভিশনেরও একটি অংশ হোম অফিস থেকে কাজ করে। শুধু যে কাজগুলোর জন্য অফিসে আসতেই হবে, কিংবা মাঠে যেতে হবে– সেগুলোর জন্য অল্পসংখ্যক টেলিভিশন কর্মী নিউজরুমে থাকতেন।

বেশির ভাগ টেলিভিশন স্টেশনের মোট কর্মী সংখ্যাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার একাধিক অংশের কর্মীকে পর্যায়ক্রমে ছুটি দেওয়া হতো, আর বাকিদের অফিসে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ধরে নেওয়া হচ্ছিল, এগুলোর কোনো এক ভাগের কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে তার সংস্পর্শে আসা ওই ভাগের বাকিদের ২১ দিনের জন্য সেলফ কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশনে পাঠানো হবে। এই সময়ের মধ্যে তাদের আর কারও মধ্যে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখা গেলে ২১ দিন পর তারা অফিসে যোগ দেবেন। এভাবে অনেক ঝুঁকি মোকাবিলা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। হাউসগুলোয় বেশি হারে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে এই নিয়মটি পুরোপুরি মেনে চলা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি অনেক ক্ষেত্রে। তবে মাস্ক পরা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার, হাতে গ্লাভস পরা আর বাইরে গেলে পিপিই পরা– এসব বেশ কঠোরভাবেই পালন করা হয়। এভাবেই করোনাকালে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক কর্মী নিয়ে স্টেশনগুলো পরিচালনার একধরনের সাময়িক অভ্যস্ততা গড়ে ওঠে।

তবে বলতে দ্বিধা নেই, করোনাকালে গণমাধ্যমগুলো আয়ের ক্ষেত্রে বেশ বড়ো ধাক্কা খেয়েছে। আর তার নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। গণমাধ্যমগুলো এখন সাশ্রয়ের দিকে ঝুঁকছে। অনেক স্থানেই কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য অনেক ব্যয়ও সংকোচনের নীতি গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। গণমাধ্যমগুলোয় এখন চলছে যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম। চলছে বিকল্প উপায়ে আয় বৃদ্ধির প্রয়াস। অনলাইন পোর্টাল, ইউটিউব আর ফেসবুকে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা/ সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। লকডাউনের সময়টিতে দর্শক-শ্রোতারা ঘরবন্দি থাকার কারণে খবর জানার জন্য এই তিনটি মাধ্যমের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে গণমাধ্যমগুলো এখন তাদের অনলাইন পোর্টাল, ইউটিউব আর

ফেসবুকে কনটেন্ট আরও সমৃদ্ধ করার দিকে বেশি মনোনিবেশ করছে।

সাহসী সাংবাদিক তৈরিতেও এই মহামারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বলা হয়, চেনাজানা শত্রু মোকাবিলার উপায় আগে থেকে ভেবে রাখা যায়; কিন্তু করোনা নামের অচিন শত্রুকে মোকাবিলা করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। শুরুর দিকে এই করোনা মোকাবিলা করে সংবাদ পরিবেশনের কৌশল বের করতে সংবাদ সংশ্লিষ্টদের বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে। কিছু সাংবাদিক প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অফিসে আসতেই গড়িমসি শুরু করে দেন। তাদের প্রস্তাব ঘরে বসেই অনলাইনে ডিউটি করবেন তারা। পত্রপত্রিকায় এটি সম্ভব হলেও টেলিভিশন স্টেশনে কোনো সাংবাদিকই যদি না আসেন, ঘরে বসেই যদি কাজ করতে চান, তাহলে সেই স্টেশন চালু রাখা কি সম্ভব হতো? ওই সময়ে দেখা গেছে, হাউসের কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে কিংবা নিদেনপক্ষে কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে কিংবা কেউ একটু বেশি হাঁচি-কাশি দিলেই অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। যারা করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন, হাউসে তারা কখনো কখনো অনেকের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন বলে পরে অভিযোগও করেছেন।

আতঙ্কিত সাংবাদিকদের অনেকে ঘরে বসে কাজও করেছেন শুরু থেকেই। অ্যাসাইনমেন্টগুলো তারা ঘরে বসেই টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্টদের ইন্টারভিউ অ্যাপের মাধ্যমে কিংবা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা চমৎকারভাবে ভিডিয়ো এডিটিং সম্পন্ন করে নিউজ স্টোরি তৈরি করে অনলাইনে স্টেশনে পাঠিয়ে দিতেন সম্প্রচারের জন্য।

ধন্যবাদ জানাতে হয় অসীম সাহসী সেসব সাংবাদিককে, যারা ঘর থেকে বের হয়ে শুধু অফিসেই আসা নয়, বরং করোনা চিকিৎসার হাসপাতালগুলোয়ও ছুটে গেছেন সংশ্লিষ্ট টিভি স্টেশন আর দর্শক-শ্রোতাদের জন্য ভালো কিছু পরিবেশন করার তাগিদ থেকে। বলা বাহুল্য, তারা সুরক্ষার সবকিছুই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এই সুরক্ষার সবকিছু দিয়েও তো অনেক স্টেশনের অনেকের ভয় কাটানো সম্ভব হয়নি। ইনডোর থেকে বের হতেই চাননি অনেকে। ঠিক যে সময়টিতে সংক্রামক মহামারি করোনার বিষয়ে ছড়িয়ে পড়া নানা গুজবের কারণে এমনকি সন্তানরা করোনা-আক্রান্ত সন্দেহে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ফেলে রেখে গেছে; মারা গেলে জানাজা-দাফন কিংবা সৎকারের কোনো ধার না ধেরে লাশ বাড়ির বাইরে ফেলে রেখেছে; করোনা আক্রান্তদের কবরস্থানে দাফনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী; মহল্লায় কারও করোনা হয়েছে জানতে পারলে দলবেঁধে গিয়ে তাকে বা তাদেরকে মহল্লার বাইরে বের করে দিয়েছে; যখন করোনার চিকিৎসাসেবায় সংশ্লিষ্টদের তাদের নিজ বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে; সংবাদ সংগ্রহের জন্য করোনা-আক্রান্তের কাছে যাওয়ার 'অপরাধে' সাংবাদিককে ভাড়া বাসায় ফিরতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে– ঠিক এমন একটি সময়ে অসীম সাহসী সাংবাদিকরা অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছেন করোনাকালে। তাদের প্রতি 'স্যালুট'। পিপিই আর মাস্ক পরে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে তারা ছুটে গেছেন হাসপাতালগুলোয় করোনার সংবাদ সংগ্রহে, ঢুকে পড়েছেন করোনা ওয়ার্ডে, গেছেন আইসোলেশনে থাকা সন্দেহভাজন রোগীদের খবর নিতে, কোভিড রোগীদের সেবাদানকারী চিকিৎসক-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের বিষয়ে জানাতে, কবরস্থানে গেছেন যারা মারা গেছেন, তাদের খবর নিতে– এভাবে সব ঝুঁকি উপেক্ষা করে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন একান্ত নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে।

করোনার সময়ে আরেকটি সংকট সৃষ্টি হয় বিশেষজ্ঞ-বিশ্লেষক-রিসোর্সপারসন থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার পাওয়া নিয়ে। এদের বেশির ভাগই করোনা-আতঙ্কে সরাসরি সাংবাদিকদের সংস্পর্শে আসতে অস্বীকৃতি জানান, তাদের অফিস কিংবা বাড়িতে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। এখন উপায়? ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে' অর্থাৎ 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। সাংবাদিকরা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে বিকল্প উপায় খুঁজে বের করেন। সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিটির সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্টদের ইন্টারভিউ অ্যাপের মাধ্যমে যেমন– ফেসবুক মেসেঞ্জার, স্কাইপে, জুম, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, গুগল মিট, হ্যাংআউট, ডুও, কিংবা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হলো। অনেক সাংবাদিককে দেখা গেছে, রিসোর্সপারসন টেকনিক্যালি একটু দক্ষ হলে তাকে সরাসরি অনুরোধ করতে যে, 'আমি এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি। আপনি নিজেই ভিডিয়ো রেকর্ড করে ফেসবুক মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ভাইবার, নয়তো মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিন, প্লিজ!' আর তারাও এতে সাড়া দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন।

টকশোগুলোয়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ শুরু হয়। আলোচকরা টিভি স্টেশনের স্টুডিয়োতে আসতে ঝুঁকি অনুভব করলেন। তারা বাসায় বসেই এখন লাইভ ডিভাইসের মাধ্যমে নয়তো বিভিন্ন অ্যাপ যেমন– ফেসবুক মেসেঞ্জার, স্কাইপে, জুম, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, গুগল মিট– এসবের মাধ্যমে এখন টকশোতে যোগ দিচ্ছেন। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রেস কনফারেন্স এখন জুম, গুগল মিটসহ বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে চলছে বিশ্বজুড়ে। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে জুম। করোনার সময়ে এ বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অর্থাৎ মে থেকে জুলাইয়ে জুমের আয় আকাশ ছুঁয়েছে। এ সময়ে তারা আয় করেছে ৬ কোটি ৬৪ লাখ মার্কিন ডলার। আগের বছরের তুলনায় তাদের আয় বেড়েছে ৩৫৫ শতাংশের মতো। আর এর আগের কোয়ার্টার অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত জুমের আয় ছিল ৩ কোটি ২৮ লাখ মার্কিন ডলার, যেখানে গত বছর (২০১৯) ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে আয় হয়েছিল ১ কোটি ২২ লাখ ডলার। এতটা না হলেও করোনার মধ্যে অন্যান্য ভিডিয়ো কনফারেন্সিং অ্যাপেরও আয় বেড়েছে। জুমের প্রতিদ্বন্দ্বী সিসকো ওয়েবেক্স এবং মাইক্রোসফট টিমের আয়ও বেড়েছে। (https://www.statista.com/chart/21906/zoom-revenue/)

ঝুঁকি নেওয়ার কারণে হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, সাংবাদিকদের অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। দীর্ঘ রোগভোগের শিকার হয়েছেন তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টেলিগ্রাফে'র সূত্রে ১৪ জুলাই দৈনিক দেশ রূপান্তর জানিয়েছে, নভেল করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে ১২ জন সাংবাদিক মারা গেছেন। এছাড়া আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ভাইরাসটির উপসর্গে। এ নিয়ে করোনাকালে দেশে অন্তত ২১ জন সাংবাদিকের প্রাণ গেল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির মতে, দেশের স্বাস্থ্য পেশায় জড়িতদের তুলনায় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মৃতের সংখ্যা অনেক কম। তবে এ পরিসংখ্যান বলে সাংবাদিকতা পেশায় ভাইরাসটি বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। সামনের সারিতে থেকে মহামারির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রীর অভাবকে এসব মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। ঢাকার স্বেচ্ছাভিত্তিক গ্রুপ আওয়ার মিডিয়া, আওয়ার রাইট জানায়, পুরো দেশে ৫৭৪ জন সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। (https://www.deshrupantor.com/home/printnews/231971/2020-07-14)

তবু পিছপা হননি সাংবাদিকরা। করোনার সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে সাংবাদিক তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন, এখনো করছেন।

লেখক: সিনিয়র নিউজ এডিটর, বাংলাভিশন

বিতর্কের কেন্দ্রে যখন করোনা শনাক্তকরণ কিট ও ভ্যাকসিন প্রসঙ্গ

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

ভাইরোলজির বাংলা নিশ্চয়ই কীটতত্ত্ব না। কিন্তু অনেক খুঁজেও এর চেয়ে ভালো বাংলা আর মাথায় এলো না। যাই হোক, এ করোনাকালে 'কীটতত্ত্ব'কে ছাপিয়ে গোটা দেশ কদিন আগেও বিভোর ছিল 'কিটতত্ত্বে'। এ নিয়ে বলাবলি আর লেখালেখির যে গড্ডালিকাপ্রবাহ শতত প্রবহমান, তা দেখে একটু কলম না ধরে পারা গেল না। কারণ জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে, বলে-লিখে চলেছেন অনেকেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ছে বিভ্রান্তির ব্যারোমিটার আর চড়ছে প্রত্যাশার পারদ। সেই প্রত্যাশার রাশ টেনে ধরা আর যারা না বুঝে বিভ্রান্ত, তাদের বোঝায় একটু সাহায্য করার তাগিদ থেকেই এই কলম ধরা। পাশাপাশি এত আলোচনায় যে ভ্যাকসিন, তা নিয়েও তো দুকলম লেখা চাই।

> এখন সবারই জানা এখানে কিট আসলে দুটি। এর মধ্যে একটি অ্যান্টিজেন কিট। অ্যান্টিজেন কিট তৈরি করতে হলে প্রথমেই টার্গেট অ্যান্টিজেনটিকে শনাক্ত করে তারপর সিকোয়েন্সিং করতে হয়

প্রথমেই কিট প্রসঙ্গ। যে কিটটি নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনা-সমালোচনা, এখন সবারই জানা এখানে কিট আসলে দুটি। এর মধ্যে একটি অ্যান্টিজেন কিট। অ্যান্টিজেন কিট তৈরি করতে হলে প্রথমেই টার্গেট অ্যান্টিজেনটিকে শনাক্ত করে তারপর সিকোয়েন্সিং করতে হয়। উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন ট্রাস্টি মিডিয়ায় বলেছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সিকোয়েন্সার

নেই। কাজেই তারা টার্গেট অ্যান্টিজেনটিকে শনাক্ত করতে পেরেছেন, এমনটি বিশ্বাস করা একটু কষ্টকর। আর তারা যদি তেমনটি করতে পেরে থাকেন, তবে তারা তো প্রথমেই এটি পেটেন্ট করতেন। নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য না হলেও, দেশের স্বার্থেই অন্তত। নয়তো বিদেশি যে কেউ যে কোনো দিন এটি পেটেন্ট করে নিতেই পারে। যে কারণে রেডিয়ো আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইতালির মার্কনির, আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুর না। এই একই কারণে ইলিশের পেটেন্ট আমাদের হলেও, রসগোল্লার পেটেন্ট কিন্তু ভারতের। তারপরও যদি তারা পেটেন্ট করতে না-ই চান, তবে তাদের তো উচিত ছিল তাদের আবিষ্কৃত অ্যান্টিজেনটির এমাইনো এসিড সিকোয়েন্সটি প্রকাশ করা। কারণ, সেক্ষেত্রে তো শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং পৃথিবীর তাবৎ দেশেই এই কিট উৎপাদন শুরু হতো। উপকার হতো বিশ্বমানবতার। এর চেয়েও বড়ো কথা– সেক্ষেত্রে সার্স-কোভ-২-এর একটি কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরির কাজটিও অনেকদূর এগিয়ে যেত।

আরেকটি ব্যাপার, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রথমে দাবি করেছিলেন, তারা তাদের ইন্টারনাল ভ্যালিডেশনের জন্য বিদেশ থেকে অ্যান্টিজেন আমদানি করেছেন। তাদের ভাষ্যমতো এই অ্যান্টিজেনটি যদি তাদের আবিষ্কৃতই হয়ে থাকে, তাহলে এটি কীভাবে বিদেশে বিক্রি হচ্ছিল? তাছাড়া গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের উদ্ভাবিত কিটটির অনুমোদনের জন্য প্রথমদিকে কেন যেন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করতে চাচ্ছিলেন না। এদেশে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে হলে প্রথম ধাপে উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানকে আইন অনুযায়ী একটি কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা সিআরও নিয়োগ প্রদান করতে হয়। দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরুর আগে সিআরও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রটোকল প্রস্তুত করে তা বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের ন্যাশনাল রিসার্চ এথিক্স কমিটিতে জমা দেয়। তৃতীয় ধাপে ন্যাশনাল রিসার্চ এথিক্স কমিটির অনুমোদনের পর সেখান থেকে অনুমোদিত প্রটোকলটি যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ন্যাশনাল ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস অ্যাডভাইজরি কমিটিতে। চতুর্থ ধাপে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস অ্যাডভাইজরি কমিটির অনুমোদনের পর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটি শুরু করা যায়। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটি সম্পন্ন হলেই কেবল সিআরও চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে। পঞ্চম ধাপে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটিতে পাঠায়।

> ঔষধ ও ডিভাইস 'উদ্ভাবন থেকে রেজিস্ট্রেশন' পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি সারাপৃথিবীতেই একই রকম। কোনো দেশেই সরকার বা ঔষধ প্রশাসন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করতে পারে না

ঔষধ ও ডিভাইস 'উদ্ভাবন থেকে রেজিস্ট্রেশন' পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি সারাপৃথিবীতেই একই রকম। কোনো দেশেই সরকার বা ঔষধ প্রশাসন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করতে পারে না। আমেরিকার ঔষধ প্রশাসন ইউএস এফডিএ ইতিহাসে কোনো দিন কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করেছে– এমন উদাহরণ নেই। সারাপৃথিবীতেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান সিআরও-এর মাধ্যমেই করে থাকে। কোভিড-১৯-এর মতো জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করায় সাহায্য করতে পারে; কিন্তু কোনোভাবেই উপরের পাঁচটি ধাপের একটিও বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটিই আন্তর্জাতিক কনভেনশন।

তাছাড়া তড়িঘড়ি করে কোনো র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি কিট বাজারে নিয়ে এলে তা বড়ো ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে তড়িঘড়ি করে অনুমোদন নিয়ে কিট ব্যবহার করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেনের মতো দেশগুলো এই করোনাকালে বড়ো ধরনের বিপর্যয়ে পড়েছিল। কারণ এই র‍্যাপিড কিটগুলোর ফলস পজিটিভ ও ফলস নেগেটিভ রিপোর্ট দেওয়ার হার খুবই বেশি। ফলে রোগ নির্ণয়ে এই কিটগুলো ব্যবহার করলে অনেক কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তি রোগ নিয়ে চলাফেরা করে এটি সমাজে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এ কারণেই স্পেন ও চেক রিপাবলিকও আমদানিকৃত মিলিয়ন ডলারের কিট চীনে ফেরত পাঠিয়েছে।

গণস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিজে বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে সেসব কাঁচামাল বিমানে তুলে দিয়েছেন। পল্লী বিদ্যুৎ গণস্বাস্থ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। এসব কথা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টির জবানিতেই জানতে পেরেছি।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের কিটটি সংবাদ সম্মেলনে প্রিন্টেড মোড়কে উপস্থাপন করেছে। তাছাড়া তারা কিটের দামও বারবার বলছেন। আমাদের ঔষধ নীতি অনুযায়ী এই দুটিই আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কারণ ওষুধ বা কিটের মোড়ক এবং দাম– এ দুটি ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাধ্যতামূলক।

যাই হোক, পরবর্তী সময়ে গণস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কিটটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করিয়েছেন, যেখানে এটি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংগত কারণে আমাদের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরও কিটটিকে অনুমোদন দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশও এখন কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিকে আক্রান্ত। আর ১০ জনের মতো আমরাও খুঁজছি মুক্তির কোনো একটা উপায়। আমরাও মুখিয়ে আছি এমন একটি টেস্টের জন্য, যা দিয়ে রোগটি সত্যি সত্যি ১৫ মিনিটে শনাক্ত করা যাবে। আর তা যদি হয় 'মেড ইন বাংলাদেশ', তাহলে তো সোনায় সোহাগা! কিন্তু এমন দুঃসময়ে কোনো অলীক সোনার হরিণের পেছনে ছোটার সময় বা সুযোগ কোনোটাই আমাদের নেই। ডুবন্ত মানুষ তো খড়কুটো আঁকড়ে ধরবেই। কিন্তু

খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচেছে কে, কবে? আর ডুবন্ত মানুষের সামনে খড়কুটো এগিয়ে দেওয়াটা কি অন্যায় আর অমানবিক নয়?

এবার ভ্যাকসিন প্রসঙ্গ। আমার ধারণা, অনাগত আগামী দিনে আমাদের সামনে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ভ্যাকসিন। কোন ভ্যাকসিন? এটা একটা বড়ো প্রশ্ন তো বটেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ১৯০টির বেশি করোনা ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প চালু রয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় ধাপে আছে ৯টি। একটি ভ্যাকসিন চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে রাশিয়ায়– স্পুটনিক-৫। এটি তৈরি করেছে রাশিয়ার 'গ্যামেলেই ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিয়োলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে– সিরাম ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া, ভারত বায়োটেক, সিনভ্যাক আর গ্যামেলাইয়ের ভ্যাকসিন পাওয়ার সম্ভবনা আমাদের প্রবল। পাশাপাশি কোভেক্স ফোরামের আওতায় ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু অর্থ দিয়ে ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে না, লাগবে কূটনীতিও, লাগবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ হস্তক্ষেপ। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক মতো এগোচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারটিও। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালই শেষকথা নয়। ভ্যাকসিন আনার আগে সংশ্লিষ্ট দেশ ও প্রতিষ্ঠানের ভ্যাকসিন উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি ইত্যাদিও বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ, ট্রায়াল হবে সামান্য কটি ডোজের আর ভ্যাকসিন ব্যবহার হবে কোটি কোটি ডোজ। পাশাপাশি উৎপাদক দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্রিয়াবিক্রিয়াগুলোও মাথায় নিতে হবে। সুসময়ের বন্ধুর বদলে জোর দিতে হবে দুঃসময়ের প্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের ওপর। মনে রাখতে হবে, কোভিড-উত্তর পৃথিবী হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মতোই আর ভ্যাকসিন সেখানে হবে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। তবে আমাদের কপাল এদিক থেকে বেশ ভালো। আমাদের জঠর যাতনার সাথী ভারত ও রাশিয়া– এই দুদেশই ভ্যাকসিন দৌড়ে এগিয়ে আছে ভালোভাবেই। ভ্যাকসিন প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও পাওয়া গেছে এই দুটি দেশ থেকেই জি২জি পর্যায়ে।

দেশে কারা আগে ভ্যাকসিন পাবেন, সেটি নির্ধারণ করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ফ্রন্ট ফাইটাররা পাবেন– এ ধরনের মোটা দাগের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন– স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের মধ্যে যারা কোভিড হাসপাতালে কর্মরত, শুধু তারাই ভ্যাকসিন পাবেন; না যারা নন-কোভিডে কাজ করছেন শিকে ছিঁড়বে তাদের কপালেও, সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকদের মধ্যে ভ্যাকসিন পাবেন কারা, শুধু যারা মাঠের তারা, নাকি অন্যরাও? তেমনই মাঠপর্যায়ের পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তারাই কি শুধু ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আসবেন, না সুযোগ পাবেন অন্যরাও? ব্যাংকারদের ক্ষেত্রে কি শুধু তারাই ভ্যাকসিন পাবেন, যারা ক্যাশ হ্যান্ডেল করছেন; নাকি সব ব্যাংকারই এই সুবিধার আওতায় থাকবেন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত এখন থেকেই ঠিকঠাক নিয়ে রাখতে হবে।

মানুষের সচেতনতা সৃষ্টিও অত্যন্ত জরুরি। মানুষকে ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশের মাস্ক ব্যবসায়ীদের ইদানীং যে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা, তা থেকে সহজেই অনুমেয় যে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য যেমন কিছু মানুষ অধীর আগ্রহে মুখিয়ে আছে, তেমনি ভ্যাকসিনে অবিশ্বাসীর সংখ্যাও নেহায়েত এদেশে কম নয়। কাজেই সবাইকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে হলে এ ব্যাপারে সময়মতো জনমত সৃষ্টির কাজ শুরু করাটাও জরুরি।

কোভিডে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা অনেক লম্বা। কমেছে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, থমকে গিয়েছিল আমাদের উন্নয়নের চাকা, বন্ধ হয়ে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো– তালিকায় আছে এমনই অনেক কিছুই। আবার এ-ও মনে রাখতে হবে যে, এসব ক্ষতিই বাঙালি কাটিয়ে উঠতে পারবে। তবে এবার এমন কিছু ক্ষতি কোভিড আমাদের করে গেল, যা কখনই কাটিয়ে ওঠার নয়। পাব কি আমরা কখনো আর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাসিম আর সাহারা খাতুনের মতো দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ কিংবা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আর কামাল লোহানীর মতো জাতীয় সম্পদ? কোথায় পাব মুক্তিযোদ্ধা তারেক আলীকে কিংবা অধ্যাপক কিবরিয়ার মতো বরেণ্য চিকিৎসককে? ভ্যাকসিন প্রাপ্তির ফিট লিস্টটা যখন তৈরি করা হবে, তখন মাথায় রাখতে হবে এদিকটাও। ভবিষ্যতে জাতি যেন মেধাশূন্য হওয়ার ঝুঁকিতে না পড়ে, সেদিকটি বিবেচনায় রাখতেই হবে অগ্রাধিকারের সঙ্গে।

প্রশ্ন আছে আরও। যারা কোভিড থেকে সেরে উঠেছেন, তাদের কী হবে? তারা কি ভ্যাকসিন পাবেন, না পাবেন না? পেলে কতদিন পর? কোভিড যে দ্বিতীয়বার হতে পারে, সেকথা এখন সবারই জানা। তবে সার্স-কোভ-২ এর ন্যাচারাল ইমিউনিটির স্থায়িত্ব কতদিন, তা আমাদের অজানা। করোনা পরিবারের অন্য ভাইরাসগুলোর সঙ্গে আমাদের যতটুকু জানাশোনা, তা থেকে আমরা জানি, এসব ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে ন্যাচারাল ইমিউনিটি তৈরি হয় তার স্থায়িত্ব সাধারণত কয়েক মাস মাত্র। আমেরিকান সিডিসি তাদের সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ আপডেটেও জানিয়েছে, কোভিড-১৯ থেকে সেড়ে ওঠার তিন মাসের মধ্যে আবারো সার্স-কোভ-২ পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সেরে ওঠা তিন মাস পরে কোভিড-লাইক সিম্পটম দেখা দিলে, অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়লে আবারো সার্স-কোভ-২ পরীক্ষা করা যেতে পারে। এসব বিবেচনায় ধারণা করা যেতে পারে, করোনা ভ্যাকসিনে যে ইমিউনিটি তৈরি হবে তার স্থায়িত্ব হবে হয়তো কয়েক মাস কিংবা আরও কমবেশি কিছুদিন, কিন্তু সারাজীবনের জন্য নয়। কাজেই যাদের একবার কোভিড সংক্রমণ হয়েছে, তারা করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নিতে পারবেন কি পারবেন না, সেটিও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবেচনায় আনতে হবে বৈকি।

পাশাপাশি এ-ও মনে রাখতে হবে, ভ্যাকসিনই একমাত্র সমাধান নয়। মানুষ এ পর্যন্ত একটি মাত্র ভাইরাসকে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় জানাতে পেরেছে আর তা হলো স্মলপক্স। এমনকি পোলিওকেও আমরা আজ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস। এ ভাইরাসের ভ্যাকসিনটি বাজারে আছে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতায় ১৫টি বছর ধরে ইপিআই শিডিউলে দেশের প্রতিটি নবজাতক শিশুকে হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রশংসিত। তবুও বাস্তবতা হচ্ছে এই– আজও বাংলাদেশে পাঁচ শতাংশেরও বেশি নাগরিক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত।

কাজেই শুধু ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে না। পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টির যে কঠিন কাজটি চলমান, তা-ও চালিয়ে যেতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, আমাদের এই যে 'নিউ নরমাল' জীবনযাত্রা, তা শীঘ্রই 'নরমালের' দিকে যাচ্ছে না। ভ্যাকসিন আমাদের নিউ নরমাল জীবনটাকে আরেকটু নরমাল করবে মাত্র। আর সঙ্গে যদি আমরা আরেকটু সচেতন হই, আরেকটু বেশি বেশি মাস্ক ব্যবহার করি, হাতটা নিয়মিত ধুই আর শারীরিক দূরত্বটুকু বজায় রাখি, তাহলে আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি যে আমাদের নিউ নরমাল জীবনযাত্রাটাকে নরমাল করতে আরেকটু কম অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান, লিভার বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য সচিব, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সংক্রমণ সময়ের সাংবাদিকতা
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
গুরুত্ব ও নির্দেশনা

মো. মিনহাজ উদ্দীন

গণমাধ্যমবিহীন সমাজ অকল্পনীয়। গণমাধ্যমের নানা সীমাবদ্ধতা আছে এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিয়ো-টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র ছাড়া সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষকে তথ্য জানানো ছাড়াও গণমাধ্যমের আরও অনেক ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গণমাধ্যমের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়। আবার রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় সংবাদের আধেয়। (*Communication Theories:* 1988)

“অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গণমাধ্যমের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়। আবার রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় সংবাদের আধেয়”

ফ্রেড এস সিবার্ট (Fred S Siebert), থিওডোর পিটারসন (Theodore Peterson) ও উইলবার শ্রাম (Wilbur Schramm) সম্মিলিতভাবে ১৯৫৬ সালে সমাজে প্রেস বা গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে চারটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এই তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে এই চারজন তাত্ত্বিক বিভিন্ন সমাজ বা দেশে গণমাধ্যম কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তা নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রেস বা গণমাধ্যমে তাদের এই চারটি তত্ত্ব আজও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচিত হচ্ছে। এই তত্ত্ব চারটি

হলো: ১. কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian Theory), ২. স্বাধীনতা তত্ত্ব (Libertarian Theory), ৩. সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্ব (Social responsibility Theory), ৪. সমগ্রতাবাদী তত্ত্ব (Totalitarian Theory).

করোনাকালীন মহাদুর্যোগে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে এই চারটি তত্ত্বের সার কথা আমাদের সামনে উঠে আসে। ২০১৯ সালে ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাস যখন প্রথম শনাক্ত হয়, তখন চীনের কর্তৃত্ববাদী সরকার এই বিষয়টিকে স্বীকারই করতে চায়নি। এমনকি চীনের উহান হাসপাতালের চিকিৎসক লি ওয়েনলিয়াং (Li Wenliang) মারাত্মক সংক্রামক এই ভাইরাসটির কথা চিকিৎসকদের এক ফোরামে প্রকাশ করলে পরে তিনি চীনের রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন। উল্লেখ্য, লি ওয়েনলিয়াং করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েই মারা যান। (বিবিসি বাংলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, অনলাইন)

বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic)

বৈশ্বিক মহামারি শব্দটির ইংরেজি শব্দ Pandemic. এই শব্দটির উৎপত্তি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। গ্রিক শব্দ pan অর্থ সব, আর demos অর্থ মানুষ, এই দুই শব্দ মিলে গঠিত আরেক গ্রিক শব্দ pandemos, যে শব্দ থেকেই ইংরেজি Pandemic শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ বৈশ্বিক মহামারি। অক্সফোর্ড অভিধানের তথ্য অনুযায়ী, এই ইংরেজি শব্দটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবহার শুরু হয়। ২০২০ সালে এসে যে শব্দটি নতুন করে বিশ্ববাসীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে। (Oxford learners dictionaries, Online)

করোনাভাইরাসের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বিস্তারের প্রেক্ষাপটে ২০২০ সালের ১১ মার্চ বাংলাদেশ সময় ১০টায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসকে 'বৈশ্বিক মহামারি' (Pandemic) ঘোষণা করে। ওই বিবৃতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডা. তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, গত দুই সপ্তাহে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা উৎপত্তিস্থল চীনের বাইরে ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ভাইরাসের আশঙ্কাজনক মাত্রায় বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি 'গভীরভাবে শঙ্কিত'। তিনি বিভিন্ন দেশের সরকারকে 'জরুরি ও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ' গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রাদুর্ভাব থেকে উত্তরণের আহ্বান জানিয়েছেন। (১৫ জুলাই ২০২০, প্রথম আলো, অনলাইন)

চলমান মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের মার্চে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইন্টারনেট পরিসরে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত ভুল, অসত্য ও অর্ধ সত্য তথ্যের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে 'Infodemic' সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়

একবিংশ শতাব্দীতে করোনাভাইরাস প্রচণ্ড অভিঘাত নিয়ে পুরো বিশ্বকেই থমকে দিয়েছে। কোভিড-১৯ এর আঘাতে বিপর্যস্ত জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সবকিছু। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, করোনাভাইরাসই পৃথিবীতে প্রথম কোনো মহামারি বা বৈশ্বিক মহামারি নয়। নির্দিষ্ট সময় পরপরই বিশ্বে এই ধরনের মহামারি দেখা দিয়েছে। ইবোলা, সার্চ, মার্স ইত্যাদি মহামারি যেমন দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনই করোনাভাইরাসের মতো অতিমারি বা বৈশ্বিক মাহামারিও মোকাবিলা করেছে এই পৃথিবী। আবার সেই দুর্যোগ সময়ে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকতাও করেছেন। অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন আবার অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। বিশ্বের মহামারি বা অতিমারির সময়ে সাংবাদিকতার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে চলে আসে স্প্যানিশ ফ্লু সংক্রমণের বিষয়টি।

তথ্য মহামারি (Infodemic)

চলমান মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের মার্চে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইন্টারনেট পরিসরে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত ভুল, অসত্য ও অর্ধ সত্য তথ্যের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে 'Infodemic' সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞায় 'infodemic' সম্পর্কে বলা হয়, 'An overabundance of information— some accurate and some not— that makes it hard for people to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it.' (অতিরিক্ত তথ্যের প্রবাহ যার মধ্যে কিছু যথাযথ, কিছু ভুল– যা মানুষকে জরুরি সময়ে আস্থাভাজন সূত্র এবং বিশ্বাসযোগ্য দিকনির্দেশনা পাওয়া কঠিন করে তোলে।) সিএনএন: ২০২০

Wordsense dictionary তথ্য অনুযায়ী 'infodemic' শব্দের অর্থ 'An excessive amount of information concerning a problem such that the solution is made more difficult' (কোনো সমস্যা বা সংকট সম্পর্কে অনেক বেশি তথ্য, যা সমস্যার সমাধানকে অনেক কঠিন করে ফেলে)। যাকে আমরা বাংলায় তথ্য মহামারি বলতে পারি।

চীনে করোনাভাইরাস মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর এই ভাইরাস নিয়ে চীনসহ সারাবিশ্বেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে ইন্টারনেটে বিভিন্ন যোগাযোগ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ও

প্রতিকার নিয়ে নানা ধরনের অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ে, যা এই সংকটকে আরও প্রকট করে তোলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভাইরাস নিয়ে নানা ধরনের গুজব ও ভুল তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে। আর এই অপতথ্য, ভুল তথ্য বা গুজব বেশি ছড়িয়েছে Weibo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest- এইসব যোগাযোগমাধ্যমে। তবে এই ভুল তথ্য, অপতথ্য বা গুজব শুধু ইন্টারনেট পরিসরে ছড়ায় তা কিন্তু নয়। মানুষের মুখে মুখে বা সনাতন পদ্ধতিতেও গুজব বা ভুল তথ্য ছড়াতে পারে। যার উদাহরণ বাংলাদেশেই পাওয়া যায়।

স্প্যানিশ ফ্লুর সংক্রমণ (১৯১৮-২০১৯) ও সাংবাদিকতা

প্রায় শতবছর আগের কথা। মাত্রই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন রণাঙ্গনের যোদ্ধারা। এই সময়ে সারাবিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে একটি ভাইরাস। যার নামকরণ করা হয় স্প্যানিশ ফ্লু। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটির নামকরণ স্প্যানিশ ফ্লু করা হলেও এর উৎপত্তির সঙ্গে স্পেনের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সেনা ক্যাম্পে। সেখানকার তরুণ সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর অতি দ্রুত দুর্বল হয়ে তারা মারা যাচ্ছিলেন। ইউরোপে এই ভাইরাসটির বিস্তারের খবর যুক্তরাজ্য চাপিয়ে রেখেছিল। কারণ জার্মানির সঙ্গে তখনও দেশটির যুদ্ধ চলছিল। এদিকে ইউরোপে প্রথম সংবাদমাধ্যমে এই ভাইরাসটির খবর প্রকাশ করেছিল স্পেন। দেশটির রাজপরিবারের সদস্যরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যা সেই সময়ের গণমাধ্যমে (মূলত রেডিয়ো ও সংবাদপত্র) ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। সেই কারণে এই ভাইরাসটি স্প্যানিশ ফ্লু হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে ওই সময় প্রায় ৫ কোটি মানুষ মারা যান। এই ফ্লুর প্রথম ধাক্কা (First wave) এসেছিল ১৯১৮ সালের জুনে আর দ্বিতীয় ধাক্কা (Second wave) আসে সেপ্টেম্বরে। প্রথম ধাক্কার চেয়ে দ্বিতীয় ধাক্কাতেই বেশি মানুষ মারা যান।

স্প্যানিশ ফ্লুর সাংবাদিকতা ও জেনিস হিউমের (Janice Hume) বিশ্লেষণ

শিক্ষকতা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির একি মিলার গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে (মার্কিন ভাষায় স্কুল)। বর্তমানে অধ্যাপক ড. জেনিস হিউমের যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার Grady College of Journalism & Mass Communication-এর বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাংবাদিকতা ইতিহাস নিয়ে হিউম অনেক গবেষণা করেছেন, যার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বেশকিছু ফেলোশিপ লাভ করেছেন।

হিউম সংক্রমণ সময়ের সাংবাদিকতা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ২০০০ সালে। সারাবিশ্বে বিশেষভাবে স্বীকৃত (Journalism & Mass Communication Quarterly, J&MC Quarterly, Vol.77, No.4, Winter 2000) নামের গবেষণা সাময়িকীতে প্রকাশিত তার গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল: *'Journalism The forgotten 1918 Influenza Epidemic and Press Portrayal of Public Anxiety*.' এই গবেষণা নিবন্ধে অধ্যাপক হিউম ১৯১৮ সালের ওই মহামারি ও সাংবাদিকতা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। এই ক্ষেত্রে ভয়াবহ ওই মহামারি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে সাময়িকীগুলো যে সংবাদ পরিবেশন করেছে, সেই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। হিউম তার আলোচনায় সংবাদমাধ্যমে কীভাবে American anxiety বা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের উদ্‌বেগ চিত্রিত হয়েছে, সেই বিষয়গুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক হিউমের পর্যালোচনা অনুযায়ী দেখা যায়, শুরুতে এই ফ্লুকে সংবাদমাধ্যম খুব একটা পাত্তা দেয়নি। *'Literary Digest'* এই ভাইরাসকে *'So Called Influenza'* হিসেবে উল্লেখ করে। ওই সময়ে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, খুব দ্রুত এই সংকট কেটে যাবে। যারা যুবক ও স্বাস্থ্যবান, তাদের কোনো ভয় নেই ইত্যাদি। তবে মহামারি যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, তখন অর্থাৎ ১৯১৮ সালের অক্টোবরে সংবাদের কাভারেজে এবং ভাষায় পরিবর্তন আসে। তখন *The Survey, Literary Digest, The Independent* সংবাদমাধ্যমগুলো নিচে ছকে উল্লিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করে সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। যাতে সহজেই ফুটে উঠে পুরো সংকটের চিত্র।

স্প্যানিশ ফ্লুর সাংবাদিকতায় *The Survey, Literary Digest , The Independent* ব্যবহৃত শব্দ	
Appalling	ভয়ংকর
Enemy	শত্রু
Mysterious Malady	রহস্যজনক অসুখ
Pandemic Disease	মহামারি রোগ
Momentous peril	তাৎক্ষণিক বিপদ
Scourge	ভয়াবহ শাস্তি
Stalking	বিচার
Source: *'Journalism The forgotten 1918 Influenza Epidemic and Press Portrayal of Public Anxiety' (2000)*	

এছাড়া এ সময়ের সংবাদে সংক্রমণ প্রতিরোধে নানাবিধ বিষয় উঠে আসে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল:

ক. বিচারালয় বন্ধ রাখা।
খ. মদ ও মাদকের বেচা-বিক্রি বন্ধ রাখা।
গ. জনসমাগম বন্ধ রাখা।
ঘ. কল-কারখানা বন্ধ রাখা।
ঙ. বাসাবাড়িতে সমাগম কমানো।
চ. থিয়েটার বন্ধ রাখা।
ছ. স্কুল বন্ধ রাখা।
জ. সেলুন বন্ধ রাখা।
ঝ. চার্চ বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় ১০০ বছর পর ২০২০ সালে এসে মহামারি রোধে এই ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই সংবাদ পরিবেশন করেছে বাংলাদেশ ও বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো।

একই সঙ্গে মানুষের মনের শক্তি বাড়াতে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে। যাতে ভয়াবহ ওই মহামারিতে মানুষ সাহস পায়, শক্তি পায় ফ্লুকে মোকাবিলা করতে। *'Literary Digest'* সাময়িকীর *'How to Fight Spanish Influenza'* শিরোনামে বলা হয়,

> *"Furthermore, the Boston Globe and other journals points our 'Fear is our first enemy,' and 'whether he fights a German or Germ, the man who worries is already half beaten.' There is no excuse for panic about this epidemic if we all do our share to help stop it and we are reminded that 'from battle to disease the cool fighters wins.' They way to handle this influenza situation, according to the Hartford Courant, is to 'Think of something else." ('How to Fight Spanish Influenza', Literary Digest)*

এই সংবাদে বোস্টন গ্লোব সংবাদপত্রের রেফারেন্স দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ভয়ই হচ্ছে আমাদের প্রধান শত্রু। আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, জীবাণু নাকি জার্মানদের বিরুদ্ধে– এই কথাগুলো উঠে এসেছে গণমাধ্যমে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'যিনি ভীত, তিনি এরই মধ্যে অর্ধেক পরাজিত'। এছাড়া সংবাদপত্রের সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মাথাঠাণ্ডা রাখেন, তারাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এছাড়া ফ্লু মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সংবাদে।

এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, বেশ কার্যকর ও জনসাধারণের কল্যাণেই সেই সময়ের সংবাদ পরিবেশন করেছে স্প্যানিশ ফ্লুর সময়ের মার্কিন সংবাদপত্রগুলো।

করোনাভাইরাস (২০১৯-২০) ও সাংবাদিকতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে মহামারি হিসেবে বিরাজ করা করোনাভাইরাসটি কোভিড-১৯ বা নভেল করোনাভাইরাস নামে পরিচিত। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর এটি প্রথম শনাক্ত হয় চীনের হুবেই প্রদেশের প্রধান শহর উহানে।

ভাইরাসটিকে প্রথমদিকে 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি নামে ডাকা হতো। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ বা 'করোনাভাইরাস'। চরিত্রগতভাবে এই ভাইরাসটি করোনা প্রকৃতির। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় করোনাভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে। যেগুলোর মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। কোভিড-১৯ বা নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা মারাত্মক। (ডব্লিউএইচও: ২০২০)

এটির জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এটি অনেকটাই সার্স ভাইরাসের মতো। ভাইরাসটি মানুষের ফুসফুসে আক্রমণ করে। তাই এই ভাইরাসে আক্রান্তরা ফুসফুসজনিত জটিলতায় ভোগেন এবং অনেকেই কোনো ধরনের চিকিৎসা ছাড়াই সেরে উঠেন। তবে বয়স্কদের জন্য কোভিড-১৯ খুবই মারাত্মক। যেসব বয়স্ক ব্যক্তির আগে থেকে বহুমূত্র, ফুসফুসজনিত জটিলতা ও ক্যানসারের পূর্ব ইতিহাস রয়েছে, তাদের জন্য কোভিড-১৯ প্রাণঘাতী হতে পারে। (ডব্লিউএইচও: ২০২০)

সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয় উপসর্গ দেখা দেয়, পরে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচদিন সময় নেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কিছু কিছু গবেষকের মতে, এর স্থায়িত্ব ২৪ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। বাংলাদেশে এই ভাইরাসবাহী মানুষ শনাক্ত হন ২০২০ সালের ৮ মার্চ।

করোনা কাভারেজে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)-এর নিরাপত্তা নির্দেশক পরামর্শ

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট একটি অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক এই সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে। কর্মক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের নানা ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়টি নিয়ে সিপিজে কাজ করে। সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার নানাবিধ স্বার্থে নানাবিধ কার্যক্রম ভূমিকা রাখায় এই সংস্থাকে 'সাংবাদিকতার রেডক্রস' নামে অভিহিত করা হয়। এই সংস্থাটি যাত্রা শুরু করে ১৯৮১ সালে। ওই বছর প্যারাগুয়ের সাংবাদিক গনজালো ডেলভালে (González Delvalle) নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাপ্রবাহে এই সংস্থাটির যাত্রা শুরু। উল্লেখ্য, প্যারাগুয়ের কর্তৃত্ববাদী সামরিক শাসন আলফ্রেডো স্ট্রসনারের (Alfredo Stroessner) সামরিক শাসনের সময় গনজালো নিগৃহীত ও কারাবন্দি হয়েছিলেন। সামরিক শাসকের শাসনকালে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য গনজালো ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দি ছিলেন। (সিপিজে: ২০২০)

চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান শহরের প্রশাসন ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্বীকার করে তারা বিশেষ একধরনের ভাইরাসবাহী রোগীদের চিকিৎসা করছেন। কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি জানায়, এই ভাইরাসে ৬১ বছর বয়সি এক ব্যক্তি মারা গেছেন (দ্য নিউইয়র্ক টাইমস : ১৯ মার্চ ২০২০)। এরপরের ঘটনাপ্রবাহ সবার জানা। জ্যামিতিক হারে সংক্রমণ আর প্রাণে কাঁপন ধরানো মৃত্যুর সংখ্যা। সবকিছু মিলিয়ে সারাবিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে চরম আতঙ্ক। কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব বা মহামারির সময়ে অন্য বিভিন্ন পেশার মনুষ নিজেকে আড়াল করে রাখার সুযোগ থাকলেও সাংবাদিকতায় বিষয়টি ব্যতিক্রম। এমন সময়ে সাংবাদিককে আরও সচেতনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। পালন করতে হয় আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা।

ভাইরাসজনিত কোনো রোগের মহামারি বা প্রাদুর্ভাবের সময় সাংবাদিক কীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, তার একটি নির্দেশিকা ১০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করে 'সাংবাদিকতার রেডক্রস' হিসেবে বহুল পরিচিত কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)। পরিস্থিতি বিবেচনায় যে নির্দেশিকাটি কয়েকবার সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সিপিজে করোনাভাইরাস মহামারির সময় সাংবাদিকদের সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। সেগুলো হলো:

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)-এর নির্দেশনার স্তরসমূহ	
১.	অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি (Pre-Assignment)
২.	ভ্রমণ পরিকল্পনা (Travel Planning)
৩.	সংক্রমণবিষয়ক সতর্কতা (Avoiding Infection)
৪.	অ্যাসাইনমেন্ট-পরবর্তী নির্দেশনা (Post-Assignment)
এই ছকটি সিপিজের নির্দেশনার ভিত্তিতে তৈরি করা।	

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যমতে, কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসটি ইতোমধ্যে এন্টার্কটিকা বাদে বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে আপডেট তথ্য, সংবাদ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। তাই সাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকরা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট, বিবৃতি, প্রেস রিলিজ ইত্যাদির প্রতি অবশ্যই নজর রাখবেন। যেমন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি), পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড (পিএইচই), জাতিসংঘ ইত্যাদি।

আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণ সময়ে একজন সাংবাদিক অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইএসপিআর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিমানবন্দর ও বিভিন্ন হাসপাতালের কার্যক্রমের ওপর সতর্ক নজর রাখবেন।

অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি (Pre-Assignment)

নিরাপত্তাই প্রথম (Safety First)। এই আপ্তবাক্যটি যে কোনো সংক্রমণ সময়ে একজন সাংবাদিককে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে।

কোনো অবস্থাতেই নিজ ও সহকর্মীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। অর্থাৎ সংক্রমণ ঝুঁকিকে সর্বোচ্চ আমলে নিয়ে সতর্কতা বজায় রাখতে হবে।

করোনাভাইরাস সংক্রান্ত সংবাদ কাভারেজের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক নিম্নে উল্লিখিত দিকনির্দেশনাগুলো বিবেচনায় রাখবেন। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রদত্ত দিকনির্দেশনায় পরিবর্তন আনা হতে পারে। উল্লেখ্য, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) তাদের নির্দেশনাটি তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ বাস্তবতায়। আমরা আলোচনা করছি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে মূলভাব বজায় রেখে সিপিজের নির্দেশনার স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

* বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) তথ্যমতে, বয়স্ক ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সর্বাধিক। তাই আপনি (প্রতিবেদক/ক্যামেরাপারসন/ভিডিওগ্রাফার) যদি ওই দুই ক্যাটাগরির কোনো একটির মধ্যে পড়েন তবে অফিস থেকে দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। এ ছাড়াও গর্ভবতী নারী সাংবাদিকের জন্য করোনা সংক্রান্ত সংবাদ কাভারেজের বিষয়টি এড়িয়ে চলাও ভালো।
* অ্যাসাইনমেন্ট কাভারেজের জন্য সংবাদকর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাতিগত শত্রুতা ও বর্ণবাদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন। এ ছাড়াও অ্যাসাইনমেন্টভুক্ত এলাকার মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাসগত কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়াদিও বিবেচনায় রাখুন। যেমন, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ ভীষণ রক্ষণশীল। তাই সেসব এলাকায় নারী সাংবাদিক না পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ।
* অ্যাসাইনমেন্টের এলাকা, স্পট বা ইভেন্টের ব্যাপারে সর্বশেষ আপডেট চেক করুন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ সব ধরনের জনসমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এসব বিষয়েও জ্ঞাত থাকুন। যেমন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রথমে শিবচর এলাকা লকডাউন করা হয়েছিল। আবার রাজধানীর মিরপুরের টোলারবাগও লকডাউন করা হয়েছিল। অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে সাংবাদিক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন।
* ভুয়া খবর বা গুজবের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচেতন থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এরই মধ্যে ভুয়া সংবাদের ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতা প্রদানে পরামর্শ দিয়েছে। এ ছাড়াও বিবিসি ও অন্যান্য গণমাধ্যম এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল গণমাধ্যমও করোনা নিয়ে নানা ভুয়া সংবাদের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভুয়া খবর বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। এছাড়া অন্যান্য আপডেট তথ্যেও নজর রাখতে হবে।
* আক্রান্ত এলাকায় (বিভাগ-জেলা-উপজেলা-গ্রাম) যাওয়ার আগে সেখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক তথ্য নোট করুন। প্রতিবেদক বা তার সহযোগী আক্রান্ত হলে কার কাছে, কোথায় চিকিৎসা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। করোনা সংক্রান্ত কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ফ্লু-ভ্যাকসিন গ্রহণ করে সন্দেহ দূর করুন।
* অ্যাসাইনমেন্ট চলাকালীন আপনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা প্রদানে আপানার টিম কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, সেসব বিষয়ে আপনার প্রধান প্রতিবেদক বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করুন। অবস্থা বিবেচনায় আপনাকে সেলফ আইসোলেশন কিংবা হোম কোয়ারেন্টিনের মধ্য দিয়েও যেতে হতে পারে। এ ছাড়াও আপনার অ্যাসাইনমেন্টভুক্ত এলাকাটি যে কোনো সময় লকডাউন হয়ে যেতে পারে– এসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে।
* স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে আপনার সঙ্গে কী কী স্বাস্থ্যসামগ্রী বহন করবেন, সেসবের একটি তালিকা তৈরি করুন। মনে রাখতে হবে, জোগান ঘাটতি ও ক্রেতা চাপের কারণে যে কোনো সময় স্থানীয় সুপারশপ ও বাজারে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, শুকনো খাবার ও পানীয়, টয়লেট পেপার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিতে পারে। তাই সম্ভব হলে এসব সঙ্গে নিয়ে নিতে হবে।
* আপনার রিপোর্টিং এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করুন। আপনি কোথায় অবস্থান করবেন, কোনো বিপদের সময় কে আপনার পক্ষে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তা নিশ্চিত করুন।
* করোনা-আক্রান্ত এলাকা থেকে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহে আপনি মানসিক চাপবোধ করতে পারেন। বিশেষ করে হাসপাতাল, লকডাউন শহর কিংবা কোয়ারেন্টিনভুক্ত এলাকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ আপনার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।
* অ্যাসাইনমেন্ট চলাকালীন পরিবারের সদস্যরা আপনাকে নিয়ে উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকতে পারেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই ঝুঁকি এবং উদ্‌বেগের বিষয়ে তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন। সম্ভব হলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠান/সংস্থার চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের আলাপের ব্যবস্থা করুন।

ভ্রমণ পরিকল্পনা (Travel Planning)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘরে বসে (অনলাইন) কাজ করার সুযোগ থাকলেও সাংবাদিকের বাইরে বা ঘটনাস্থলে সশরীরে গিয়েই কাজ করতে হয়। করোনা পরিস্থিতিতেও বিষয়টির বিকল্প নেই। আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) যে নির্দেশনা দিয়েছে, এই আলোচনায় সে বিষয়গুলোর স্থানীয়করণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নির্দেশনাগুলো আলোচনা করা হলো।

* সাংবাদিকদের সুরক্ষায় উন্নত বিশ্বে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের ট্রাভেল ইনসিওরেন্স পলিসি থাকে। যদিও বাংলাদেশে বিষয়টির ততটা প্রয়োগ নেই। সিপিজে নির্দেশনা অনুযায়ী একজন সাংবাদিক অবশ্যই তার ট্রাভেল ইনসিওরেন্সের পলিসি পর্যবেক্ষণ করবেন। একই সঙ্গে যে স্থানে সাংবাদিক কাজ করার জন্য যাবেন, সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা ও সতর্কতা বিষয়ে সাংবাদিক অবহিত থাকবেন।
* অ্যাসাইনমেন্টভুক্ত দেশটিতে ভ্রমণবিষয়ক বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কিংবা নিকটতম সময়ের মধ্যে জারি হতে যাচ্ছে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকুন। বিদেশি নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না, সে বিষয়ে ভালোভাবে জেনে নিন।
* অ্যাসাইনমেন্ট চলাকালীন বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনার পূর্বনির্ধারিত রুটিন ওয়ার্ক ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে। কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই হঠাৎ একটি বিশেষ অঞ্চল, শহর এমনকি পুরো দেশ লকডাউন করে দেওয়া হতে পারে। সে বিষয়ে সাংবাদিক সতর্ক থাকবেন।
* করোনাভাইরাসের প্রকোপে প্রতিদিনই কোনো না কোনো অঞ্চলকে পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতে পারে। বন্ধ হয়ে যেতে

পারে সড়ক, নৌ ও বিমান যোগাযোগ। তাই অ্যাসাইনমেন্ট চলাকালীন আপনার পরিকল্পনা দ্রুত বদলে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

* প্রতিবেদক যদি কোনো ধরনের অসুস্থতায় ভোগেন, তাহলে তাকে অবশ্যই ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলোয় কঠোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইমিগ্রেশনে যাত্রীদের নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সাধারণ অসুস্থতার জন্যও দেওয়া হয় কোয়ারেন্টিন অথবা সেলফ আইসোলেশন।
* প্রতিবেদক যদি কোনো অঞ্চল বা অন্য কোনো দেশে কাজ করতে যেতে চান, সেক্ষেত্রে তিনি করোনাভাইরাসমুক্ত কি না, তা যাচাইয়ের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনায় থাকা অঞ্চল বা দেশটিতে কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে কি না, তা জেনে নিতে হবে।
* নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশি কঠোর এবং এরই মধ্যে লকডাউন করা হয়েছে– এমন এলাকার পরিবহনব্যবস্থা এড়িয়ে চলুন। বিমানবন্দরগুলোয় নানাবিধ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শারীরিক তাপমাত্রা রেকর্ডের জন্য অতিরিক্ত সময় নেওয়া হয়। তাই প্রতিবেদককে হাতে সময় নিয়ে বের হতে হবে। এ ছাড়াও রেল স্টেশন ও দূরপাল্লার বাস ভ্রমণের ক্ষেত্রেও নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।
* একজন সাংবাদিক আন্তঃশহর ভ্রমণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে স্থানীয় সংবাদদাতা মারফত সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করবেন।

সংক্রমণবিষয়ক সতর্কতা (Avoiding Infection)

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় ইতোমধ্যে অনেক দেশ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিয়েছে। হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, কোয়ারেন্টিন এলাকা, বাজার/খামার ইত্যাদি পরিদর্শনের আগে একজন সংবাদকর্মীকে ওই স্থানের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে ওই এলাকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ভাইরাসের সংক্রমণমুক্ত থাকতে নিচে উল্লিখিত সতর্কতা নির্দেশনাগুলো একজন সংবাদকর্মী মেনে চলতে পারে:

* হাঁচি-কাশির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় অন্তত ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন। নিজে হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় নাক-মুখ ঢেকে নিন।
* যানবাহনে ভ্রমণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। ব্যস্ত সময়ে কিংবা ভিড়ের মধ্যে গণপরিবহণে যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকুন। যানবাহনে ভ্রমণ শেষে অ্যালকোহলিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে (স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০% ইথানল অথবা ৭০% আইসোপ্রপানলসমৃদ্ধ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে)। নিজস্ব মালিকানাধীন গাড়িতে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। খেয়াল রাখবেন, এমন কেউ যাতে আপনার সফরসঙ্গী না হয়, যার মাধ্যমে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।
* করোনা-আক্রান্তের লক্ষণ বহনকারী ব্যক্তি, বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি, করোনার চিকিৎসা দিচ্ছেন এমন চিকিৎসক/নার্স, করোনা সংক্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিক– এদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
* সাক্ষাৎকার গ্রহণে ক্লিপ মাইক্রোফোনের পরিবর্তে ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করুন। ডিরেকশনাল মাইক্রোফোনে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ভয়েস রেকর্ড করা যায়। সম্ভব হলে মাইক্রোফোনের উপরে থাকা স্পঞ্জ প্রতিদিন গরম পানি দিয়ে ধৌত করুন।
* প্রতিনিয়ত সাবান ও গরম পানি দিয়ে আপনার হাত ধৌত করুন। সম্ভব হলে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক জেল ব্যবহার করে হাত ধুয়ে নিন।
* হাসপাতাল পরিদর্শনকালীন হাতে সংক্রমণ প্রতিরোধক গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) ব্যবহার করুন। যেমন: বডিস্যুট, ফুলফেস মাস্ক।
* সংক্রমিত এলাকায় কাজ থেকে ফিরে উচ্চতাপের গরম পানিতে আপনার পরিধেয় জামাকাপড় ধুয়ে নিন।
* গোশত এবং ডিম সিদ্ধ না করে অন্য কোনো উপায়ে খাবেন না।
* হাসপাতাল, মার্কেট অথবা ফার্ম পরিদর্শনের আগে ওয়ান টাইম জুতা পরিধান করুন; অথবা জুতার উপরে ওয়াটারপ্রুফ ওভারশুজ পরিধান করুন। পরিদর্শন শেষে ওয়ান টাইম জুতা বা ওভারশুজটি ডাস্টবিনে ফেলে দিন। যাতে সেটা পুনরায় আর কেউ ব্যবহার করতে না পারে।
* আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের আগে ও পরিদর্শন শেষে সাবান ও গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* সর্বদা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

যুদ্ধ সাংবাদিকতা ও সংক্রমণ সাংবাদিকতা

প্যাট্রিক কোকবার্ন (Patrick Cockburn) বর্তমান সময়ের এক স্বনামধন্য সাংবাদিক। তিনি লন্ডনভিত্তিক দি ইনডিপেনডেন্ট সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা করে আসছেন। অন্তত ছয়টি বই লিখেছেন। তিনি সংক্রমণ সময়ের সাংবাদিকতাকে তুলনা করেছেন যুদ্ধ সাংবাদিকতার সঙ্গে। তিনি উল্লেখ করেছেন, সংক্রমণ ও যুদ্ধ দুটোই জরুরি পরিস্থিতি। কারণ এ দুই পরিস্থিতিতেই মানুষের প্রাণনাশের হুমকি থাকে। আর সেই কারণে সংক্রমণের সময় সাংবাদিকতাকে তিনি বিশেষভাবে সংবেদনশীল উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন, যুদ্ধে পরাজিত হলে মানুষ যেমন দায়িত্বশীল সরকারকে ক্ষমা করে না, ঠিক তেমনই সংক্রমণের সময়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সরকারের পতন হতে পারে। সেই কারণে এই সময়ের সাংবাদিকতাও খুবই সংবেদনশীল।

তথ্যসূত্র

* Hume, Janice. (2000) *'Journalism The forgotten 1918 Influenza Epidemic and Press Portrayal of Public Anxiety'* Journalism & Mass Communication Quarterly:Vol.77, No.4, Winter 2000)
* https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php
* Severin, Werner J., Tankard Jr, James W. (1988) *Communication Theories,* NewYork & London: Longman.
* https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/pandemic
* https://www.wordsense.eu/infodemic/
* https://edition.cnn.com/2020/03/01/tech/coronavirus-social-media-reliable-sources/index.html
* https://www.bbc.com/bengali/news-51410350
* https://www.prothomalo.com/world

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

কোভিড-১৯ মহামারি যে সাত উপায়ে পালটে দেবে সাংবাদিকতা

মিডিয়াশি প্রবন্ধ

ভাবানুবাদ– মো. শামসুল কবীর (সজল)

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত বিষয় নভেল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯, যা বদলে দিয়েছে মানুষের জীবনধারা। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান সারা দুনিয়াকে এভাবে কখনো স্থবির করতে পারেনি, যা করেছে এক অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী কখনো এমন থমকে যায়নি, যার মধ্য দিয়ে এখন আমরা চলেছি। তবু এই স্থবিরতা পেরিয়ে, নিত্যনতুন অনেক নিয়মনীতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা থেমে নেই।

> অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রে হয়তো পরিবর্তনটা অতটা তাৎক্ষণিক হবে না; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে সেই পরিবর্তনের বীজ বপন করবে এবং আমরা হয়তো সামনের বছরগুলোয় সেটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হব

বড়ো বড়ো ঘটনা এবং ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অনেক সময় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোকে ত্বরান্বিত করে। ২০২০ সালের বৈশ্বিক করোনাভাইরাস মহামারি এমন পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে এনেছে। কোয়ারেন্টিন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাপী যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, সেটা ভাইরাসের চেয়েও বেশি করে, এমনকি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে প্রকটভাবে, আগামী দিনগুলোতে বছরের পর বছর চলে আসা প্রচলিত সাংবাদিকতার পরিবর্তন সাধন করে যাবে।

এমনকি প্রতিবেদক যেভাবে নিউজ কাভার করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন এবং যেভাবে সমাধান বের করে আনেন, সেটাই তাদের নিজস্ব শিল্পের নতুন গন্তব্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, যা অনলাইন পত্রিকা, ডিজিটাল মিডিয়া কিংবা স্মার্টফোনের সূচনালগ্নেও এতটা পরিলক্ষিত হয়নি। অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রে হয়তো পরিবর্তনটা অতটা তাৎক্ষণিক হবে না; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে সেই পরিবর্তনের বীজ বপন করবে এবং আমরা হয়তো সামনের বছরগুলোয় সেটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হব। আর সেটাকে সামনে রেখেই এখানে সাতটি উপায় উপস্থাপন করা হচ্ছে– যেভাবে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি বা অতিমারি আগামী দিনে সাংবাদিকতা বদলে দেবে।

সম্প্রচারকারীরা স্কাইপে ও জুম সাক্ষাৎকারের ওপর বেশি নির্ভরশীল হবে

অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম কয়েক বছর ধরেই দূরবর্তী কোনো সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় এবং খরচ বাঁচাতে স্কাইপে, ফেসটাইম কিংবা জুম ভিডিয়ো চ্যাট প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে আসছে। সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য স্যাটেলাইট সংযোগ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পন্ন করার জন্য কাউকে স্টুডিয়োতে পাঠাতে হলে কখনো কখনো হাজার ডলার বা এরও বেশি খরচ হতে পারে এবং এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। যদিও বিগত দিনগুলোয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বড়ো বড়ো সম্প্রচারক ক্রমাগত নিম্নমানের জন্য স্কাইপে (বিপণন ও সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ স্টুডিয়োর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সহজলভ্যতা বিবেচনায় সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম) সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। কিন্তু এই মাধ্যমগুলো এখন যে শুধু পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে তাই-ই নয়, স্থানীয় প্রতিবেদকরা স্কাইপে ও জুম ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন এবং কিছু কিছু উপস্থাপক এমনকি বাড়ি বসে এগুলো ব্যবহার করে সংবাদ উপস্থাপনা করছেন।

যদিও সুচারুভাবে স্কাইপে সাক্ষাৎকার নিলে সেটা অনেক চমৎকার হতে পারে; কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষাৎকারদাতাই জানেন না তা কীভাবে করা সম্ভব এবং তারা এতে যথেষ্ট সময় দিতেও অনিচ্ছুক। এসব সত্ত্বেও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদকরা বর্তমানে স্কাইপে, জুম বা সমগোত্রীয় কোনো মাধ্যম ব্যবহারে যে সুবিধা পাচ্ছে, তা এগুলোর প্রয়োগকে আরও গতিশীল করবে ভবিষ্যতে, যখন আমাদের সামাজিক দূরত্ব ঘুচে যাবে। এ প্রক্রিয়ায় একজন টিভি প্রতিবেদকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে তার যে সময় বেঁচে যাবে, এর ফলে তিনি ওইদিন আরও বেশি সাক্ষাৎকার বা নিউজ কনটেন্ট বানাতে সক্ষম হবেন। জনগণ এই মাধ্যমগুলোকে যেভাবে খুব সহজে গ্রহণ করছে, সেটা বড়োদাগে নিম্নমানের প্রাসঙ্গিক ভিডিয়োর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকেই ইঙ্গিত করে, যা বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমগুলোকে একটা অন্তর্নিহিত অনুমতি প্রদান করে যেন তারা কালক্ষেপণের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা থেকে বেরিয়ে আসে– সেটা ভালো বা মন্দ যা-ই হোক।

আমরা আরও বেশি বিকেন্দ্রিক নিউজরুম দেখতে যাচ্ছি

দূরবর্তী কর্মপরিবেশ, এমনকি কিছু দূরবর্তী ডিজিটাল নিউজরুম যেখানে সংবাদকর্মীরা একই জায়গায় কখনোই জড়ো হন না। তবে এখনো তারা প্রচলিত নিউজরুমগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি প্রতিযোগিতা করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তবে কেন্দ্রীয় নিউজরুমের পরিবেশের মতো তারা বেশ খানিকটা উৎকর্ষতা লাভ করেছেন, যেখানে অন্তত একটি মূল সম্পাদকীয় দল জড়ো হতে পারে। এখন ধারা পালটেছে এবং ঐতিহ্যবাহী নিউজরুমগুলো, যেগুলো সর্বদা একটি মূল অফিসকেন্দ্রিক বিদ্যমান ছিল, তাদের পরিকাঠামো ও সংবাদদাতারা ছড়ানো ছিল বিশ্বজুড়ে, তারাও এখন কর্মীদের সঙ্গে দূরবর্তীভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপায় অন্বেষণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই নতুন, বিকেন্দ্রীভূত নিউজরুমগুলো এই মুহূর্তে সাময়িক অসুবিধা বা গিঁটের মতো মনে হতে পারে, তবে সময়ের পরিক্রমায় যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উদ্ভাবনগুলো সফল হিসেবে প্রমাণিত হবে, তখন অনেকেই এই উদ্ভাবনগুলোকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাবেন। যেখানে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত একটা রেডিয়ো নিউজ নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শহর থেকে প্রযোজক, উপস্থাপক এবং লেখকদের একসঙ্গে একই সময়ে একটা নেটওয়ার্কের আওতায় এনেছে। অন্যদিকে ক্ষীণকায় সংবাদ শিল্পের বাজেট এবং প্রকৃতপক্ষে একটা নিউজরুমের মালিকানা, ইজারা বা রক্ষণাবেক্ষণের উচ্চ ব্যয় বিবেচনা করুন।

আইহার্ট রেডিয়োর মতো গোষ্ঠীগুলো ইতোমধ্যে সংবাদকর্মী নিয়োগ দিয়েছে, যারা কয়েক শ মাইল দূরের বাজারের জন্য স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করছে (যদিও সেই প্রতিবেদনের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে)। সংবাদ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এই জবরদস্তিমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সাধুবাদ জানাই; আমরা দেখতে পাব যে কিছু ঐতিহ্যবাহী নিউজরুম আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই অন্তত পক্ষে খানিকটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এমনকি বৃহত্তর ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কগুলো এবং বৃহৎ মুনাফার মার্জিন দেখানোর জন্য মরিয়া সংবাদপত্রগুলোও এর সুবিধা নিতে শুরু করবে, যা নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক (যেখানে বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যমের হেড অফিস) কিছু সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আরও ডিআইওয়াই (ডু ইট ইউরসেলফ– নিজেই করি) এবং উদ্ভাবনীমূলক সম্প্রচার শুরু হবে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অভিনব, মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকতা প্রোগ্রামের দাবির পাশাপাশি বাস্তবতা হলো সাংবাদিকতা শিক্ষা আজও প্রায় পুরোপুরি ঐতিহ্যবাহী মিডিয়াগুলোকেই প্রতিফলন করে। কিছু কিছু সাংবাদিকতার ডিগ্রির জন্য, মাল্টিমিডিয়া বলতে মূলত ওই শিক্ষার্থী প্রিন্ট, সম্প্রচার এবং অনলাইন সংবাদ রচনায় পৃথক ক্লাসে অংশ নেয়। তবে এমন কোনো প্রোগ্রাম নয় যেখানে তারা প্রতিটি পৃথক মাধ্যমে ভালো করার জন্য একটি স্টোরের নতুন রূপায়ণ করতে শেখে। অচিরেই আমরা সেই পরিবর্তনটি দেখতে শুরু করব এবং এটি নেতৃত্ব দেবে শিক্ষার্থীরা, তাদের কোনো অধ্যাপক নন।

যেহেতু শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ করে অনলাইন স্ট্রিমিং ভিডিয়ো, জুম সাক্ষাৎকার এবং একটি স্মার্টফোন দিয়ে কীভাবে পেশাদার ব্রডকাস্ট নিউজ আউটলেটগুলো পরিচালনা করা যায়, তাই তারা শীঘ্রই সেই উদাহরণগুলো গ্রহণ করতে এবং প্রয়োগ করতে চলেছে। আগামী দিনের টিভি প্রতিবেদন বিগত সত্তর বছরের গতানুগতিক উপস্থাপনার মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা এখনো হচ্ছে এজন্য যে, আমরা একে অন্যকে শেখাই কীভাবে কী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা সম্প্রচার এবং অনলাইন সংবাদের জন্য নতুন ফরম্যাট উদ্ভাবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এটি এখন ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে যাতে আমরা হয়তো শীঘ্রই দেখতে পাব তাদের ডিআইওয়াই (ডু ইট ইউরসেলফ) সৃষ্টিগুলো আগামী দশকে মূলধারার প্রতিবেদন হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। আর হ্যাঁ, এটাতে নিদেনপক্ষে সেই সময়টুকু তো লাগবেই তাদের নতুন অবস্থান সুদৃঢ় করে এত বড়ো একটা শিল্পকে, যারা গতানুগতিকতার বাইরে যেতেই চায় না, তাদের প্রভাবিত করতে।

ভালো কাজগুলো সংবাদপত্রকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করবে

সংবাদপত্রগুলো এবং বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যারা সবকিছু ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তরিত করেছে, তারা অভ্যাসগত কারণে একটি অত্যন্ত পূর্বানুগত্যেও বিপরীত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চলেছে। যদিও সাবস্ক্রিপশন এবং অনলাইন পাঠকদের জন্যই সব আয়োজন, অনেকেই এই সংকটের মুহূর্তে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে সাধুবাদ অর্জনের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের কোভিড-১৯ এর সব কাভারেজ বিনামূল্যে এবং পেওয়ালস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত ঘোষণা করেছে। এই চেষ্টাটি মহৎ এবং সঠিক বটে, তবে বাস্তবতা হলো– যখন সংকট কেটে যাবে, সেসব পাঠক যারা চমৎকার-বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রতিবেদনের গভীরতা এবং ঔদার্যের প্রশংসা করতে শিখেছিলেন (আর হ্যাঁ, সংবাদপত্র বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে তখনও কিছু চমৎকার মানের পরিবেশনা হবে) তারা তখনও সাবস্ক্রিপশনের জন্য অর্থ দেবে না।

ডিজিটাল সংবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সংবাদপত্রগুলোয় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা ইন্ডাস্ট্রিতে দশগুণ প্রভাব ফেলবে যখন সংবাদপত্রের মালিকরা বুঝতে পারবেন যে এমন এক বিশ্বব্যাপী মহামারিও যথেষ্ট নয়, যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বিশ্বজুড়ে সবাইকে সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করেছিল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকদের প্রকৃতই সংবাদপত্রের সাবস্ক্রিপশনের অর্থ দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করবে। সমীকরণ মিলিয়ে বহু স্থানীয় সংবাদপত্রই মহামারির সময়টাতে তাদের বিজ্ঞাপনী ডলার পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিল, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং যে কেউ স্থানীয় সংবাদপত্রের শিল্পের তাৎক্ষণিক পতনের পূর্বাভাস দিতে পারত। এটি সামগ্রিকভাবে সংবাদশিল্পের জন্য চরম বিপর্যয়ের কারণ হবে, কেননা এটি অন-গ্রাউন্ড বিট রিপোর্টিংয়ের ওপর নির্ভর করে, যা শুধু সংবাদপত্রগুলো প্রয়োজনীয় মাত্রায় পরিচালনা করতে সক্ষম।

পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য পরামর্শদাতা হ্রাস

সব বিখ্যাত সাংবাদিক কিন্তু সাংবাদিকতার স্কুলে তৈরি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অনেক দুর্দান্ত সাংবাদিক কখনো সাংবাদিকতা অধ্যয়নই করেননি, তবে রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, আইন, দর্শন বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে লেখাপড়া শেষে পরবর্তী সময়ে ওনাদের কেউ কেউ সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এমনকি তারা যদি সাংবাদিকতা স্কুলে পড়াশোনা করেও থাকেন, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ নামজাদা সাংবাদিক এই কাজটি কর্মক্ষেত্রে শিখে থাকেন। তারা ভুল করে শিখেন, আবার কর্মী হিসেবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করেন, যেখানে তারা ক্রমাগত আরও ভালো করার চেষ্টা করেন এবং তারা নিউজরুমের পরামর্শগুরুদের কাছ থেকেও শিখেন। নিউজরুমগুলো আরও বিকেন্দ্রীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের শিক্ষাও আজ যেন দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে। প্রবীণ এবং নবীন সাংবাদিকরা একই জায়গায় পাশাপাশি কাজ না করার ফলে নবীন সাংবাদিকরা কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হারাচ্ছেন। এটি কেবল তাদের কাজের ফসলই নয়, যা তরুণ সাংবাদিকরা শিখেন, বরং তারা কীভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কীভাবে পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা করেন এবং ব্রেকিং নিউজ বা অন্যান্য উচ্চ সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে চাপ সামলে থাকেন। প্রবীণরাও নিউজরুমগুলোয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর তরুণ সাংবাদিকদের কাছ থেকে নতুন নতুন দক্ষতা এবং প্রযুক্তি শেখার সুযোগ হারাবেন। ঐতিহ্যবাহী নিউজরুমের চিরাচরিত কাঠামোটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে শেখার জায়গাটাও অদৃশ্য হয়ে যাবে।

স্টোরি কাভার করার জন্য আমরা ক্রমেই কমসংখ্যক সাংবাদিককে প্রেরণ করতে দেখব

নিউজরুমগুলো বিকেন্দ্রীভূত হয়ে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদকরাও দক্ষ হয়ে উঠছে কীভাবে স্কাইপে, ফেসটাইম বা জুম ব্যবহার করে দূর থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়। আর অন্যদিকে শহরজুড়ে খবরের কাগজের ট্রাক ও প্রতিবেদকদের দৌড়াদৌড়ি আগের চেয়ে অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এটি সামাজিক দূরত্ব, উচ্চ উৎপাদনশীলতা বা হ্রাসকৃত কর্মীদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হোক না কেন, আমরা আরও বেশি সংবাদ পরিবেশন দেখতে শুরু করব যেগুলো খুব কম লোক দ্বারা উৎপাদিত এবং যাদের সঙ্গে ওই ঘটনা কিংবা নির্মাতাদেরও যোগাযোগ ক্ষীণ। এই অমোঘ পরিবর্তনটি নিশ্চিতভাবে নিউজ পণ্যের মধ্যে গুণগত মান হ্রাস করবে, তবে একটি সমাজ হিসেবে আমরা এটি গ্রহণ করব কারণ– আমরা শিখছি এবং আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। সংবাদ সংস্থাগুলোর জন্য ব্যয় সাশ্রয় খুব সহজেই দুর্দান্ত হিসেবে প্রমাণ হবে কেননা এখন তারা জানেন যে এটি গ্রহণযোগ্য।

ভিডিয়ো, ফটোগ্রাফ এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু সরবরাহের জন্য জনসংযোগ এবং কনটেন্ট মার্কেটিং দলগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা

দূরবর্তী সাক্ষাৎকার এবং বিকেন্দ্রীভূত নিউজরুমগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাজনিত শূন্যতা পূরণের জন্য জনসংযোগ এবং কনটেন্ট মার্কেটিং পেশাজীবীদের ওপর নির্ভরশীলতাও সমান তালে বাড়তে থাকবে। যেহেতু প্রতিবেদক দূরে বসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন, সেহেতু তারা তাদের প্রয়োজনীয় ছবি, বি-রোল ভিডিয়ো এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর জন্য জনসংযোগ ও বিপণন টিমের ওপর আস্থা রাখতে বাধ্য হবেন। এটি জনসংযোগ পেশাজীবীদের জন্য উপকারী বলে প্রমাণ হতে পারে, যারা প্রতিনিয়ত 'অর্জিত মিডিয়া পিচিং' এবং ' পে ফর প্লে' সংবাদ প্রচারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াই করে আসছে, যা প্রায়ই বিপণন এবং বিজ্ঞাপন বিভাগের আওতাভুক্ত হয়। এটা সম্পাদকীয় ধারাবর্ণনায়ও সমতাবিধান করবে। মনে রাখবেন, এটি কেবল কোনো প্রতিবেদক যা জিজ্ঞাসা করে তা নয়, বরং তারা কী দেখে, কী পর্যবেক্ষণ করে এবং কী সাক্ষ্য দেয়, যা একটি গল্পকেও সুনির্দিষ্ট আকার এনে দেয়।

পরিশেষ এবং পরবর্তী ধাপসমূহ

এগুলো শুধু কয়েকটি উপায় যেভাবে কোভিড-১৯ মহামারি আগামী দিনের সাংবাদিকতাকে বদলে দেবে, তবে এটি কোনো চূড়ান্ত তালিকা নয়। এর মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তন হয়তো পরবর্তী দশকজুড়ে পুরোপুরি বিকাশ লাভ করবে তবে সেগুলো একা ঘটবে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতাগুলো বছরের পর বছর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে রূপ দেবে– এমন আরও অনেক উপায় রয়েছে। তবে নাটকীয় পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে এই শিল্পের মধ্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ মহামারি, স্বদূরত্ব বা সেলফ-ডিস্ট্যানসিং এবং তৎসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাগুলো আরও একটি বড়ো ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা আগত বছরগুলোয় সংবাদ শিল্পের আবর্তনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করবে।

অনুবাদক: সহ-সম্পাদক, দ্য নিউজভিউজ বিডি ডটকম
সম্পাদনা: আকিল জামান ইনু

করোনাকালে উপকূল সাংবাদিকতা

রফিকুল ইসলাম মন্টু

করোনাকাল। ঘরবন্দি মানুষ। এক অস্থির সময়। অন্যরকম জীবন। বদলে যাওয়া দৃশ্যপট। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির প্রভাব পড়েছে সবখানে। মানুষ শিখেছে অনেক কিছু, জেনেছে নতুন অনেক বিষয়। নতুন চর্চা, নতুনভাবে জীবনকে সাজানো। জনজীবনের প্রতিটি স্তরে এসেছে পরিবর্তন। করোনাকাল মানুষের জীবনে যেমন বদল এসেছে, একইভাবে পরিবর্তন এসেছে সাংবাদিকতায়। এই সময়ে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সাংবাদিকতা। একইভাবে সংকট আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে উপকূল সাংবাদিকতায়।

“মানুষ শিখেছে অনেক কিছু, জেনেছে নতুন অনেক বিষয়। নতুন চর্চা, নতুনভাবে জীবনকে সাজানো। জনজীবনের প্রতিটি স্তরে এসেছে পরিবর্তন”

বিশ্বব্যাপী মহামারি ভাইরাস করোনার কারণে এ বছরের মার্চে দেশে লকডাউন ঘোষণা করে সরকার। পরের মাসে ১৬ এপ্রিল থেকে সারাদেশকে সংক্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করে সরকার। এখনো এক কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি আমরা। যে শহরে মানুষের কোলাহল, রাস্তায় গায়ে গায়ে লাগানো গাড়ি থাকে, ফুটপাত দিয়ে নির্বিঘ্নে হাঁটার সুযোগ পর্যন্ত নেই– সেই রাজধানী শহর ফাঁকা। এ যেন এক অচেনা শহর। যতই

সংকট থাকুক, যতই নিষেধাজ্ঞা থাকুক, জরুরি খাতগুলোর সার্ভিস তো বন্ধ নেই। চিকিৎসকরা চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সময়ে তাদের সেবা সবচেয়ে জরুরি। আছে অন্যান্য পেশার লোকজনের ব্যস্ততা। সাংবাদিক সমাজেরও ভূমিকা কম নয়। তারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করছেন। ঘরবন্দি থাকলে সাংবাদিক কী করে খবর দেবেন পাঠকদের। চলমান ঘটনার বিষয়গুলোর জন্য রাজধানীর সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত ছোটাছুটি করছেন। কিন্তু উপকূল সাংবাদিকতায় বিশেষ খবর কীভাবে করা সম্ভব? লকডাউনে ঘরবন্দি অবস্থায় কীভাবে সম্ভব হয়েছে প্রতিবেদন লেখা? নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়েছেন সাংবাদিকরা।

সংজ্ঞার নিরিখে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী ১৯ জেলা নিয়ে উপকূল অঞ্চল। ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস, লবণাক্ততার প্রভাব এবং জোয়ার-ভাটার বিস্তৃতি– এই তিনটি উপাদান যেসব জেলায় বিদ্যমান, সেগুলো উপকূলীয় জেলা। যেখানে তিনটি বিষয় বিদ্যমান, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপকূল আর যেখানে কমপক্ষে দুটো উপাদান বিদ্যমান, সেটাকে পরোক্ষ উপকূল বলা হয়। কাজ করতে গিয়ে দেখা যায়, বাস্তবে এই ১৯টি জেলার মধ্যে ১৬টি কোনো না কোনোভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জেলাগুলো হচ্ছে– কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। এসব অঞ্চলের দুর্গম জনপদের বিশেষ খবর তুলে আনাটা স্বাভাবিক সময়েই অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। তার ওপর করোনাকালে সেই ঝুঁকি আরও বেড়ে গেছে। প্রান্তিকের মানুষের মাঝে করোনা নিয়ে সচেতনতার মাত্রা ছিল খুবই কম। ফলে ঝুঁকির মুখে ছিল উপকূলের সাংবাদিকতা। এই সময়ে খবর সংগ্রহ করতে বহুমুখী সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

“করোনার মাঝে ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত করে উপকূল সাংবাদিকতাকে আরও অনেকখানি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের পরে আমি নিজে মাঠে গিয়ে দেখেছি, সেখানে কাজ করা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল”

ঘূর্ণিঝড় আম্পান, বাড়তি চ্যালেঞ্জ

করোনার মধ্যেই উপকূল সাংবাদিকতায় আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আম্পান। ২০ মে এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে আঘাত হানে। বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে এ ঘূর্ণিঝড়ের ঝাপটা লাগলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে পশ্চিম উপকূল। সাতক্ষীরা, শ্যামনগর, আশাশুনি এবং খুলনার কয়রা উপজেলার বহু মানুষ এখনো সাইক্লোন শেল্টারে রয়েছেন। এদের ঘরে ফেরার পরিবেশ এখনো হয়নি। জোয়ারে পানি উঠছে, ভাটায় নেমে যাচ্ছে। অনেক স্থানে সাইক্লোন শেল্টারই আছে পানির তলায়। এর ভেতরে নিরুপায় মানুষজন চৌকি পেতে, গাদাগাদি করে কোনোভাবে মাথা গুঁজেছে। যে বেড়িবাঁধ ছুটে পানি প্রবেশ করেছিল, সেই বেড়িবাঁধ এখনো জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। আমরা যদি অন্য সময়ের ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে আম্পানের তুলনা করি, দেখব অন্য সময়ের ঘূর্ণিঝড় থেকে আম্পানের প্রেক্ষাপট অনেকটা আলাদা।

করোনার মাঝে ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত করে উপকূল সাংবাদিকতাকে আরও অনেকখানি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের পরে আমি নিজে মাঠে গিয়ে দেখেছি, সেখানে কাজ করা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। প্রথম সমস্যা ছিল যাতায়াতের ক্ষেত্রে। লকডাউনের কারণে ওই সময়ে গণপরিবহণ বন্ধ ছিল। ফলে যে কোনো সাংবাদিক ইচ্ছে করলেই মাঠে গিয়ে কাজ করতে পারেননি। বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে মাঠে যেতে হয়েছে। এই সময়ে মাঠে গিয়ে দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা সচেতনতা খুবই কম। করোনা মহামারির চেয়েও যেন ঘূর্ণিঝড় আম্পান তাদের কাছে বড়ো সংকট নিয়ে এসেছে। সে ভেসে যাওয়া ঘরের মালপত্র গুছাবে নাকি করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে? এই ধরনের সংকট তাকে ঘিরে রাখে। সেখানে কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিক নিজেই ঝুঁকির মুখে পড়েন। বাইরে থেকে আম্পান বিপন্ন এলাকায় গিয়ে হোটেলে অবস্থান এবং হোটেলে খাওয়াদাওয়া করাও ছিল কঠিন বিষয়। কেননা ওই সময়ে আবাসিক হোটেলগুলো বন্ধ ছিল। সরকারি ডাকবাংলোয় বাইরের লোকজনের অবস্থানে ছিল নিষেধাজ্ঞা। হোটেলে খাওয়া এবং অবস্থানের ক্ষেত্রে এইসব নিষেধাজ্ঞার মুখে আমি নিজেই পড়েছি। এসব কারণে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তথ্য সংগ্রহ, খবর তৈরি এবং পাঠানো ছিল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ।

বাধাগ্রস্ত দৈনন্দিন রিপোর্টিং

অন্য সময়ের চেয়ে করোনাকালে উপকূলের সাংবাদিকতায় কঠিন সময় চলছে। তারপরও উপকূলের সাংবাদিকরা বসে নেই। তারা ছুটে চলেছেন মানুষের কাছে। কর্মহীন দরিদ্র মানুষ,

বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক দিনমজুর ও জেলেরা কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন করোনার সময়ে। কষ্টের গল্পগুলো তুলে আনতে যেতে হচ্ছে তাদের কাছে। সাংবাদিকের ঝুঁকিটা সেখানে থেকেই যাচ্ছে। খাদ্য সহায়তা বিতরণের সংবাদ কাভারেজে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হয় উপকূলের সাংবাদিকদের। হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের খোঁজখবর নিতে হয়। এসব কারণে উপকূলে সাংবাদিকতায় ঝুঁকি অনেক বেশি। সংবাদ তৈরির জন্য স্বাভাবিক সময়ের মতো বের হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। সংবাদ সংগ্রহ এবং তা পাঠাতে বিশেষ কোনো নিরাপত্তা সাংবাদিকদের ছিল না। সতর্কতা বলতে মুখে মাস্ক। তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে, কিংবা পথে কোথাও সাবান-পানি পেলে হাত ধুয়ে নেওয়া। কিন্তু নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত লাগে না কখনো। উপকূলে বা গ্রামীণ জনপদে কাজ করতে হয় নানামুখী সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। উপকূলের সাংবাদিকরা একই সঙ্গে তাদের পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করেছেন, অন্যদিকে মাঠে ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরিবারের সদস্যরা এ কারণে ঝুঁকিতে পড়বে জেনেও উপকূলের সাংবাদিকরা থেমে থাকেননি। কিন্তু করোনাকালে প্রতিটি স্তরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমরা। অনলাইনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, নিজের সোর্স নেটওয়ার্ক কাজে লাগানো, ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ– এ কাজগুলো সাংবাদিকতায় অনেক বেড়েছে। উপকূল সাংবাদিকতায়ও সেসব পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। আগামী দিনে আমরা সেভাবে প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারি। করোনার মতো অন্য কোনো মহামারি এলেও যেন সাংবাদিকতা চালিয়ে যাওয়া যায়।

করোনাকালে আমাকে সারাক্ষণ খোঁজ নিতে হয় উপকূলের মানুষ কেমন আছেন। বারবার পোড় খাওয়া, অধিক সংগ্রামে বেঁচে থাকা সেই মানুষগুলোর মুখচ্ছবি ভেসে উঠে চোখের সামনে। কিন্তু ওদের কাছে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার সুযোগ আমার ছিল না। কেননা আমিও তো ঘরবন্দি। করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতিতে ঘরে থাকার সরকারি আদেশের মাত্র দুদিন আগে উপকূল থেকে ঢাকায় আসি। আর বের হওয়ার সুযোগ হলো না। আসলে বের হয়েও তো লাভ নেই। যেখানে যাব, সেখানেই আবার আটকা পড়ে থাকতে হবে। করোনাকালে আমি কীভাবে উপকূল সাংবাদিকতা করলাম? প্রশ্নটা আমি নিজেকেই করেছিলাম। আমি কীভাবে ঢাকায় থেকে উপকূলের মানুষের খবর লিখি। জবাবটাও পেয়ে গেছি খুব সহজেই।

করোনাকালে আমার সহচররা

বছরের পুরো মৌসুম যেখানে আমি মাঠে ঘুরে খবর লিখি, সেখানে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস আমাকে মাঠে যেতে বাধা দিচ্ছে। তবে কাজ তো থেমে থাকছে না! করোনাকালে আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সাথীরা কেমন আছে? সহচরদের এখন অবসর। কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ বা বিশ্রামে। কেউ আবার সেই যে কবে ফিল্ড থেকে কর্মযজ্ঞ শেষ করে এসে প্যাকেটবন্দি হয়েছে আর বের হয়নি। কারোনাকালে আমারও অবসর। কখনো ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি, ওরা কে কেমন আছে? অপ্রয়োজনেই উলটেপালটে দেখি কারও কোনো সমস্যা আছে কি না? বিপদে-আপদে ওরাই আমার সহচর, সঙ্গী, বন্ধু, একান্ত সাথী। আমার জন্য যে খাটুনিটা ওদের! এটা হয়তো লিখে শেষ করা যায় না। এই সঙ্গীরা না থাকলে আমার কাজই হয়তো বন্ধ হয়ে যেত। ওদের প্রায় সবাইকেই বিশ্রামে পাঠিয়েছি। কেউ কেউ দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে এই করোনাকালের সংকটেও কারও ওপর দিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড চাপ।

উপকূলের পথেঘাটে ঘুরতে এবং এখানে-সেখানে থেকে কাজ করতে সহায়তা করে আমার এই বন্ধুরা। আজ হঠাৎ করেই মনে হলো– পৃথিবী যখন ঘরবন্দি, আমার বন্ধুরাও তো আজ একই অবস্থায় সময় পার করছে। কতদিন ওরা বাইরের আলো-বাতাস দেখেনি। কেমন আছে ওরা? রোদ-বৃষ্টিতে উপকূলের পথে ছুটে চলার দৃশ্য ওরা দেখছে না কতদিন। দমকা হাওয়া, মেঘের গর্জন, নদী-সমুদ্রের ঢেউ, ট্রলার উথালপাতাল ছুটে চলার দৃশ্যগুলো হয়তো ওদেরও মনে পড়ছে। সেসব দৃশ্য মনে পড়ছে আমারও। আমি দেখি কত মানুষের মুখচ্ছবি। কত চেনা জনপদ। একা পথে রাতে হারিয়ে যাওয়ার সময়টার কথা মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে যায় উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যেদিন অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম, সেদিনের কথা। একবার রাতে সাপের ছোবলে ভয় পাওয়ার পর আবিষ্কার করলাম লাইফবয় সাবান থেরাপি। এর মানে লাইফবয় সাবানে কার্বলিক এসিড থাকে। সাপ কার্বলিক এসিড ভয় পায়। তাই দুর্গম জনপদে কোথাও ঘুমানোর সময় লাইফবয় সাবান চার টুকরো করে বিছানার চার কোনায় রেখে দিতাম। মনকে সান্ত্বনা দিতাম, এখানে কার্বলিক এসিড আছে, সাপ আসবে না। আরও কত কী বিচিত্র সব বিষয়াদি! আমার সহচরদের মনেও হয়তো এমন অনেক কথা উঁকি দিচ্ছে করোনার এই ঘরবন্দিকালে।

আমার ক্যামেরা। নাইকন ৫৩০০। বেশ বিচক্ষণ সে। তার চোখ যে কতকিছু দেখেছে। উপকূলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সব চিনে আমার ক্যামেরা। হাজারো বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের মুখ সে দেখেছে। চোখে চোখ রেখেছে। সে দেখেছে কীভাবে ভাঙনে বিলীন হয় গ্রামের পর গ্রাম। বহু মানুষকে সে কাঁদতে দেখেছে। বহু মানুষকে হাসতেও দেখেছে। শিশুদের ডুবসাঁতার, নারীদের জীবিকার খোঁজে ছুটে চলা, কৃষকের হালচাষের দৃশ্য বহুবার অবলোকন করেছে আমার প্রিয় নাইকন। দূরের ছবি দেখতে সে কখনো ওরই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ৫৫-৩০০ লেন্সের সাহায্য নিয়েছে। মানুষের মানচিত্রে ওরা হাসিমাখা মুখের ছবিও যেমন দেখেছে; তেমনই আবার প্রবল রাগের মুখেও পড়েছে। ছবি তোলা পাপ বলে অনেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আবার কেউ রাগান্বিত হয়ে বলেছে– ছবি তোলেন ক্যান, আমরা তো কিছু পাই না। আবার কারও পালটা প্রশ্ন– আমাগো ছবি নিয়া ব্যবসা করবেন? কেউ কেউ বলেছে– এত ছবি তুললেন অবস্থার তো বদল হলো না। এসব কিছুর সাক্ষী আমার ক্যামেরা-লেন্সযুগল। পিনপতন নীরবতায় ঘুমিয়ে আছে ক্যামেরাটি। তার পাশেই ঘুমাচ্ছে লেন্সটি। ওরা হয়তো ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের দেশে উপকূলের সেসব দৃশ্যই দেখে চলেছে, যা এতদিন ধরে দেখেছিল বাস্তবে।

এই করোনার দুর্দিনে আমার যে সহচর সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছে, ওদের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এখানে একটি নাম বললে হবে না– দুটিকেই দিতে হবে এই কৃতিত্ব। একটি ল্যাপটপ, অন্যটি মোবাইল ফোন। এদের মধ্যে আবার ল্যাপটপের ওপর দিয়ে ঝক্কিঝামেলা একটু বেশিই যায়। কেননা ঘরবন্দি সময়কালে প্রায় ১০ ঘণ্টা আমি ওর সঙ্গেই কাজ করি। আজকাল রমজানে ইফতারের পরপর ওর সঙ্গে; ছুটি সেই ভোর ৫টা, ৬টা, কখনো ৭টা। ওর বাটনে টিপে টিপে আমি খবর বানাই। নেট-দুনিয়ায় প্রবেশ করি। ই-মেইল আদানপ্রদান, খবর পাঠানো, এমনকি ছবি এডিটিং, ভিডিয়ো এডিটিংয়ের কাজগুলোও হয় ওরই বুকেই। ১১.৫ ইঞ্চি সাইজের অ্যাসার ল্যাপটপটি না হলে আমার যে কীভাবে সময় কাটত, কল্পনা করতে পারছি না। করোনাকাল বলে কোনো কথা নয়, সব সময়ই ল্যাপটপ আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনে সাড়া দেয়। আবার ওকে ভোগান্তিতেও পড়তে হয় অনেক। উপকূলের দুর্গম জনপদের অনেক স্থানে বিদ্যুৎ নেই। বিকল্প জেনারেটর বা সূর্যবাতি। সূর্যবাতিতে সবখানে চার্জ হয় না। জেনারেটরের সাহায্য নিয়ে চার্জ দিতে হয়। সবখানে তো জেনারেটরের কানেকশন থাকে না। তাই চার্জ নিতে আমার ল্যাপটপকে যেতে হয় মুদি দোকানে, ফটোকপিয়ারের

দোকানে, ছবি তোলার স্টুডিয়োতে, এমনকি লোহালক্কড়ের দোকান অবধি। এভাবে উপকূলে ঘুরে ঘুরে আমার সঙ্গে ল্যাপটপও অর্জন করেছে অনেক অভিজ্ঞতা।

আমার ল্যাপটপ বিশাল তথ্যের ভান্ডার। ওর কাছে থাকা পুরোনো ফাইলগুলো চাইতেই মুহূর্তে বের করে দেয়। আমার সেসব খুবই কাজে লাগে। এই ল্যাপটপের আবার দুই সঙ্গী আছে– এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক। এই যে এত এত ছবি তুলি, ভিডিয়ো করি, দিনে দিনে জমে অনেক ফাইল। এগুলো কোথায় রাখি! বৃহৎ জায়গা নিয়ে আমাকে সাহায্য করছে আমার দুই এক্সটার্নাল। ওদেরকে রাখতে হয় খুবই সাবধানে। ওদের মন ভারি স্পর্শকাতর। অল্পতেই ওদের মন খারাপ হয়, দুঃখ পায়। বেশি কষ্ট পেলে ওদের কাছে রাখা তথ্য-উপাত্ত আবার হারিয়েও ফেলতে পারে। আমার দুই এক্সটার্নাল চাইলে এই অবসরে বসে বসে সারা উপকূল একবার দেখেও নিতে পারে। কেননা ওদের কাছেই গোটা উপকূলের আর্কাইভ। হয়তো সেসময় ওরা পেয়ে ওঠে না; কেননা করোনার ক্রান্তিকালে ওদের দুজনকেই আমি প্রায়ই কাছে ডাকি। ওরা তো আবার ল্যাপটপেরও সহযোগী। আমার আরেক অতি প্রয়োজনীয় সঙ্গী মোবাইল ফোনের কথা না বললে সে হয়তো রাগ করে ফেলতে পারে। অনেককে দেখেছি দুটো মোবাইল রাখতে। আমার একটাই মোবাইল– হুয়াওয়ে নোভা-টু-আই। বেশ ভালো সার্ভিস তার। করোনাকালে ল্যাপটপের কাছাকাছি সেবা দিচ্ছে আমাকে। নেটের সঙ্গে সারাক্ষণ কানেক্ট রাখছে। যে কোনো সময়ে যে কারও সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করছে। ল্যাপটপে না এসে অনায়াসে জরুরি প্রয়োজনগুলো মোবাইল ফোন দিয়েই সারতে পারি। এ আমার বিপদের বন্ধু।

> তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে উপকূল সাংবাদিকতায় সোর্স নেটওয়ার্ক যে বড়ো ধরনের শক্তি জোগাতে পারে, তারই উদাহরণ কারোনাকালে আমার সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার ক্লাসে বিভিন্ন সময়ে নেটওয়ার্কিংয়ের কথা বলা হয়

করোনাকালে আরেক সহচরের ওপর এখন খুব চাপ যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে আমার নোটবুক। পুরোনো নোটবুকের পাতা উলটানো আমার একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এখন সংকটকালে সেই প্রবণতা আরও বেশি। নোটবুক খুলে আমি যেন দেখতে পাই আমার খবরের মানুষকে। উপকূলের কত জায়গা– এই যেমন, ঢালচর, কালিঞ্চি, সাবরাং, ধানখালী, ভোলানাথপুর, বনবিবিতলা, বুড়িগোলিনী, নীল ডুমুর, চাঁদনিমুখা, ঘড়িলাল, চিলা, বৈটপুর, মদনপুর, উড়িরচর, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কুকরিমুকরি, মনপুরা, হরিষপুর, বাউরিয়া, সোনাদিয়া, ধলঘাটা, ডাঙ্গরপাড়া– আরও কত নাম! এসব নাম বলে শেষ করা যাবে না। এসব স্থানের মানুষের শ্রম-ঘাম-কষ্টের কথা আছে আমার নোটবুকে। নীরবে-নিভৃতে নোটবুকের পাতায়ই হয়তো কাঁদছে একজন ইলিশ শিকারি, একজন কৃষক, ছেলেহারা মা, কিংবা স্বামীহারা এক নারী। আমার চিরন্তন সঙ্গীর জায়গাটা অবশ্যই নোটবুককেই দিয়ে রেখেছি। করোনা সংকটের এই ঘরবন্দি দশায় অনেক নোটবুক আমাকে একসঙ্গে সাহায্য করছে। মুখস্থ পাতাগুলো আমি বারবার দেখছি। তথ্যপ্রযুক্তির যতই প্রসার ঘটুক, আমার হাতে লেখা নোটবুকের আবেদন ফুরোয় না। এই সহায়তা অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া দুরূহ।

নিবিড়ভাবে সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমার আরেক সহচর পিঠের ব্যাগ। আমি যেখানেই যাই, ঢাকায় থাকি, কী উপকূলে থাকি, সে আমার পিঠেই থাকে। আমার সঙ্গে থাকা জরুরি প্রয়োজনের সব উপকরণ সে বহন করে। কখনো কখনো তার ভারটা একটু বেশিই হয়ে যায়। তবুও সে রাগ করে না; বয়ে নিয়ে চলে। আমার ব্যাগটারও আজ মন খারাপ। করোনার খবর শুনে সেই যে কবে সে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে; আর উঠেনি। হয়তো সেও ঘুমিয়ে আছে। কখনো কখনো আমার প্রয়োজনে তাকে জাগাতে হয় এটা ওটা বের করার জন্য। কাজ সেরে আবার তাকে ঘুম পারিয়ে রাখি। সে যাতে সুস্থ থাকে, নিরাপদে থাকে, সেজন্য তাকে ঢেকে রেখেছি যত্নে।

আমার নিত্য সহচরদের মধ্যে আরও যাদের নাম উল্লেখ করতেই হয়, তারা হলো– বলপেন, সাইনপেন, হাইলাইট পেন, ক্যামেরার ট্রাইপড, মাইক্রোফোন, পেনড্রাইভ, অনেক চার্জার, ক্যামেরার অতিরিক্ত ব্যাটারি, লাইটার, মোনাজাতউদ্দিনের কয়েকটি বই, ইন্টারনেট মডেম, ছোটো সাইজের কাঁচি, ব্লেড, সুঁইসুতা, ন্যাপথলিন, সাবান, প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিরুনি, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, স্যাভলন, ছাতা, রেইনকোট, টি-শার্ট, প্যান্ট, জুতা ইত্যাদি নানান কিছু। আমার কাছে এতকিছুর ভিড়ে একটা জিনিস থাকে না। সেটা আয়না। আমার সঙ্গী হিসেবে আয়না রাখার প্রয়োজন অনুভব করিনি কখনো। ফলে আয়নায় নিজের মুখটা দেখা খুব একটা হয়ে ওঠে না। নিজের মুখ দেখার চেয়ে বৃহৎ আয়নার ক্যানভাসে দেখতে চাই উপকূলীয় জনপদের বিধ্বস্ত চেহারাটা। করোনা শেষে আমার সব সঙ্গীর ঘুম ভাঙবে। ওরা আবার তৈরি হবে মাঠে যাওয়ার জন্য। সবাই মিলে আবার আমরা দেখব উপকূল।

সহায়ক হতে পারে সোর্স নেটওয়ার্ক

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে উপকূল সাংবাদিকতায় সোর্স নেটওয়ার্ক যে বড়ো ধরনের শক্তি জোগাতে পারে, তারই উদাহরণ কারোনাকালে আমার সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার ক্লাসে বিভিন্ন সময়ে নেটওয়ার্কিংয়ের কথা বলা হয়। কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের একটা নেটওয়ার্ক গড়েও ওঠে। কিন্তু সেটা থাকে একটা লেভেল পর্যন্ত। হয়তো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বা সোর্স পর্যায়ে সাংবাদিকরা নেটওয়ার্ক সংহত রাখে। কিন্তু প্রান্তিক মানুষ পর্যায়ে বা কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে বিরাট সহায়তা পাওয়া যেতে পারে; তারই উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে আমার উপকূল সাংবাদিকতায়। করোনাকাল বলে কথা নয়; যে কোনো পরিস্থিতিতে বা কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেও মাঠপর্যায়ের নেটওয়ার্ক সাংবাদিকতায় এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে দিতে পারে।

আমি কাজ করছি বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল ঘুরে। সমগ্র উপকূল অঞ্চল বলতে আমি বোঝাচ্ছি পূর্বে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ থেকে শুরু করে পশ্চিমে শ্যামনগরের কালিঞ্চি গ্রাম পর্যন্ত। পুরো এলাকাটি আমার মুখস্থ; করতলের মতোই চেনা। কোনো এলাকার নাম সামনে এলে ওই এলাকাটিই যেন আমার চোখের সামনে ভাসে। সেখানকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর যেন আমি দেখতে পাই। সঙ্গে কিছু মানুষের চেহারাও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাঠপর্যায়ের মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না রাখলে আমার এই নেটওয়ার্ক গড়ে উঠত না। ফলে আমার কাজ করা কঠিন হতো। বিপরীতে যোগাযোগ আছে বলে কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে প্রান্তিকের কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। কিন্তু আমি যাদের সঙ্গে কথা বলি, অধিকাংশ মানুষের মোবাইল নম্বর, ঠিকানা নোটবুটে টুকে রাখি। তখনই মনে করি, এই মানুষটি আমার নেটওয়ার্কের একজন সদস্য। দুবার প্রান্তিকের কোনো মানুষকে কল দিলে তারা অন্তত আরও পাঁচবার কল দেবে– এটা নিশ্চিত। আদানপ্রদানের ভেতর দিয়ে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সাংবাদিক হিসেবে আমার দিক থেকে তথ্য পাওয়ার তাগিদ যেমন থাকে; তার চেয়েও নাগরিকগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য দেওয়ার তাগিদ আরও বেশি থাকে।

উপকূলের নাগরিকদের কথা মনে করতে গিয়ে আমার খুব মনে পড়ছে ভোলার চরফ্যাশনের ঢালচরের নুরুদ্দিন মাঝির কথা। ইদের দিনে তার একটা কল আমি পাবই। গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। সেই প্রান্তিক জনপদ থেকে আমার খোঁজ নেয় এই মানুষটি। কুকরিমুকরির কৃষক মোশাররফ হোসেন প্রায়ই কল দিয়ে খোঁজ নেন– কোথায় আছি, কেমন আছি। খুলনার দাকোপের আবদুর রহমান– ট্রলারের মাঝি। নিজের ট্রলার নিজেই চালান। তার ট্রলারে একরাত ঘুমাতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে শহরে পড়ে; আরেক ছেলে এলাকার প্রাথমিকে। মাঝেমধ্যে আমাকে তিনি খবর দেন। কয়রার বনজীবী মিজানুর রহমান, যিনি এক ভরদুপুরে আমাকে জোর করে বাড়িতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় হয়েছিল তার ছেলে নিশানের সঙ্গে, মাধ্যমিকে পড়ছে। স্বপ্ন সেনা অফিসার হওয়ার।

আমার খুবই পরিচিত শরণখোলার তাফালবাড়ির ইউসুফ মৃধা, যিনি বর্ষা এলেই নদীর ধারের ঘরটি নিয়ে আতঙ্কে থাকেন। আমার চোখে ভাসে আলেকজান্ডারের হেজুরাম শাহের চেহারা, যে কিনা হঠাৎ আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি তো সেদিন কতগুলো ডাকাতের সামনে পড়েছিলেন। ওরা ভালো মানুষ নয়। এড়িয়ে চলে এসেছেন ভালো হয়েছে। আমি ভুলতে পারি না চর-আবদুল্লাহর আবুল হোসেন মাঝির কথা। যিনি নিজের নামের সঙ্গে স্ত্রী বিবি সাহিদার নামটি নোটবুকে লিখতে বাধ্য করেছিলেন। চর-আবদুল্লাহর আবদুল মতিন; যিনি আমাকে চরে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, স্যার আপনি এই চরে? আপনাকে তো সেবার ওই চরে দেখেছি। চলে আসার পরও মতিন একটা ডিম ভেজে প্লেটে করে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার পিছু নেন। আমি এই বয়স্ক মানুষটার কথা ফেলতে পারি না। আমার মনে পড়ে চর-আবদুল্লাহর শফিউল্লা, তেলিরচরের আলাউদ্দিন মাস্টার, চম্পা বেগম আর শাহিনুর বেগমদের কথা। আছেন এমন আরও বহুজন। খাতার পাতা ফুরিয়ে যাবে, তবুও নাম ফুরোবে না। এই মানুষগুলো আমাকে খবর দেয়। এরা আমার খবরের ভান্ডার।

উপকূলে আমার খবরের নেটওয়ার্ক পাঁচ ভাগে বিভক্ত– ১. স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় কর্মরত উপকূলীয় সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক। ২. তৃণমূল পেশাজীবী নাগরিক নেটওয়ার্ক। ৩. নেতৃস্থানীয় নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক। ৪. কমিউনিটি পর্যায়ের নেটওয়ার্ক। ৫. অফিস পর্যায়ের নেটওয়ার্ক। বলা যায়, এই পাঁচ স্তরের নেটওয়ার্ক আমার উপকূল সাংবাদিকতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবার তাহলে এই পাঁচ স্তরের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ছোটো করে বলি।

উপকূল অঞ্চলে কর্মরত সব সাংবাদিক যে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমনটা নয়। জেলা ও উপজেলা এবং বিভিন্ন বন্দর পর্যায়ের নির্দিষ্ট কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে আমার নেটওয়ার্ক রয়েছে। এদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে সমগ্র উপকূলের সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে আমি আপডেট থাকতে পারি। এরপর আসি তৃণমূল পেশাজীবীদের কথায়। আগেই উল্লেখ করলাম, একদম মাঠের পেশাজীবী, যেমন– জেলে, কৃষক, ভ্যানচালক, মাছ বিক্রেতা, দুধ বিক্রেতা, ট্রলারচালক, নৌকাচালক, বনজীবী– এই স্তরে রয়েছে আরেকটি নেটওয়ার্ক। এদের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য আদানপ্রদানে জানতে পারি নানান কিছু। এরপর আসি নেতৃস্থানীয় নাগরিক পর্যায়ে। প্রত্যেক এলাকায়ই কিন্তু নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপ থাকে, যারা এলাকার সব ঘটনায় নেতৃত্ব দেন। যেমন– ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির নেতা ইত্যাদি। তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে রয়েছে আরেকটি নেটওয়ার্ক। উপকূলের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু নির্বাচিত কমিউনিটি রয়েছে। প্রত্যেক স্থানে ৫-৭ জন করে লোক আছে। তারা এলাকার বিষয়গুলো নজরে রাখে। গ্রুপে একমত হয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের খবর আমাকে দেয়। আরেকটি নেটওয়ার্ক স্তর রয়েছে অফিস পর্যায়ে। যেমন স্থানীয় সরকারি অফিস, এনজিও অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ইত্যাদি।

এবার এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যদি তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাই, তাহলে চমৎকার এক সমন্বয় হয়ে যায়। আমি সেটাই করছি। অনেকেই আমার সঙ্গে সামাজিক মিডিয়ায় সম্পৃক্ত রয়েছেন। যাদের সে সুযোগ নেই, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি মোবাইল ফোনে। এভাবে শুধু বক্তব্য নয় বা মানুষের কথা নয়, অনেক সময় আলোকচিত্র কিংবা ভিডিয়ো পর্যন্ত আমার নেটওয়ার্ক আমাকে পাঠায়। আলোচনায় আমি এটাই বোঝাতে চাই, একজন সাংবাদিকের কাজকে এগিয়ে নিতে নেটওয়ার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সাংবাদিক যে ফিল্ডে কাজ করেন, তার সেই ফিল্ডের একেবারে মাঠপর্যায়ে নেটওয়ার্ক থাকা খুবই জরুরি। তাহলে করোনার মতো জরুরি সময়েও আমরা অন্তত একেবারে আটকে থাকব না।

লেখক: কোস্টাল জার্নালিজম স্পেশালিস্ট

করোনাকালে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ও এক মানবিক প্রধানমন্ত্রী

মোল্লা জালাল

বলাই হয়, সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। কেন ঝুঁকিপূর্ণ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে– এ পেশায় জীবন-জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, মহামারি যা-ই হোক একজন সরকারি কর্মচারী মাস শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পান। চাকরি শেষে অবসরকালেও তারা পেনশন পায়। ফলে কর্মক্ষম থাকার সময় থেকে শুরু করে কর্মহীন অবস্থায়ও সরকারি কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকদের নেই। যে যত বড়ো প্রতিষ্ঠানেই কাজ করুন না কেন, তিনি যত মেধাবী হোন না কেন, কখন কী কারণে চাকরি যাবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আবার চাকরি করলেও কবে কখন কোন তারিখে কোন মাসের বেতন পাবেন, তারও কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তবুও সাংবাদিকদের কলম চলে, ক্যামেরা কথা বলে। সমাজের নানা অনিয়ম-অনাচারের চিত্র তুলে ধরার কারণে অনেকের অকালে জীবনও যায়। তারপরও সাংবাদিকরা কাজ করেন, করে যাচ্ছেন নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে। যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও সাংবাদিক ঘরে বসে থাকেন না। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি

“তবুও সাংবাদিকদের কলম চলে, ক্যামেরা কথা বলে। সমাজের নানা অনিয়ম-অনাচারের চিত্র তুলে ধরার কারণে অনেকের অকালে জীবনও যায়। তারপরও সাংবাদিকরা কাজ করেন, করে যাচ্ছেন নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে”

নিয়ে সঠিক তথ্যের সন্ধানে বেরিয়ে যান। খবর সংগ্রহ করে দেশ ও জাতিকে জানান। তাই সাংবাদিকরা ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলেও তাদের কাজ মূলত রাষ্ট্রের জন্য। এ কারণেই সাংবাদিকতাকে রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' বলা হয়ে থাকে। এখানেও প্রশ্ন থাকে, সাংবাদিকরা যদি রাষ্ট্রের জন্যই কাজ করে তবে রাষ্ট্র কেন তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা দেয় না। দেয় না এ কারণে, রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত লোকজন রাষ্ট্রের কর্মচারী। রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে কাজ করতে হয়। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেতে পারে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। রাষ্ট্রের কর্মচারীরা তা দেখলেও অনেক সময় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। এক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা সাহসিকতার সঙ্গে সব অনিয়ম, অনাচার আর অবিচারের কথা জাতির সামনে তুলে ধরতে পারে। সাংবাদিক যদি সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী হয় তবে এ কাজটি তারা করতে পারবে না। এ কারণেই রাষ্ট্র সাংবাদিকদের বিবেকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

বিশ্বের দেশে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও সরকারগুলো সাংবাদিকদের এই স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়। সাংবাদিকদের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। আবার এর উলটোটাও আছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও সংবাদপত্রের তথা সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ও জীবন-জীবিকার সুরক্ষায় কতগুলো আইন ও বিধিবিধান রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজই হচ্ছে এগুলো দেখভাল করা। অপরদিকে সাংবাদিকদের রুটি-রুজির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে আইনি প্রতিনিধি হচ্ছে সাংবাদিক ইউনিয়ন। সাংবাদিক ইউনিয়নের কাজ কর্মরত প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সরকারের কাছ থেকে সাংবাদিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেওয়া। ইউনিয়ন ক্লাব নয়। ক্লাবে মানুষ যায় টাকা খরচ করে আনন্দ-বিনোদন করতে। ইউনিয়ন সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণে দায়বদ্ধ। সাংবাদিক ইউনিয়ন এই আইনি অধিকার পেয়েছিল ১৯৭৪ সালে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদের জীবন-জীবিকার খবরাখবর রাখতেন। তিনি জানতেন সাংবাদিকতা পেশার ঝুঁকির বিষয়গুলো। তাই তিনি ১৯৭৪ সালে 'The Newspaper Employees (Serviccs & Condition) Act 74' প্রণয়ন করে সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদাকে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত করেন। ওই আইনের আলোকেই গঠন করা হয় ওয়েজবোর্ড। ঘোষণা করা হয় রোয়েদাদ। শুধু তা-ই নয়, জাতির পিতা সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ' (পিআইবি)। পাশাপাশি প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানসহ সাংবাদিকতার নীতিমালার আওতায় দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল'।

বিশ্বের দেশে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও সরকারগুলো সাংবাদিকদের এই স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়। সাংবাদিকদের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে

সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতি ৫ বছর পর সংবাদপত্র শিল্পের সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ওয়েজবোর্ড গঠন করে। ওয়েজবোর্ড শুধু একটি বেতন কাঠামো নয়। এটি রাষ্ট্রের আইন। এ আইনে সংবাদকর্মীদের বেতনভাতার অধিকারসহ মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে এই ওয়েজবোর্ড মানছে না। তারা তাদের মর্জিমাফিক প্রতিষ্ঠান চালাতে আগ্রহী। ফলে সাংবাদিকতার জগতে ক্রমান্বয়ে নানা রকমের অনাচার, অবিচার ও দুর্বৃত্তায়নের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে জাতির পিতাকে হত্যার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাংবাদিকতাকে পণ্য হিসেবে বেচা-কেনার বাজারে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ কাজে সামরিক শাসকরা সাংবাদিকতার মানদণ্ডকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সংবাদপত্রজগতে দালাল শ্রেণির জন্ম দেয়। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সাংবাদিকদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় সাংবাদিকদের মধ্যে দলাদলি, লবিং-গ্রুপিং শুরু হয়। সরকারি সুযোগ-সুবিধার লোভ-লালসা সাংবাদিকদের দলদাস এবং এই পেশাকে লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত করে। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে সংবাদপত্র শিল্পে শুরু হয় বেশুমার লুটপাট। শত ফুল ফুটতে দেওয়ার যুক্তিতে দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সংবাদপত্রের মালিকানা। লেখাপড়া নেই, নেই ভাষাজ্ঞান, নিজের নাম-স্বাক্ষর করতে অক্ষম, ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না– এমন সব লোক রাতারাতি হয়ে যায় পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাংবাদিকতা বিষয়ে অনার্সসহ উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতার উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও অনেকে কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে

চাকরি পান না। ফলে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। বর্তমানে সাংবাদিকতার 'সংজ্ঞা' নির্ধারণ করা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। অপরদিকে সংবাদপত্রকে বানানো হয়েছে গণমাধ্যম শিল্প। আমার বিবেচনায় শব্দগত দিক থেকে সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা আর গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমকর্মীর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'সাংবাদিকতা' শব্দে পেশাগত মর্যাদার গন্ধ আছে। কিন্তু 'গণমাধ্যমকর্মী' শব্দে তা নেই। এতে কেমন যেন কর্মচারী-কর্মচারী ভাব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সাংবাদিকদের 'সাংবাদিক' হিসেবেই জানে এবং সম্মান দেয়। তা সত্ত্বেও নানা অজুহাত ও যুক্তি দেখিয়ে খুব ঠান্ডামাথায় সাংবাদিকদের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে এ কাজগুলো করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

বর্তমানে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম শিল্পে বহু পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে। মালিক, সম্পাদক, প্রকাশকদের অনেক দল, অনেক গ্রুপ। এসব দল আর গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থের ধান্ধায়। কারণ, সংবাদপত্র শিল্প বর্তমানে একটি লাভজনক ব্যবসায়ী খাত। তাই সারাদেশে হাজার হাজার পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা, রেডিয়ো ও টেলিভিশন। এখন যোগ হচ্ছে– অনলাইন নিউজ পোর্টাল আর আইপি টিভি। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকটা ছাড়া অন্যগুলো সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীদের ঠিকমতো বেতন দেয় না। ওয়েজবোর্ড মানে না। ক্ষেত্রবিশেষ সাংবাদিকদের কাছ থেকে নানারকমের সুবিধা আদায় করে নেয়। সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র নগদ টাকায় বেচা-বিক্রি হয়।

২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদার রক্ষাকবচ 'The Newspaper Employees (Serviccs & Condition) Act 74' আইনটি বাতিল করে শ্রম আইনের আওতায় ফেলে সাংবাদিকদের কলকারখানার শ্রমিকদের কাতারে নামিয়ে দেয়। এতে সাংবাদিকদের মেধাভিত্তিক শ্রমের মর্যাদা ও মূল্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে সাংবাদিক ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের জীবিকার নিশ্চয়তার জন্য ৭৪ সালের আইনটিকে সময়োপযোগী করে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে সাংবাদিকদের সবকিছুকে একত্রিত করে 'ওরাল সেলাইনের মতো' এক চিমটি নুন, এক মুঠো গুড়, আধা লিটার পানি মিশিয়ে 'দেড় ঘোটা' পদ্ধতিতে সাংবাদিকদের 'কর্মী' হিসেবে রূপান্তরিত করে নতুন আইন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার নাম 'গণমাধ্যমকর্মী আইন'। এর পেছনে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর করপোরেট পুঁজির ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তারা নিজেরা এসব করেনি। করিয়েছে সরকারের আমলা এবং বিশেষভাবে খ্যাতিমান সাংবাদিক নেতা ও ব্যক্তিদের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রীর যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, 'লাইন টু লাইন' পাঠ করে, দেখে কোনো আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি যা করতে বলেছিলেন, তার বদলে হতে যাচ্ছে ভিন্নমাত্রায় অন্যকিছু। এদিকে নোয়াবের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নবম ওয়েজবোর্ডের গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দিলে নোয়াব এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ওই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, 'সাংবাদিক ছাড়া সংবাদপত্রের মালিকরা অস্তিত্বহীন।' তার মানে হচ্ছে, রাষ্ট্রের আইন মনে করে, সংবাদপত্রের অন্তঃপ্রাণ হচ্ছেন সাংবাদিকরা। আর এজন্যই রাষ্ট্র ওয়েজবোর্ড আইন দ্বারা সংবাদকর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছে। দীর্ঘদিনের সেই অধিকার ও মর্যাদা চিরতরে বিনষ্ট করে সংবাদকর্মীদের আবারো দিনমজুর বানানোর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। নোয়াবের ওই মামলা এখনো বিচারাধীন।

এদিকে করোনা মহামারির এই সময়ে দেশে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনা সদস্যদের পাশাপাশি সাংবাদিকরা সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। এ কাজে সম্পৃক্ত সবার সুরক্ষা থাকলেও সাংবাদিকদের নেই। করোনা মহামারির ভয়াবহ এই দুঃসময়ের মধ্যেও ছাঁটাই, বেতন না দেওয়া, কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানা নিপীড়নের মধ্যেও সাংবাদিকরা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হননি।

বাংলাদেশে ৮ মার্চ করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এই খবর সব মহলে জানাজানি হতে আরও ১০-১৫ দিন লাগে। এরই মাঝে দেশের গণমাধ্যম মালিকদের রাস্তায় বসে যাওয়ার অবস্থা হয়। এ অজুহাতে তারা শুরু করেন ঢালাওভাবে ছাঁটাই। একের পর এক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেসব পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীদের এই দুঃসময়ে পথে বসানো হয়, সেই পত্রিকা কিন্তু চালু রাখে 'অনলাইন'। তার মানে, সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীবিহীন 'লাভের দোকান'। এ সময় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মালিকদের বারবার অনুরোধ করা হয় তারা যেন ঢালাওভাবে ছাঁটাই বন্ধ করেন। এ দাবিতে ইউনিয়ন নিয়মিত মিটিং, মানববন্ধন করতে শুরু করে। ততদিনে শত শত সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করায় পথে বসতে বাধ্য হয়। এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সাংবাদিকদের এই দুঃসময়ে ইউনিয়নের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ান। তিনি আর্থিক সহায়তার হাত বাড়ালে সাংবাদিকদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। তাঁরই মানবিক সদিচ্ছায় সারাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে বিএফইউজে'র সহযোগিতায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়। করোনার সময়ে কর্মরত মূলধারার সাংবাদিকরা প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার এই প্যাকেজ থেকে ১০ হাজার করে টাকা পাচ্ছেন। করোনাকালীন উপমহাদেশের কোথাও কোনো সরকার সাংবাদিকদের পাশে এভাবে দাঁড়ায়নি। মানবিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় দেশের ৬৪টি জেলায় দলমতনির্বিশেষে হাজার হাজার সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পেয়ে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে একটি ভরসার জায়গা হিসেবে দেখছেন। আগে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম এতটা বিস্তৃত ছিল না। এবারই প্রথম বিএফইউজে'র সহযোগিতায় সারাদেশের সাংবাদিকরা বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের সাংবাদিকদের বিপদে-আপদে সংকটে সহায়তার জন্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট থেকে প্রতিবছর সাংবাদিকরা চিকিৎসা সহায়তাসহ বড়ো ধরনের নানা সংকটে অনুদান পেয়ে থাকেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকতা পেশার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশকে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে একটি সত্যিকার গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। বিপরীতে কতিপয় গণমাধ্যম মালিক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ একশ্রেণির সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ 'গণমাধ্যমকে' কেবল নিজেদের বাণিজ্যিক সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছেন। ফলে রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসেবে সাংবাদিকতা উজ্জ্বলতর ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে ক্রমশ কালিমালিপ্ত হয়ে অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বর্তমান সময়ের মেধাবী কোনো ছেলেমেয়ে সাংবাদিকতা পেশায় আসবে না। কারণ, তারা দেখছে এ পেশায় জীবন ও জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, বিএফইউজে সভাপতি

মফস্বল সাংবাদিকতায় করোনার প্রভাব

রহিম বাদশা

বৈশ্বিক মহামারি করোনা বাংলাদেশের মফস্বল সাংবাদিকতায় বিশাল প্রভাববিস্তার করেছে। এই দুর্যোগে একদিকে যেমন সাংবাদিকতার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়েছে, অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রায় শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। সাংবাদিকতায় অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয় নতুন নতুন সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকদের। সব মিলিয়ে মফস্বল সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে করোনাকালে। ফলে করোনা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের মফস্বল সাংবাদিকতা নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

> করোনাকালে মফস্বল সাংবাদিকদের চিরসঙ্গী অর্থনৈতিক সংকট যেমন তীব্রতর হয়েছে, তেমনই স্বাস্থ্যঝুঁকি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে

করোনাকালে মফস্বল সাংবাদিকদের চিরসঙ্গী অর্থনৈতিক সংকট যেমন তীব্রতর হয়েছে, তেমনই স্বাস্থ্যঝুঁকি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে। স্মরণকালের মহাসংকটে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জে পড়েছে জেলা-উপজেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে সংবাদ জানার আগ্রহ ও চাহিদা বেড়েছে। গ্রামের একেবারে নিভৃত পল্লি কিংবা দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষটি এখন সবার আগে সর্বশেষ খবরটি পেতে চায়। বিশেষ

করে নিজ এলাকা থেকে শুরু করে সারাদেশ এমনকি বিশ্বের সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতি জানতে সবাই উদ্‌গ্রীব। মানুষের এই চাহিদা মাথায় রেখেই 'সব কাজের কাজি' খ্যাত মফস্বল সাংবাদিকদের প্রধান বিটে পরিণত হয়েছে 'করোনা আপডেট'।

কোথায় কে করোনায় আক্রান্ত হলো, কে আক্রান্ত অবস্থায় বা উপসর্গে মারা গেল, উপসর্গে মৃতের নমুনা সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফন করা হয়েছে কি না– এসবের খবর রাখতে হয় নিত্যদিন। পাশাপাশি উপসর্গে মৃতদের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট কী, আক্রান্ত/মৃতদের বাসাবাড়ি লকডাউন হলো কি না, উপজেলা-জেলাভিত্তিক দৈনিক আক্রান্ত ও মৃতের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এসব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নেওয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী/স্থানীয়দের বক্তব্য নিয়ে নিজ নিজ গণমাধ্যমের ধরন অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি এবং পাঠাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও কর্মকর্তা সরাসরি সাক্ষাৎ/বক্তব্য দিতে আপত্তি জানান। টেলিফোন বা মোবাইল ফোনেও সাড়া দেন না কোনো কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

করোনার এই বাড়তি দায়িত্বের পাশাপাশি প্রাত্যহিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজের নানা বিষয়ে খোঁজ রাখতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই সময়ে বড়ো ধরনের সভা-সমাবেশ-রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ থাকলেও মফস্বল সাংবাদিকদের ব্যস্ততা বেড়েছে বহুগুণে। সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে করোনাকালে মফস্বল সাংবাদিকদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে যাতায়াত ও যোগাযোগ। দীর্ঘদিন গণপরিবহণ বন্ধ থাকায় মফস্বল সাংবাদিকদের জেলাব্যাপী যাতায়াতে বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমানে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হলেও গণপরিবহণে চলাচল করতে গিয়ে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি নিতে হচ্ছে। সহকর্মীর মোটরবাইকে সঙ্গী হলে অথবা নিজের মোটরবাইকে অন্য সহকর্মীকে সঙ্গে নিলেও একই ধরনের ঝুঁকি বিদ্যমান। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় রোজ উন্নতমানের নিরাপত্তাসামগ্রী (পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস) ব্যবহারের সামর্থ্য নেই অধিকাংশ মফস্বল সাংবাদিকের। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বাধ্য হয়ে কিংবা নিজের খামখেয়ালিপনায় অনেকে একই সুরক্ষাসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে চলেছেন।

এসব হাসপাতালে করোনা সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকি জেনেও মফস্বল সাংবাদিকদের প্রতিদিন এক বা একাধিকবার সেখানে ছুটে যেতে হয়

সংবাদ সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থল অথবা কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া সাংবাদিকদের প্রধান কাজ। করোনাকালে এতে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছে করোনার নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চিকিৎসা দেওয়া হয় এমন অতিঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া। এসব হাসপাতালে করোনা সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকি জেনেও মফস্বল সাংবাদিকদের প্রতিদিন এক বা একাধিকবার সেখানে ছুটে যেতে হয়। এছাড়া ত্রাণ বিতরণ, দুর্ঘটনাস্থল, লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, থানা প্রভৃতি জনবহুল স্থানে পেশাগত কারণে সাংবাদিকদের ছুটতে হয় করোনায় সংক্রমণের ঝুঁকি জেনেই।

কখনো কখনো ভালো সংবাদ, ছবি, ভিডিয়ো ফুটেজের প্রয়োজনে করোনা আর স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি ভুলে যান অনেক সংবাদকর্মী। বলতে গেলে চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতোই স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে সমানতালে কাজ করছেন মফস্বল সাংবাদিকরা। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মফস্বল সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ইতোমধ্যে। বৈচিত্র্যপূর্ণ এত অধিকসংখ্যক বিটে এতটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় না ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদেরও। সেই তুলনায় প্রাপ্তি ও স্বীকৃতি দুটোতেই উপেক্ষিত মফস্বল সাংবাদিকরা।

করোনার এই বৈশ্বিক মহামারিতে মফস্বল সাংবাদিকদের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ, ভোগান্তি, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকটে। এমনিতেই মফস্বলের অধিকাংশ সাংবাদিক কর্মক্ষেত্র, পরিশ্রম ও ঝুঁকির তুলনায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে খুব সামান্য অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপনের কমিশন অধিকাংশ সাংবাদিকের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে উভয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বাজার একেবারে সংকুচিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের সম্মানিও প্রায় বন্ধ হয়েছে করোনা পরিস্থিতির কারণে।

সার্বিকভাবে কাজের পরিধি ও ঝুঁকি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলেও আর্থিক সুবিধা মোটেও বাড়েনি। বরং করোনা পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে কিংবা করোনার অজুহাতে অনেক জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমও জেলা-উপজেলার সাংবাদিকদের সম্মানি কমিয়ে দিয়েছে কিংবা বন্ধ করে দিয়েছে, যা মফস্বল সাংবাদিকদের জন্য 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে মফস্বলের অনেক সাংবাদিককে পেশা ছেড়ে দিতে হতে পারে। আর পণ করে সাংবাদিকতায় থেকে যাওয়াদের দুর্দশা, দুর্ভোগ অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। করোনাকালে সঠিক তথ্য দিয়ে গুজব প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছেন মফস্বলের সাংবাদিকরা। অথচ এসব সাংবাদিকের পাশে নেই মানবকল্যাণ-সমাজকল্যাণ-জনসেবার নামধারী কোনো ব্যক্তি-সংগঠন। নেই স্থানীয়-জাতীয়-আন্তর্জাতিক দাতা কিংবা সাহায্য সংস্থা। এ পর্যন্ত কালের একমাত্র

প্রাপ্তি বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত এককালীন ১০ হাজার টাকা অনুদান।

এমন বাস্তবতায় করোনার মতো বৈশ্বিক দুর্যোগে স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে তথ্য, ছবি, ফুটেজ আদানপ্রদান ব্যাপকভাবে বাড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এতে ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে আসবে। অকুস্থলে যাওয়ার পরিবর্তে টেলিফোন, মোবাইল, অ্যাপের ব্যবহারও ঝুঁকি ব্যাপকভাবে কমাতে পারে। ফাইল ছবি, ফুটেজের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকে। বিশেষ প্রয়োজনে অডিয়ো-ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন অনেকে। অধিকাংশ পত্রিকা, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ছাড় দিচ্ছেন এখন।

সাংবাদিকদের অপ্রয়োজনে ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতাও কমাতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেউ আক্রান্ত হলে তার গোটা পরিবারটিও ভুক্তভোগী হবে নানাভাবে। আক্রান্তের ঝুঁকি বাড়বে তাদেরও। এছাড়া অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপায় খুঁজতে হবে। সাংবাদিক নেতাদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজ নিজ গণমাধ্যম থেকে বেতন/সম্মানি আদায় নিশ্চিত হলেই এই সংকট অনেকটা কেটে যাবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সরকারি প্রণোদনা দফায় দফায় অব্যাহত রেখেও এর সমাধান করা যেতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য ঋণের আওতায়ও আনা যেতে পারে সাংবাদিকদের।

মফস্বল সাংবাদিকদের মতোই জেলা-উপজেলা থেকে প্রকাশিত মফস্বলের দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর এখন চরম ক্রান্তিকাল চলছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় সব পত্রিকার কমবেশি প্রচারসংখ্যা কমেছে। অস্বাভাবিক হারে কমেছে বিজ্ঞাপন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের সীমাবদ্ধ দান-অনুদানও বন্ধ প্রায়। স্মরণকালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে টিকে থাকতে না পেরে কিছু পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনিয়মিত হয়ে গেছে অনেক পত্রিকার প্রকাশনা। যারা এখনও নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন, তারাও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তবে সরকারি বকেয়া বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধের বিশেষ উদ্যোগ পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। করোনাকাল ও করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত মফস্বলের পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়েছে। করোনাবিষয়ক সরকারের বিভিন্ন প্রচারের বিজ্ঞাপন স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় দেওয়া হলে সরকার ও গণমাধ্যম উভয়পক্ষই উপকৃত হতে পারে। পত্রিকাগুলোকে বিনা সুদে কিংবা স্বল্পসুদে ঋণ দিয়েও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, এমন দুর্যোগে গণমাধ্যম সচল না থাকলে সৃষ্ট গুজবে বহু লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

করোনা পরিস্থিতি অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও সাংবাদিকদের পেশাগত অনেক উৎকর্ষতার সুযোগও এনে দিয়েছে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে প্রায় শতভাগ মফস্বল সাংবাদিক এখন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় এসে গেছেন। অনেকে সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি সাংবাদিকদের পেশাগতভাবে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। বেড়েছে গণমাধ্যমের গুরুত্ব, চাহিদা ও বিস্তৃতি। অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারিতা ও অপপ্রচার থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে চলেছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। ছাপা পত্রিকার ক্রান্তিকালের বিপরীতে পত্রিকাগুলোর অনলাইন ভার্সন এবং অনলাইন গণমাধ্যমের তাৎক্ষণিক খবর জানার চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। কিন্তু সেখানেও প্রধান সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে আয়ের খাত সংকুচিত হওয়া। অনলাইনেও বিজ্ঞাপন কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। পাশাপাশি বেশুমার অনুনোমোদিত অনিয়ন্ত্রিত ও ভুঁইফোঁড় অনলাইনের অপসাংবাদিকতা মফস্বলের পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। হুমকিতে ফেলেছে মফস্বলের সংবাদপত্র শিল্পকেও। এসবের লাগাম টানার এখনই সময়। এমন বাস্তবতায় করোনা-পরবর্তী বাংলাদেশের মফস্বল সাংবাদিকতায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রকৃত গণমাধ্যমকর্মীদের সম্মিলিত প্রয়াস সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর প্রবাহ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ

রাশেদ রাব্বি

দেশে করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রোগটির যে ভয়াবহতা দেখা দিয়েছিল, বাংলাদেশে তেমনটি দেখা যায়নি। দেশে ইতালিপ্রবাসী তিনজনের শরীরে প্রথম কোভিড-১৯ শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। এছাড়া নতুন এই রোগে দেশে প্রথম মৃত্যু ঘটে ১৮ মার্চ। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দেশীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে, যা পরে ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। যেহেতু রোগটি একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায়, তাই এই সিদ্ধান্ত ছিল সময়োপযোগী। তবে জনসাধারণের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরি যেসব সেবা আছে, সেগুলো বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি জনসাধারণকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ক্রয় ও চিকিৎসা গ্রহণ) কোনোভাবেই ঘরের বাইরে না আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

> “প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) করোনা-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ৫০০ জন চিকিৎসকের তালিকা তৈরি এবং তাদের প্রস্তুত রাখে। যাতে তাদের করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়”

এ সময়ে অফিস-আদালতে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে হলে সেটি অনলাইনে সম্পাদন করতে বলা হয়, যা ছিল একটি আধুনিক এবং ডিজিটাল

সিদ্ধান্ত। জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যবস্থা করে। ২৪ মার্চ থেকে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোয় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে সশস্ত্রবাহিনী জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নিয়োজিত করা হয়। দেশের ৬৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের নিজ নিজ জেলার প্রয়োজন অনুযায়ী সশস্ত্রবাহিনীর জেলা কমান্ডারকে রিকুইজিশন দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) করোনা-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ৫০০ জন চিকিৎসকের তালিকা তৈরি এবং তাদের প্রস্তুত রাখে। যাতে তাদের করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। জননিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সময়ে সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাগম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিশেষ করে অসুস্থ, জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মসজিদে না যাওয়ার জন্য বারবার নিষেধ করা হয়।

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) শনাক্তের পরীক্ষা সহজ ও দ্রুত করতে পরীক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধির কাজ করছে সরকার। যা প্রথমে একটি বা দুটি ল্যাবে সীমিত থাকলেও পরে ৯৭টি আরটি পিসিআর ল্যাবে উন্নীত হয়। এখন পর্যন্ত ১২ লাখ ৭৩ হাজার ১৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দিতে ঢাকায় ১০ হাজার ৫০টিসহ সারাদেশে ১৪ হাজার ৫৬৫টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের কাফন, জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করার জন্য সিটি করপোরেশন এলাকায় ৬ সদস্যের একটি টিম গঠন করছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এখন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন ৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৮ জন এবং ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬৩৮ জন। এ লেখা লিখা পর্যন্ত আইসোলেশনে আছেন ১৮ হাজার ৬৫৭ জন।

পাশাপাশি রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইডিসিআর) হেল্পলাইন স্থাপন করা হয়েছে । এর নম্বরগুলো হলো: ১৬২৬৩ (Hotline), ৩৩৩, ১০৬৫৫, ০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪, ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮, ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১। এখন পর্যন্ত এখান থেকে সেবা নিয়েছেন ১ কোটি ৮৫ লাখ ২৪ হাজার ৬৪৩ জন। হটলাইন সিস্টেমে চিকিৎসাসেবা ও তথ্য প্রদানে যুক্ত আছেন ৪ হাজার ৬০২ জন চিকিৎসাসেবা কর্মী। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় পাওয়ার সুবিধার্থে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যার ঠিকানা: www.corona.gov.bd।

এ ছাড়াও করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জনগণের সার্বিক অবস্থা জানতে উদ্যোগ নেয় সরকার। গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য পেতে সব মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে এসএমএস পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

করোনাভাইরাস নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৩ হাজার ৬২৫ জন চিকিৎসক, ১ হাজার ৩১৪ জন নার্স এবং ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। এছাড়া কোভিড-১৯ বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছেন ১০ হাজার ৮১২ জন চিকিৎসক। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের সূত্রমতে, ডাক্তার ও চিকিৎসা সেবাদানকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার পিপিই, গাউন, শু প্রটেক্টর, অ্যাপ্রোন বিতরণ করছে।

পাশাপাশি হ্যান্ড স্যানিটাইজারের জন্য অ্যালকোহল, করোনা টেস্ট কিট, টেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, জীবাণুনাশক, মাস্ক, প্রটেকটিভ গিয়ারসহ ১৭ ধরনের পণ্য আমদানিতে শুল্ক ও কর অব্যাহতির ঘোষণা দিয়েছে রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দুটি শর্ত থাকছে, তা হলো– ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য আমদানি করতে হবে এবং আমদানি করা পণ্য মানসম্মত কি না, তা অধিদপ্তর কর্তৃক নিশ্চিত করা।

এ ছাড়াও করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জনগণের সার্বিক অবস্থা জানতে উদ্যোগ নেয় সরকার। গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য পেতে সব মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে এসএমএস পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসএমএসের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের গ্রাহকের শ্বাসকষ্ট, জ্বর বা কাশি থাকলে *৩৩৩২# নম্বরে ডায়াল করতে বলা হচ্ছে। কোনো গ্রাহক *৩৩৩২# নম্বরে কল করলে ৯০ সেকেন্ডের একটি আইভিআর ভয়েস পাবে, যেখানে আবার তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হচ্ছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো সরাসরি চলে যাচ্ছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বা আইইডিসিআরের কাছে। পরে সেগুলো পর্যালোচনা করে কিছু গ্রাহকের কাছে আরও বিস্তারিত তথ্য জানাতে তাকে আইইডিসিআর থেকে ফোন করা হবে।

যেসব পেশার ব্যক্তি এই সংকট মোকাবিলায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে থেকে কাজ করছেন, তাদের জন্য স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কোভিড ১৯ মোকাবিলায় যেসব চিকিৎসক,

নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন, তাদের সম্মানি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এই বিষয়ে তালিকা তৈরি করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দায়িত্বপালনকালে যদি কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন, তার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা সরকার নেবে। মাঠে থেকে দায়িত্ব পালন করে চলা সব স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের সব কর্মচারীর জন্য বিমার ব্যবস্থা করা হবে। পদমর্যাদা অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা করা হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি আছে বা মারা গেলে তাদের জন্য এই বিমা ৫ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।

এদিকে বাংলাদেশে ৮ মার্চ ভাইরাসটি ধারা পড়ার পর অর্থাৎ মহামারির মহারণে প্রবেশ করার পর প্রথম মাসে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রস্তুতির ঘটতি দেখা গেলেও এপ্রিল থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশ তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। এই সময়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা বাড়াতে প্রায় ৩০টি আরটি পিসিআর মেশিন কেনা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরটি পিসিআর মেশিন এই কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ৯০টির বেশি পিসিআর মেশিনে এই পরীক্ষা চলছে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট বা পিপিই সংগ্রহ শুরু করে। বিভিন্ন অনুদানের পাশাপাশি সরকার দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে কেনা শুরু করে। এতে সারাদেশে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিরাপত্তাসামগ্রী যেমন সেনিটাইজার, সাবান ইত্যাদি বেশি বেশি উৎপাদনে সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোক উৎসাহের পাশাপাশি সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়। এ সময় মাস্ক, পিপিই ও স্যানিটাইজারের ঘাটতি মেটাতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে এনওসি দেয়।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় সরকার প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে। এর মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষকে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচিসহ ২০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকা। আর ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন কিনতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সরঞ্জম কেনায় সরকার ব্যয় করেছে ৭৫০ কোটি টাকা। বাকি টাকা ব্যয় হবে গ্রামীণ মৎস্যজীবী ও পোলট্রি উদ্যোক্তাদের জন্য।

এর আগে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রণোদনার প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার। করোনাভাইরাসের কারণে দেশের অর্থনৈতিক খাত যে ক্ষতির শিকার হয়েছে, তা কাটাতেই এই প্রণোদনা প্যাকেজ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ এপ্রিল করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে শিল্পঋণের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা, রফতানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ ও কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি, রফতানি উন্নয়ন ফান্ড ১২ হাজার ৫০০ কোটি, প্রিশিপমেন্ট ঋণ ৫ হাজার কোটি, গরিব মানুষকে নগদ সহায়তায় ৭৬১ কোটি, অতিরিক্ত ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার জন্য ৮৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পাশাপাশি করোনাযোদ্ধাদের জন্য পুরস্কার ও স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় যেসব চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন, তাদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। তাছাড়াও এই বিপদের সময় সাধারণ মানুষের সেবায় মাঠে থেকে দায়িত্ব পালন করে চলা মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের সব কর্মচারীর জন্য বিশেষ বিমার ব্যবস্থা করার ঘোষণাও দেন তিনি। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু ধন্যবাদ নয়, আমি তাদের উৎসাহিত করতে চাই। তাদের পুরস্কৃত করতে চাই।' এছাড়া করোনার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে মানুষের সেবা করতে গিয়ে যদি কেউ আক্রান্ত হন, তার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভারও সরকার নেবে। এজন্য পদমর্যাদা অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমা করে দেওয়া হবে। এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তাই যদি কেউ মারা যান তবে এই বিমা পাঁচগুণ করার ঘোষণাও দেওয়া হয়।

দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে গণপরিবহণ চলাচল বন্ধ করা হলেও পরবর্তী সময়ে সীমিত আকারে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। জনসাধারণকে যথাসম্ভব গণপরিবহণ পরিহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যারা জরুরি প্রয়োজনে গণপরিবহণ ব্যবহার করবে, তাদের অবশ্যই করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেই গণপরিবহণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো দেশকে কোভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে।

লেখক: সিনিয়র রিপোর্টার, যুগান্তর

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

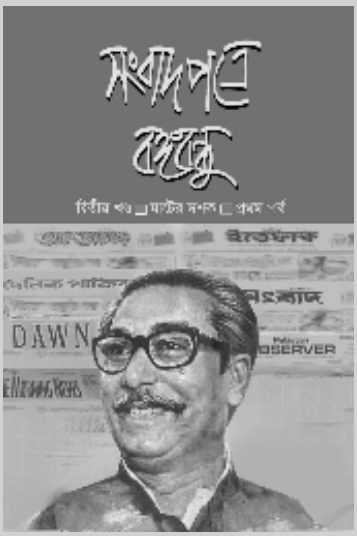

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনার ভ্যাকসিন রিপোর্টিং বিবেচ্য বিষয়

ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া

করোনাভাইরাসের এই বৈশ্বিক মহামারির সময়ে প্রথম থেকেই মানুষের চাওয়া ছিল ভাইরাস নিরাময়ের একটি কার্যকরী অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আর ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা। সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী গবেষকরা নেমে পড়েন গবেষণায়। কেউ কেউ চেষ্টা করেন বিভিন্ন রোগে ইতোমধ্যে ব্যবহৃত ওষুধগুলোর কোনো কোনোটা দিয়ে চিকিৎসা করার। ভাইরাস নিরাময়ে সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আবিষ্কারে এখনো সফল হওয়া যায়নি। আর পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বিস্তার করার ক্ষমতাশালী এমন ভাইরাস মোকাবিলায় কার্যকরী টিকার কোনো বিকল্প নেই। তাই বেশ কয়েকটি দেশের প্রায় একশ গবেষকদল নেমে পড়ে টিকা আবিষ্কারে। টিকা আবিষ্কারের ব্যয়বহুল প্রকল্পে যারা বিনিয়োগ করছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের বিনিয়োগ ওঠানোর কথা মাথায় রেখে এগুলোর প্রচার-প্রচারণা করছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার আগেই টিকাগুলোর বাজার খুঁজছে।

“টিকা আবিষ্কারের ব্যয়বহুল প্রকল্পে যারা বিনিয়োগ করছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের বিনিয়োগ ওঠানোর কথা মাথায় রেখে এগুলোর প্রচার-প্রচারণা করছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার আগেই টিকাগুলোর বাজার খুঁজছে”

করোনা মহামারির প্রথমদিকে টিকা বা ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণায় প্রাপ্ত খুবই সামান্য গুরুত্বের তথ্যকেও অনেক বেশি ফলাও করে প্রচার করা

হয়েছে। মে মাসে বিশ্বের অন্যতম অগ্রসর স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের এনআইএইচ মাত্র ছয়টি রেসাস প্রজাতির বানরের ওপর পরিচালিত গবেষণার প্রাথমিক ফল একটি গবেষণাপত্রের প্রকাশনাপূর্ব খসড়া প্রকাশ পায় এমন একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে, যাতে সাধারণের অবাধ প্রবেশ ছিল। সেই ট্রায়ালের খবর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের গন্তব্য থেকে বহুদূরে।

কোভিডরোধী টিকা আবিষ্কারে গবেষণারত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বায়োটেক কোম্পানি মডার্নার পক্ষে ১৮ মে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় আটজন অংশগ্রহণকারীর শরীরে টিকা প্রয়োগে তাদের রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে করোনাভাইরাসরোধী অ্যান্টিবডি তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ১৮ মে দিনশেষে পুঁজিবাজারে মডার্নার শেয়ারের মূল্য আগের দিনের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। সেদিনই সংক্রামক ব্যাধি এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের প্রভাবশালী সাংবাদিক হেলেন ব্রেন্সওয়েল এক নিবন্ধে সমালোচনা করে বলেন, 'এখানে গবেষণার সবকিছু প্রকাশ করা হয়নি, যার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আর এখনই এর ভালো-মন্দ সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলার সময় হয়নি।' এর পরের দিনই মডার্নার শেয়ার ১০ শতাংশ পড়ে যায়।

৯ সেপ্টেম্বর সংবাদমাধ্যমে এমন একটি খবর বের হয় যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাধীন করোনাভাইরাসের টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তৃতীয় ধাপে এক রোগীর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় গবেষণার পরীক্ষামূলক টিকা প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। খবরটি বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন টিকাটি ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর প্রভাবে পরের দিন তার বিনিয়োগকারী কোম্পানি এস্টাজেনেকার শেয়ারের দর ২ শতাংশ পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেই কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আর সেই অসুস্থতার কারণ যদি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে গবেষণাধীন ওষুধ বা টিকা প্রদান সাময়িক স্থগিত রাখা একটা সাধারণ নিয়ম। এটা কেবল একজন স্বেচ্ছাসেবীর শরীরে ঘটেছে, যার দুদিন পরেই পুনরায় টিকা দেওয়া শুরু হয়। অপরদিকে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এই টিকারই প্রথম ধাপের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এর গবেষণার সফলতার খবর প্রকাশের দিনে শেয়ারের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল ৫ শতাংশ।

> গবেষণার খুব প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারিত এই খবরগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাচাই ছাড়াই পরিবেশিত হয়; তথ্যের এই ফাঁকফোকরগুলো অনুধাবন করতে হবে

বিভিন্ন সময় তাদের টিকার সফলতার খবর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো প্রেস রিলিজের মাধ্যমে দিচ্ছে সংবাদমাধ্যমকে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে সংবাদকর্মীরা ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই খবর। গবেষণার খুব প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারিত এই খবরগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাচাই ছাড়াই পরিবেশিত হয়; তথ্যের এই ফাঁকফোকরগুলো অনুধাবন করতে হবে। সংবাদকর্মীদের টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ধাপগুলো, বিশেষ ধাপের প্রাপ্ত ফলাফলের গুরুত্ব, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বা খবর তৈরিতে কোনো কারসাজি আছে কি না এবং সাধারণ পাঠক এই খবরটিকে কীভাবে অনুধাবন করবেন, তা মাথায় রাখতে হবে।

টিকা বা ওষুধ যথেষ্ট কার্যকর এবং নিরাপদ কি না, তা দেখার জন্য একমাত্র উপায় রেন্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা আরসিটির ধাপগুলো জানতে হবে। এই ধাপগুলোয় প্রাপ্ত এবং প্রচারিত তথ্যগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলে গণমাধ্যম তথা জনগণের মাঝে ভুল তথ্যের প্লাবন বয়ে যেতে পারে। টিকার কার্যকারিতার গবেষণার (আরসিটি) প্রথম ধাপে মাত্র ২০ থেকে ১০০ জনের ওপর পরীক্ষা করা হয়, যাতে কেবল ওষুধ বা টিকাটির নিরাপদ মাত্রা (ডোজ) এবং তা দেহে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা দেখা হয়। এই পর্যায়ে কোভিডের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধক টিকাটি কতটা কার্যকর হবে, তা বলা যাবে না। কোভিডের টিকার ভবিষ্যতের ব্যাপারে যেখানে চিকিৎসক-বিজ্ঞানীরাই চরম নিশ্চিত নন, তখন কোনো গবেষণার খণ্ডিত ফলাফল সাধারণ পাঠক বা দর্শকের জন্য প্রচার করলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচার নয় বরং বিজ্ঞান সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার নিয়ম, যেগুলো সমপর্যায়ের একাধিক যাচাইকারীর যাচাই শেষে প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণাপত্রগুলো প্রাপ্ত ফলাফলের পাশাপাশি গবেষণার সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব পক্ষের পরিচয় উন্মুক্ত রাখা হয়। কিন্তু করোনা মহামারির এই সময়ে গবেষণার ফলাফলগুলো যথেষ্ট যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনেক সাময়িকীতে ছাপানো হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা নিজেদের মাঝে তা বিনিময় করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রিপোর্ট লেখার বা পরিবেশনের সময় সংবাদকর্মী এবং তাদের উদ্দিষ্ট পাঠক বা দর্শক অনেক সময়ই এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর সঠিক অর্থ এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (USFDA) আরসিটির তিনটি ধাপ শেষে এর ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ওপর বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয় ওষুধ বা টিকা ব্যবহার করার অনুমোদন দেওয়া হবে কি না।

সংবাদকর্মীদের এটাও মনে রাখতে হবে, কেবল একটি গবেষণা বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ওপর ভিত্তি করেই কোনো টিকা বা ওষুধকে কার্যকর বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অনেক ধারাবাহিক গবেষণার পরই সবকিছু বিবেচনার পর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ধারাবাহিক গবেষণার আংশিক রিপোর্টগুলো পিয়ের রিভিউ বা সমপর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই করে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়। সেই প্রকাশিত ফলাফলের ওপর বিভিন্ন গবেষকের সমালোচনামূলক নিবন্ধও প্রকাশ করা হয়।

এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে, যে কোনো টিকা বা ওষুধের কিছু মৃদু বা তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন– মাথাব্যথা, মৃদু সর্দি-জ্বর, শরীর ব্যথা, ত্বকে চুলকানি ইত্যাদি। কোম্পানিগুলো যখন প্রেস রিলিজের মাধ্যমে টিকার সফলতার খবর প্রকাশ করে, তখন এগুলো বিস্তারিত প্রকাশ করে না। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো জানা না থাকলে পরবর্তী সময়ে টিকা গ্রহণকারীদের মাঝে এই ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা জনগণের মাঝে ভ্রান্ত ভীতি ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ, টিকা সম্পর্কে সাধারণের মাঝে কিছু ভীতি কাজ করে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো আগে থেকে জানা থাকলে পরবর্তী সময়ে সমাজে বা সামাজিক মাধ্যমে টিকাবিরোধী গুজবের সুযোগ কমে যায়। সুতরাং টিকার সফলতা প্রচারের পাশাপাশি এর সংশ্লিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং তা মোকাবিলার উপায়ও জানাতে হবে। ওষুধ বা টিকার ট্রায়ালের রিপোর্ট করতে হলে রিপোর্টারকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা কোন বয়স শ্রেণির, তা বিবেচনায় রাখতে হবে। ইতোমধ্যে দেখা গেছে, তরুণদের মাঝে বয়স্কদের তুলনায় এই রোগের তীব্রতা এবং মৃত্যুহার কম। তাই গবেষণার ফলাফল ২০-৪০ চল্লিশ বছরের সুস্থ মানুষ আর ৬০-৮০ বছরের অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের এক রকম হবে না। বিশ্বের সব স্বীকৃত জার্নালেই প্রকাশিত সব গবেষণাপত্রে গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো জানানো হয়। যেহেতু কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী করোনা ভাইরাসটি একেবারেই নতুন, এর সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য ছিল না, তাই মহামারির কথা বিবেচনা করে প্রথমদিকে অনেক বিখ্যাত জার্নালে যেমন ল্যান্সেট, জেএএমএ, নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন ইত্যাদি শীর্ষ মেডিকেল জার্নালে অনেক লেখাই পিয়ের রিভিউ বা যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনেক নিবন্ধ ছেপেছে; স্বাভাবিক অবস্থায় এদের অনেকেই হয়তো ছাপা হতো না। অনেক ক্ষেত্রেই অনেক দুর্বল লেখাও প্রকাশিত হয়ে গেছে, সংবাদকর্মীরা যখন সংবাদ লিখবেন, তখন এই জিনিসগুলোও বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং পরিবেশন করবেন।

টিকা বা ওষুধের আরসিটির ওপর রিপোর্ট করতে গেলে গবেষণা এবং পরিসংখ্যানের কিছু প্রায়োগিক পরিভাষা, যেমন– গবেষণার বিভিন্ন ধাপ, গবেষণাপত্রে যে টেবিলগুলো আছে তাতে ব্যবহৃত সংকেতগুলো, যেমন– ৯৫% কনিফিডেন্স ইন্টারভেল (CI), পি ভ্যালু (P) ইত্যাদি না জানা থাকলে বিস্তারিত বোঝা যায় না।

তবে বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে করোনার টিকার গবেষণার সর্বশেষ অবস্থা আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে রিপোর্ট করতে গেলে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তির পাশাপাশি বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কোনো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ (যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন) রাজনীতি এবং বৈশ্বিক রাজনীতির বিষয়গুলো (ভারত-চীন-রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র-ইইউ-যুক্তরাজ্য) বিবেচনায় রাখতে হবে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নিউ নরমাল মানে নরমাল নয়

সতর্কতাকে অভ্যাস

বানিয়ে ফেলুন

মিরাজ আহমেদ চৌধুরী

মহামারির পেরিয়ে গেছে সাত মাস। চারদিকে এখন একটি শব্দের খুব চল হয়েছে– নিউ নরমাল। অনেকে এই নব-স্বাভাবিকতাকে আগের মতো স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছেন। রাস্তাঘাটে ভিড় যত বাড়ছে, মাস্ক পরা মানুষের সংখ্যাও যেন ততই কমছে। অফিস-আদালতে শুরুর দিকে নিরাপত্তার যে তোড়জোড় দেখা যাচ্ছিল, তা-ও অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে। এই লেখা লিখার আগে তিনটি গণমাধ্যমে কাজ করা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তাদের প্রতিষ্ঠানেও এখন অনেকটা 'নরমাল' পরিবেশই বিরাজ করছে।

“রাস্তাঘাটে ভিড় যত বাড়ছে, মাস্ক পরা মানুষের সংখ্যাও যেন ততই কমছে। অফিস-আদালতে শুরুর দিকে নিরাপত্তার যে তোড়জোড় দেখা যাচ্ছিল, তা-ও অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে”

নরমাল মানে, তারা অনেকটা আগের মতোই অফিস করছেন। শুরুতে নিয়মিত অফিস স্পেস জীবাণুমুক্ত করা, মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা, সুরক্ষা পোশাক পরে ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়া, এমনকি অফিসের জায়গায় জায়গায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা বা হাত ধোয়ার যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল– সেদিকেও নজর কমতে শুরু করেছে। মহামারির কারণে যত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে রোটা অর্থাৎ পালা করে অফিসে যাওয়া এবং কোথাও কোথাও বাড়ি

থেকে কাজ করার সুযোগ ছাড়া (নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে একেকটি দল একেক সপ্তাহে অফিস করা) নিরাপত্তার বাকি সব উদ্যোগ এবং উৎসাহ– দুটোতেই ভাটা পড়েছে।

আর এই সুযোগে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ নীরবে বেড়েই গেছে। ফেসবুকে 'আমাদের গণমাধ্যম, আমাদের অধিকার' নামে একটি গ্রুপ আছে। তরুণ সাংবাদিকরা এটি চালান এবং তারা নিজেদের দায়িত্বেই সংক্রমণের তথ্য সংগ্রহ করেন। তাদের হিসাবে ২৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ বাংলাদেশে ৯০০ জনের বেশি সাংবাদিক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যার দুই-তৃতীয়াংশই ঢাকায়। আর মারা গেছেন ৩১ জন। এক দেশে এত বেশি সাংবাদিক সংক্রমণের খবর বিশ্বে আর খুব বেশি পাওয়া যায় না।

মনে রাখা দরকার, অন্য অনেক পেশার চেয়ে সাংবাদিকতায় করোনার ঝুঁকি বেশি। কারণ তারা মাঠে কাজ করেন, তারপর অফিসে আসেন, সেখান থেকে বাড়ি ফেরেন। আর এই তিন ধাপে তারা নিজেদের, যাদের নিয়ে রিপোর্ট করছেন তাদের, অফিসের সহকর্মীদের এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করেন।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু রুবেল মাহমুদ, যিনি একটি টিভি চ্যানেলে বার্তা সম্পাদক পর্যায়ে কাজ করছেন, দুই সপ্তাহ আগেও বলছিলেন, 'আমাদের এখানে তো সব প্রায় স্বাভাবিকই হয়ে গেছে।' এই লেখা যখন লিখছি, তখন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। কোভিডের চিকিৎসা নিচ্ছেন। আরেকটি টিভি চ্যানেলের শীর্ষ নির্বাহী জানান, তার অফিসে অন্তত ৫০ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং সবাই বিষয়টিকে ভবিতব্য বলেই যেন মেনে নিয়েছেন। সেই অফিসের একজন অনুজ সাংবাদিক বলেছেন, 'ভাই, আমার তো হয়ে গেছে। আর সমস্যা নাই।'

কিন্তু বাস্তবতা হলো, খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২৪ এপ্রিল প্রকাশিত একটি সায়েন্টিফিক ব্রিফে বলেছে, 'এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা থেকে বলা যাবে, যেই ব্যক্তি একবার কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছেন, তিনি দ্বিতীয় সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত।' বরং আরও বলা হচ্ছে, সেরে ওঠা ব্যক্তিটি ভাইরাস বহনকারী (রক্তে না হলেও) হিসেবে ঠিকই অন্য ব্যক্তিদের সংক্রমিত করতে পারেন।

এটাই আসলে নিউ নরমাল। এই কথার আভিধানিক মানে হলো, একটা বড়ো সংকটের পর পরিস্থিতি আর আগের জায়গায় ফিরে না যাওয়া, অস্বাভাবিকতাই তখন স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যা ভুলে যাচ্ছি, অস্বাভাবিক হয়তো স্বাভাবিক হয়ে গেছে; কিন্তু অস্বাভাবিকতা সামাল দেওয়ার জন্য যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া বা থাকা দরকার, তার গুরুত্ব কমে যায়নি। বরং এই সতর্কতাগুলোকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলতে বলা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে।

ডব্লিউএইচও তাদের সাইটে 'নিউ নরমাল' অবস্থার জন্য যেসব পরামর্শ দিচ্ছে, তার কথা বলা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। নিচের প্রতিটি পরামর্শ একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য:

কোভিড-১৯ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। যতদিন না প্রতিষেধক টিকা আসছে, ততদিন সবাই আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে।

কোভিড-১৯ নিছক সময় পার করছে। অপেক্ষা করছে, কখন আমরা অসতর্ক হই। তাই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন এবং মাস্ক পরার পরও নিয়মিত হাত ধুতে থাকুন।

যদি আপনি অসুস্থ না-ও হন এবং ভেবে থাকেন যে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হননি, তারপরও কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি ও কাশি দিন।

আপনার ঘর বা অফিস যেখানেই হোক না কেন, যেখানে ঘন ঘন মানুষের স্পর্শ লাগে (দরজার হাতল, লিফট, মেঝে ইত্যাদি), সেখানটা প্রথমে ডিটারজেন্ট এবং তারপর ০.১% ব্লিচ দ্রবণ বা অ্যালকোহলভিত্তিক জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করুন।

নিউ নরমালেও তিনটি জায়গা এড়িয়ে চলুন: যেখানে ভিড় আছে, যেখানটা বদ্ধ এবং যেখানে কাছাকাছি বসা ছাড়া উপায় নেই।

অফিসের বাতাস চলাচলের সুযোগ রাখুন, স্টাফদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করুন, বদ্ধঘরে কতজন একসঙ্গে সভা করতে পারবে বেঁধে দিন এবং সবখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা অ্যালকোহলভিত্তিক দ্রবণ রাখুন।

এই পরামর্শগুলো আগেও ছিল, নিউ নরমালেও আছে। আর এখানে তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি যে আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে, সেটি মনে করিয়ে দেওয়া। ঠিক একইভাবে খবর সংগ্রহ করতে গিয়েও আগে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতেন, এখনো একই রকম সতর্কতা দরকার। এখানে জিআইজেএন থেকে কয়েকটি টিপস ফের দেওয়া হলো:

ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় প্রবেশের আগে: যাতায়াতের ক্ষেত্রে গণপরিবহণ (যেমন বাস বা ট্রেন) পরিহার করুন, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে। যদি চড়তে বাধ্য হন, তাহলে নামার পর হাত স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন। হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা সংক্রমণরোধী ব্যবস্থা দুর্বল হলে প্রবেশ না করাই ভালো।

যখন ঘটনাস্থলে: হাসপাতালে যেন হাতে অবশ্যই গ্লাভস এবং পরনে পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট থাকে। হাসপাতাল বা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় সাংবাদিকদেরও এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে সিপিজে।

বের হওয়ার পরে: সংক্রমণ আছে এমন জায়গায় যাওয়ার আগে, সেখানে গিয়ে এবং ফেরার পরে যতবার সম্ভব গরম পানি ও সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে নিন। ধোয়ার আগে মুখে, নাকে বা চোখে হাত লাগাবেন না। এলাকা থেকে বের হওয়ার পর আপনার প্রতিটি সরঞ্জাম (যেমন, ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন) অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল ওয়াইপ দিয়ে ভালো করে মুছে নিন।

অন্যদের প্রতি দায়িত্ব: যখন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন, তখন বাড়তি সতর্ক হোন। তাদের কাছ থেকে সচেতনভাবেই দূরে থাকুন। আপনার শরীরে, কাপড়চোপড়ে অথবা যন্ত্রপাতিতে থাকা ভাইরাস থাকলে যেন তাদের শরীরে না ছড়াতে পারে, সেটি নিশ্চিত করুন। শুধু প্রবীণ নয়, যে কারও ক্ষেত্রেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব: পুরোনো স্বাস্থ্য সমস্যা আছে– এমন রিপোর্টারকে হাসপাতাল বা সংক্রমণ এলাকায় পাঠাবেন না। অন্তঃসত্ত্বা রিপোর্টারদেরও এমন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো থেকে বিরত থাকুন। কোনো রিপোর্টারকে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় পাঠানোর আগে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।

নীতিমালা তৈরি ও মেনে চলা: এই সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করুন এবং তা কীভাবে মেনে চলতে হবে, বারবার সহকর্মীদের বুঝিয়ে বলুন। বার্তাকক্ষের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে এই নীতিমালার মুখপাত্র হতে হবে। বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহিও করতে হবে তাকেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যা সবচেয়ে জরুরি: নিউ নরমালকে আগের মতোই অস্বাভাবিক ও ঝুঁকিপূর্ণ ভাবুন। সতর্ক থাকুন এবং সহকর্মীদেরও সতর্ক থাকতে বলুন। বরং সতর্কতাকেই 'নরমাল' বানিয়ে ফেলুন।

লেখক: হেড অব প্রোগ্রাম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, এমআরডিআই

করোনাকালে তথ্যের উৎস

মঈন মাহমুদ

করোনা মহামারি মোকাবিলায় মরিয়া বিশ্ব। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এর বিরুদ্ধে লড়তে। করোনা প্রতিরোধে প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে মৃত্যুকে বরণও করে নিচ্ছেন অকাতরে। এর সঙ্গে আছেন আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য, আছেন মিডিয়াকর্মী। কোভিড-১৯, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও বিশ্বসম্প্রদায় বিষয়গুলো করোনাকালীন বিশ্বে প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে। সঙ্গে সংবাদপত্রের পাতা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হওয়া বিশেষ করে বাংলাদেশে করোনাকালীন নানা অনিয়মও সমধিক উচ্চারিত বিষয়। করোনার কবলে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতিরও করুণ অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামায় মানুষের জীবনযাত্রাসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। করোনায় মানুষের আক্রান্তের হার, মৃত্যু ও সেরে ওঠা, এর সঙ্গে অর্থনীতির নিম্নগামিতার বিভিন্ন তথ্য উঠে আসছে ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ডে। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্যে উদ্ধৃত হচ্ছে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় বা জনস হপকিনসের কথা। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মিডিয়াগুলো করোনাভাইরাসের প্রতিদিনের আপডেট দিতে গিয়ে জনস

“করোনায় মানুষের আক্রান্তের হার, মৃত্যু ও সেরে ওঠা, এর সঙ্গে অর্থনীতির নিম্নগামিতার বিভিন্ন তথ্য উঠে আসছে ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ডে। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্যে উদ্ধৃত হচ্ছে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় বা জনস হপকিনসের কথা”

হপকিনসের করোনা ট্র্যাকারের কথা উল্লেখ করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশ্ব করোনা পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরতে জনস হপকিনসসহ আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেটা উল্লেখ করছে।

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে অবস্থিত একটি বেসরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জনস হপকিনস, তার নামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ। জনস হপকিনস সেসময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে উইলকৃত কোনো জনহিতকর কাজে সর্বোচ্চ দানকারী হিসেবে হাসপাতাল ও অধিভুক্ত প্রশিক্ষণ কলেজ, এতিমখানা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৭ মিলিয়ন ডলারের (আজকের মুদ্রায় প্রায় ১৪৭.৫ মিলিয়ন ডলার) উইল করে যান। এর মধ্যে ৫ মিলিয়ন ডলার হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাখা হয়, যার অর্ধেকই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। উল্লেখ্য, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ২.৫ মিলিয়নের কম খরচ হয়। ১৮৭৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ড্যানিয়েল কইট গিলম্যান প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও গবেষণাকে একীকরণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষায় বিপ্লব ঘটাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জার্মানির ঐতিহাসিক হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা গ্রহণকারী জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা হয়। বেশ কয়েক দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক বার্ষিক গবেষণা এবং উন্নয়নে ব্যয় করেছে। জনস হপকিনস আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৩৯ জন নোবেল বিজয়ী এবং একজন ফিল্ডস মেডলিস্ট জনস হপকিনসের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছেন।

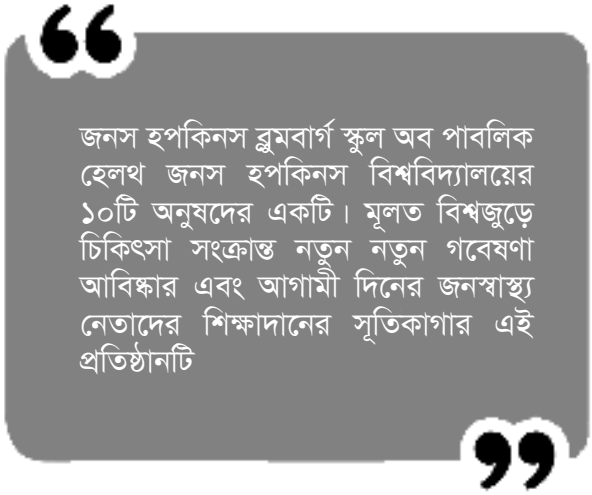

জনস হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল

জনস হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: 'স্বাস্থ্য রক্ষা করা, প্রাণ রক্ষা করা– মিলিয়ন মিলিয়ন।' ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্লুমবার্গ স্কুল জনস্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা, শিক্ষা এবং চর্চা করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষদ, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা বিশ্বজুড়ে নানা মানবিক বিপর্যয় নির্মূলে সহায়তা করেছে। গুটি বসন্তের মূলোৎপাটন, পানীয় জলকে নিরাপদ, শিশুর বেঁচে থাকার উন্নতি, এইচআইভি সংক্রমণ হ্রাস এবং ধূমপানের ভয়াবহতা ও ঝুঁকি নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে।

প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও বিজ্ঞানীরা এখন ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, মানুষের স্বাস্থ্যকর আচরণ বাড়াতে, দীর্ঘস্থায়ী রোগের সংক্রমণ কমাতে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং বার্ধক্যের জিনগত পরিবর্তনগুলো আবিষ্কারে লিপ্ত আছেন। জনস হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি অনুষদের একটি। মূলত বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত নতুন নতুন গবেষণা আবিষ্কার এবং আগামী দিনের জনস্বাস্থ্য নেতাদের শিক্ষাদানের সূতিকাগার এই প্রতিষ্ঠানটি।

সিআরসি

জনস হপকিনস করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) কোভিড-১৯ ডেটার ক্রমাগত আপডেট হওয়া উৎস এবং বিশেষজ্ঞদের পথনির্দেশ। বিশ্বব্যাপী জনসাধারণ, নীতিনির্ধারক এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের মহামারিতে সাড়া দেওয়ার জন্য কোভিড-১৯ এর সর্বোত্তম ডেটা সমষ্টিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে কেস পরীক্ষা, কন্টাক্ট ট্রেসিং এবং ভ্যাকসিন প্রচেষ্টাও।

জনস হপকিনস কোভিড-১৯ মহামারি কোর্স

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় 'কোভিড-১৯ মহামারি: জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষজ্ঞদের অন্তর্জ্ঞান' শিরোনামে একটি মুক্ত, সর্বজনীন উপলভ্য কোর্সের প্রবর্তন করে। কোর্সটি কোভিড-১৯ মহামারি অন্বেষণ করতে সংক্ষিপ্ত মডিউলগুলোর একটি সিরিজ হিসেবে সেট-আপ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের সৃষ্টি এবং মানবসমাজে কীভাবে এর বিস্তৃতি লাভ করে কোর্সটি তার ধারণা দেয়, সামাজিক দূরত্ব পালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে।

করোনাকালে বাংলাদেশের পাশে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য করোনা (কোভিড-১৯) বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৭ মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করা হয়। এর সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম বা সিসিপি। আর অনলাইন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করছে বাংলাদেশের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)। সরকারের ই-লার্নিং কার্যক্রম মুক্তপাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে চিকিৎসকরা বিনামূল্যের এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। ইউএসএআইডি, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) যৌথভাবে এ অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। কোভিড-১৯ বিস্তার প্রতিরোধের প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের চলমান প্রচেষ্টাগুলোয় সম্পূরক সহায়তা হিসেবে ইউএসএআইডি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) মাধ্যমে ৪৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই তহবিল বিগত ২০ বছরে বাংলাদেশে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি স্বাস্থ্য সহায়তার ধারাবাহিকতা।

বাংলাদেশে করোনার প্রকোপ কমে আসছে: জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়

বিদেশ ডেস্ক

প্রকাশিত: ১২:২৮, ৭ জুলাই ২০২০। আপডেট: ১৩:১৯, ৭ জুলাই ২০২০

বিগত পাঁচ দিনের কোভিড-১৯ আক্রান্তের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস ট্র্যাকার বলে, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমে আসতে শুরু করেছে। সোমবার (৬ জুলাই) তাদের ট্র্যাকার অনুযায়ী, বাংলাদেশে সংক্রমণের ১৮তম সপ্তাহে এসে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার দুটিই নিম্নগামী হয়েছে। সংক্রমণের শীর্ষে থাকা বিশ্বের ২০টি দেশের প্রবণতা তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি। সেখানে বাংলাদেশের পাশাপাশি রাশিয়া, চিলি, যুক্তরাজ্য ও মিসরে করোনার প্রকোপ নিম্নমুখী। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পেরু, ইরান, কলম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরাক, পাকিস্তান, বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, ইকুয়েডর এবং আর্জেন্টিনায় সংক্রমণের প্রকোপ উর্ধ্বমুখী।

জনস হপকিনসের তথ্যচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রথম সংক্রমণ ৮ মার্চ ধরা পড়ে। এরপর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,২৭,৩৫৯ জন করোনায় আক্রান্ত এবং ৪,৫১৬ জন মারা গেছেন। তাদের তথ্যচিত্র ট্র্যাক করে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে স্থানীয় সংক্রমণের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭তম সপ্তাহজুড়ে আক্রান্ত ও মৃত্যু সমান্তরালভাবে চূড়ায় ওঠে। ১৮তম সপ্তাহে এসে এ দুটির রেখাচিত্র নিম্নমুখী হতে শুরু করে।

জনস হপকিনস নিডস ইউ (জেএইচনিডসইউ): কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ক্যাম্পেইন

'আমাদের একে অপরকে সুরক্ষিত করতে সহায়তা করুন'– এই মূলমন্ত্র উপজীব্য করে জেএইচনিডসইউ পরিচালিত ক্যাম্পেইনটি কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে চারটি সেরা অনুশীলনের ওপর জোর দেয়; আপনার মুখাবয়ব ঢেকে রাখুন, আপনার হাত ধোন, অন্যদের থেকে আপনার দূরত্ব বজায় রাখুন এবং লক্ষণগুলো রিপোর্ট করুন।

কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি সর্বদা বিবর্তিত হয়। জেএইচনিডসইউ এই পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়। সিসিপির নির্বাহী পরিচালক সুসান কেরেন বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো আমাদের কাছে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যগুলো অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এবং প্রতিরোধমূলক আচরণগুলো চর্চা করতে প্রত্যেককে উৎসাহিত করা, তারা যেখানেই থাকুক না কেন; যা তাদের সুরক্ষা দেবে।'

জনস হপকিনস ড্যাশবোর্ডের পেছনের কথা: মুহূর্তের সিদ্ধান্তটি যেভাবে ভাইরাল হয়েছিল

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে যখন কোভিড-১৯ চীনে প্রথম উদ্ভূত হয়, তখন এনশেং ডং হাম রোগের উদ্‌বেগজনক প্রাদুর্ভাব নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগের মহামারি নিয়ে গবেষণা বিভাগ সিভিল ও সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ডং নতুন রোগের সন্ধান পান। ২২ জানুয়ারি ডং তার গবেষণা উপদেষ্টা, যিনি হপকিনসের সিভিল ও সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) সহকারী পরিচালক জনসম্মুখে প্রচারের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড বিমুক্ত করেন। ড্যাশবোর্ডটি খুব দ্রুত ভাইরাল হয়। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মাধ্যমে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। যেখানে তারা বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত কোভিড-১৯ রোগী, মৃত্যুর ঘটনা এবং সুস্থ হওয়ার মোট সংখ্যা ট্র্যাক করে। ডং যে সাইটটি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করেছিল, তা প্রতিদিন এক বিলিয়নের বেশি হিট লাভ করে।

একটি অনন্য সময়ের সুযোগ

গার্ডনারের গবেষণা দল জনসংখ্যার আচরণ, যেমন– গতিশীলতা এবং অন্যান্য কারণ যা রোগের ঝুঁকি তৈরিতে প্রভাবিত করে নিয়ে কাজ করে থাকে। তারা আগাম জানানোর অভিপ্রায়ে রোগের হটস্পটগুলোর গাণিতিক মডেল তৈরি করে। চীনের উহানে করোনাভাইরাস সার্স-কোভ-২ দ্বারা সৃষ্ট কোভিড-১৯ এর আকস্মিক প্রাদুর্ভাব সঠিক সময়ে উদ্ভূত সংক্রামক ব্যাধির জন্য ডেটা সেট তৈরি তাদের এক অনন্য সুযোগ দিয়েছে। 'অন্য গবেষকরাও উপকৃত হতে পারে সে উপলব্ধি থেকে আরও ব্যাপকভাবে ডেটা সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সে রাতেই একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছি', বলেন গার্ডনার। গোটা বিশ্ব নজর কাড়ে এতে। গার্ডনার বলেন, মানচিত্রটি প্রতিদিন এক বিলিয়নেরও বেশি মিথস্ক্রিয়া গ্রহণ করে, যাতে সাধারণ মানুষ এবং যারা ডেটার অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজেন, তাদের উভয়ই রয়েছেন।

ডংয়ের মতে, ড্যাশবোর্ডটি তৈরি করা সহজ ছিল। কারণ দলটি কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে তাদের মডেলিংয়ের ফলাফলগুলো দেখার জন্য, রেডল্যান্ডস, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত এসরির একটি জিওপ্যাটিয়াল ম্যাপিং সরঞ্জাম, আর্কজিআইএস ব্যবহার করে সম্ভাব্য হামের হটস্পটগুলোর সন্ধান করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাটি কোভিড-১৯ এর জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করা সহজ করে তুলেছে। এনশেং ডং হামের প্রাদুর্ভাব মডেলিং থেকে কোভিড-১৯ এর বিস্তার ট্র্যাক করে নিয়েছিলেন। পৃথিবীজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ইউএস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন এবং ইউরোপীয় সেন্টার ফর ডিজিজ রেজিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন এবং মিডিয়া ও স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য এসেছে।

প্রথমদিকে ডেটা সংগ্রহ এবং ইনপুটের কাজ ম্যানুয়ালি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ডং এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসএসই ও মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিফটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু রোগটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুতই অস্থির হয়ে ওঠে। তাই সমগ্র প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ড্যাশবোর্ডে এখন বেশির ভাগ স্বয়ংক্রিয় ওয়েব স্ক্র্যাপিং এবং সমষ্টি ব্যবহারে ইনপুট দেওয়া হয়, প্রায় তাৎক্ষণিক আপডেট হয়। ড্যাশবোর্ডটি এতই সময়োপযোগী যে, এটি প্রায়ই স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের আগে দেশগুলোর প্রথম কেসের রিপোর্ট করে।

পরিষেবাটি যাতে ক্রাশ না হয়, বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কয়েকবার করে আর্কিটেকচারটি নতুন করে ডিজাইন এবং সার্ভার আপগ্রেড করতে হয়েছিল। জটিল বিষয় ছিল অপ্রত্যাশিত ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। আরও বেশি দেশ করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় অনেক দেশের জায়গার নাম উঠে আসে, যেগুলোর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নয়, দলটি শেষ পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নামকরণ গ্রহণ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি ড্যাশবোর্ড

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ড্যাশবোর্ড এমন একটি প্ল্যাটফরম, যার লক্ষ্য জনস্বাস্থ্যের ঘটনা এবং জরুরি অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অবহিত করা। ড্যাশবোর্ডের ডেটা প্রতি ১৫ মিনিটে রিফ্রেশ করা হয়। তাদের তৈরি ড্যাশবোর্ড ডব্লিউএইচও যেসব ঘটনা ও জরুরি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং তার প্রতিক্রিয়া জানায় এর বিস্তৃত উপস্থাপনা নয়। প্রদর্শিত ইভেন্টগুলো হলো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিমালা (আইএইচআর ২০০৫) দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে রিপোর্ট করা একটি উপসেট। ড্যাশবোর্ডের বিষয়বস্তু কেবল সাধারণ তথ্যের জন্য। ডব্লিউএইচও ড্যাশবোর্ডের বিষয়বস্তুর কার্যকারিতা, পূর্ণতা এবং নির্ভুলতা সম্পর্কে কোনো দাবি, প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দেয় না এবং ডব্লিউএইচও স্বাস্থ্য জরুরি ড্যাশবোর্ডের ব্যবহার অথবা প্রয়োগের ফলে, ত্রুটি এবং এতে থাকা বা বাদ দেওয়ার ফলে ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধতা স্পষ্টত অস্বীকার করে। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের জন্য দায়বদ্ধতা পাঠকের ওপর। ডব্লিউএইচও কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পোস্ট করা তথ্যাদির আপডেট এবং পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা ভুলের জন্য কোনো দায় স্বীকার করে না।

বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কয়েকবার করে আর্কিটেকচারটি নতুন করে ডিজাইন এবং সার্ভার আপগ্রেড করতে হয়েছিল। জটিল বিষয় ছিল অপ্রত্যাশিত ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

মহামারিকালে সাংবাদিকতা: কোভিড-১৯ এখন ও ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের জন্য একটি স্বপরিচালিত কোর্স

মহামারিকালীন সাংবাদিকদের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো এবং ইউএনডিপির সহযোগিতায় টেক্সাস-অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার নাইট সেন্টার ফর জার্নালিজম কোর্সটি তৈরি করেছে। কোর্সটি ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ ভাষায় দেওয়া এবং স্বপরিচালিত। এটি সংবাদ পরিবেশনে নিজের সক্ষমতা এবং মহামারি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে আগ্রহী সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত। কোর্সটি মূলত ২০২০ সালের মে মাসে চার সপ্তাহের ভার্চুয়াল মেসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স (এমওওসি) হিসেবে উপস্থাপিত হয়। সিএনএনের সাবেক রিপোর্টার মেরিন ম্যাকেন্না এটি তৈরি এবং উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে ভিডিও ক্লাস, পাঠ, অনুশীলন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেকটিভ মানচিত্র

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ইন্টারেকটিভ মানচিত্রের ৫ সেপ্টেম্বরের নতুন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, করোনায় বিশ্বজুড়ে কমপক্ষে ৭ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন। এর মধ্যে শুধু মেক্সিকোয় মারা গেছেন কমপক্ষে ১,৩০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী, যা যে কোনো দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এরপর যুক্তরাষ্ট্র (১,০৭৭) ও ব্রাজিল (৬৩৪) বেশিসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুর রেকর্ড করেছে, যেখানে করোনার সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হারও বেশি। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা (২৪০) ও ভারতে (৫৭৩) উদ্‌বেগজনক সংখ্যা রয়েছে, সেখানে সাম্প্রতিক মাসগুলোয় সংক্রমণের হার বেড়েছে। অন্য দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৬৪৯, রাশিয়ায় ৬৩১, ইতালিতে ১৮৮, পেরুতে ১৮৩, ইন্দোনেশিয়ায় ১৮১, ইরানে ১৬৪ এবং মিসরে ১৫৯ জন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিয়মিত একাধিক উৎস থেকে স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করে থাকে। উৎসগুলো হলো– স্মারকপাতা, সরকারি পরিসংখ্যান, জাতীয় চিকিৎসা সমিতি প্রণীত তালিকা এবং বিশ্বজুড়ে মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত তালিকা। সব উৎস এবং তথ্য অনলাইন ইন্টারেকটিভ মানচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

সংস্থাটির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচারবিষয়ক প্রধান স্টিভ ককবার্ন বলেন, 'অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সাত হাজারেরও বেশি লোক মারা যাওয়ার বিষয়টি এক বিস্ময়কর মাত্রার সংকট। প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীরই

কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের এত মৃত্যু বড়োই লজ্জার। আমরা সব সরকারকে স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনরক্ষার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের অবশ্যই স্বাস্থ্যকর্মীদের কথা শোনা উচিত; যারা তাদের কাজের অবস্থার বিষয়ে কথা বলে এবং তাদের সংগঠিত করার অধিকারকে সম্মান করে।'

ওয়ার্ল্ডওমিটার

ওয়ার্ল্ডওমিটার বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদির প্রোভাইডার। ওয়ার্ল্ডওমিটার বিশ্বজুড়ে এর ব্যবহারকারীদের কাছে একটি চিন্তাভাবনাপ্রসূত এবং প্রাসঙ্গিক সময় ফরম্যাটে বিশ্ব পরিসংখ্যান তুলে ধরার লক্ষ্যে ডেভেলপারস, গবেষক এবং স্বেচ্ছাসেবীদের একটি আন্তর্জাতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল মিডিয়া সংস্থা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিজ অর্থায়িত।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের ডেটা যুক্তরাজ্য সরকার, জনস হপকিনস সিএসএসই, থাইল্যান্ড সরকার, পাকিস্তান সরকার, শ্রীলঙ্কা সরকার, ভিয়েতনাম সরকার, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস, বিজনেস ইনসাইডার, বিবিসি এবং বিশ্বস্ত অনেকে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ৫,০০০টিরও বেশি অফিশিয়াল উৎসের ক্রমবর্ধমান তালিকা থেকে ডেটা যাচাইপূর্বক এন্ট্রি দিয়ে থাকে এবং সেগুলো প্রতি মিনিটে একাধিকবার আপডেট করা হয়। এটি বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক এবং গবেষকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গণ্য করে।

ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা

ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা এবং এসডিজি-ট্র্যাকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সহযোগী প্রচেষ্টা, যারা ওয়েবসাইট আধেয়ের বৈজ্ঞানিক সম্পাদক। ওয়েবসাইট ও ডেটা টুলস প্রকাশ ও পরিচালনাকারী অলাভজনক সংস্থা গ্লোবাল চেঞ্জ ডেটা ল্যাব তাদের কাজকে সহজ করছে।

সংস্থাটি মহামারি সম্পর্কে লিখতে চায়– এমন প্রত্যেকের জন্য নিখরচায় ইন্টারেকটিভ ভিজুয়ালাইজেশন সরবরাহ করে। এগুলো মানচিত্র এবং চার্ট, যা ব্যবহারকারীদের ডেটা অন্বেষণ করতে দেয়। যে কেউ নিজস্ব চার্টগুলো কাস্টমাইজ করতে পারেন এবং যে কোনো দেশকে তুলনা করতে পারেন। বিশ্বজুড়ে উচ্চমানের আউটলেটগুলোর সাংবাদিকরা কোভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ওয়ার্ল্ডওমিটারের ডেটা ব্যবহার করে। সেজন্য এটা নিশ্চিত করে নেওয়া হয়, একবার কারও নিবন্ধে কোনো চার্ট এম্বেড করলে তা অদৃশ্য হয়ে না যায়।

- ভক্স ওয়ার্ল্ডওমিটারের চার্ট ব্যবহার করে সারাদেশে মৃত্যুর হারের তুলনা করতে।
- ওয়াশিংটন পোস্ট সারাদেশে টেস্টের হারের তুলনা করতে চার্টগুলো ব্যবহার করে।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ওয়ার্ল্ডওমিটারের চার্ট ব্যবহার করে কোন দেশগুলো করোনাকালে অর্থনীতির 'বক্ররেখাকে সমতল করতে' সফল হচ্ছে, তা তুলনা করতে।

মহামারির সঙ্গে লড়াই সম্ভব

মহামারির আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনাই এখন সবার দৃষ্টি ও কাম্য। মহামারির বিরুদ্ধে কি অগ্রগতি সম্ভব? কোভিড-১৯ মহামারি কীভাবে ছড়াচ্ছে, মহামারি কীভাবে প্রভাব ফেলছে, মহামারির বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে অগ্রগতি করতে পারি এবং আক্রান্ত দেশগুলো যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, সেগুলো সফল কি না?

এত জিজ্ঞাসা আর সম্ভাবনার বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠে এ সংক্রান্ত নানা তথ্যবিশ্লেষণ থেকে, যে কাজটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের ড্যাশবোর্ড, ট্র্যাকারে করোনা সংক্রান্ত নানা তথ্য সন্নিবেশের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। সাংবাদিক ও মিডিয়া আউটলেটগুলো সেগুলো বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করছে, যা নীতিনির্ধারক, গবেষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, প্রশাসক সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে লড়ে যেতে সাহায্য করছে। তাই বলতে দ্বিধা নেই– মহামারির সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব।

লেখক: সাংবাদিক, গবেষক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনাকালে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র

মামুন অর রশিদ

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে নতুন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছে পৃথিবী নামক এই গ্রহবাসীর। অদৃশ্যমান এই জীবাণু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও পৃথিবীকে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। জানা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম দেখা মেলে এই ভাইরাসের। বর্তমানে বিশ্বের ২১৫টিরও বেশি দেশে ছড়িয়েছে এ ভাইরাস। এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৩৫ লাখ ৬০ হাজার ৮৭৭ জনে দাঁড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জন। বাংলাদেশে আক্রান্ত ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৪৭৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ২৫১ জন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০, ওয়ার্ল্ডওমিটার)।

> এই মহামারিকালে বিশ্বের মানুষ যখন অবরুদ্ধ, তখন ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধা ডাক্তার, নার্স, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন

এই মহামারিকালে বিশ্বের মানুষ যখন অবরুদ্ধ, তখন ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধা ডাক্তার, নার্স, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। চিকিৎসাসেবার মতোই জরুরি হয়ে উঠেছে তথ্যসেবা। তথ্যের মোড়কে গুজব এ সময়ে বিপজ্জনক। আবার তথ্য নিয়ে লুকোছাপা খেলাও হতে পারে ভয়ংকর আত্মঘাতী।

ছবি: সংগৃহীত

স্পর্শকাতর এ সময়ে যাচাইকৃত, নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের জন্য প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গণমাধ্যমের এখন কঠিন বিপদ। বিশেষ করে সংবাদপত্র একেবারে হুমকির মুখে পড়ছে। করোনোর কারণে পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বিশ্বের অনেক নামকরা পত্রিকাও বাধ্য হচ্ছে তাদের সার্কুলেশন কমিয়ে দিতে। এমনকি ছাপা সংস্করণ বন্ধ করে শুধু অনলাইন সংস্করণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোম্পানিগুলো কারখানা বন্ধ থাকায় টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন কমিয়ে দিয়েছে। ফলে টেলিভিশনগুলো নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। বলা যায়, করোনা মহামারি গণমাধ্যম শিল্পকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

করোনাকালে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের চিত্র

করোনাভাইরাস তথা কোভিড-১৯কালে শতাব্দীর সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো। ছাপা সংবাদপত্রের মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায়– এই গুজবে পত্রিকার সার্কুলেশনে বড়ো ধরনের ধস নেমেছে। অথচ সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভাইরাস যে ছড়ায়, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অন্যদিকে টেলিভিশনেও লেগেছে ধাক্কা। কারণ, এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে বিজ্ঞাপন কমে গেছে। ২৬ মার্চ বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত খবরের শিরোনাম– 'করোনাভাইরাস: ছাপানো পত্রিকা বিক্রিতে বিরাট ধস, ঢাকাতেই এখন সার্কুলেশন কমেছে অর্ধেক'। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, মার্চের শেষ নাগাদ প্রথম আলোর মুদ্রণ কমে যায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনেক দিনের পুরোনো জাতীয় পত্রিকা তাদের ছাপা সংস্করণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, শুধু অনলাইন সংস্করণ চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় দৈনিক ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক পুরোনো পত্রিকাও শামিল হয়েছে এই বন্ধের তালিকায়। আর বন্ধের তালিকায় রয়েছে জাতীয় দৈনিকের মধ্যে অন্যতম পুরোনো ইংরেজি পত্রিকা 'দি ইনডিপেনডেন্ট', ট্যাবলয়েড খ্যাত 'দৈনিক মানবজমিন', 'আলোকিত বাংলাদেশ' 'দৈনিক জনতা', 'বাংলাদেশের খবর', 'দৈনিক দিনকাল'সহ অনেক নাম।

আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে সিলেট বিভাগের অবস্থা বেশি খারাপ। বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের ২৬ মার্চের একটি সংবাদ ছিল, 'প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের আতঙ্কে সিলেটের সব স্থানীয় দৈনিকের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।' এই তালিকায় রয়েছে সিলেটের প্রাচীনতম দৈনিক যুগভেরী ও দৈনিক একাত্তরের কথা থেকে শুরু করে সিলেটের ডাক, জালালাবাদ, দৈনিক সিলেটবাণী, দৈনিক সবুজ সিলেট, দৈনিক শুভ প্রতিদিন, দৈনিক সিলেট মিরর, দৈনিক জৈন্তাবার্তা ও সিলেটের দিনকাল। করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগীয় শহর ও সংশ্লিষ্ট জেলায় ৮৬টি পত্রিকা

ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা, বন্ধ ২৫৪টি

করোনাকালে সংবাদপত্র

ঢাকায় ৩২, চট্টগ্রামে ৩, সিলেটে ২, ময়মনসিংহে ১১, রংপুরে ৪, খুলনায় ৪, রাজশাহীতে ৮ ও বরিশালে ২২টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

শরিফুজ্জামান, ঢাকা

[illegible]

করোনার আগে ও পরে

ডিএফপিতে প্রতিদিন জমা হতো ৩৫০ পত্রিকা, এখন হচ্ছে ১৩৪।

ঢাকায় হকাররা পেতেন ৫৫টি পত্রিকা, এখন পাচ্ছেন ৩২টি।

ঢাকার বাইরে সাত বিভাগে ১৩৮টি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা, এখন হচ্ছে ৫৪টি।

বরিশালে সর্বোচ্চ ২২টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সর্বনিম্ন সিলেটে ২টি।

ছবি: সংগৃহীত

প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) হিসাবে, এই আটটি বিভাগীয় শহর ও সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রকাশিত হওয়ার কথা ৩৪০টি পত্রিকা। সেই হিসাবে ২৫৪টি পত্রিকা বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থা শুধু সিলেটে নয়, ছড়িয়েছে দেশের অন্যান্য বিভাগেও।

পত্রিকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ানোর ভয়ে গ্রাহকরা যেন পত্রিকা রাখা বন্ধ না করেন, এ বিষয়ে পাঠকদের বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের সাংবাদপত্রেও এরকম বিজ্ঞাপন দিয়েও পাঠকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়। নিজেদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারাও অভয় দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। পত্রিকা ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলে পাঠকদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি যারা পত্রিকা বিলি করে, সেই হকারদের সুরক্ষার জন্য গ্লাভস ও মাস্ক দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে 'দি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' হচ্ছে গণমাধ্যমের ভালোমন্দ দেখভালের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। 'ছাপা কাগজের মাধ্যমে করোনা ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি' বলে নিজেদের ওয়েবসাইটে একটি পোস্ট দিয়ে পাঠকদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

করোনাকালে গণমাধ্যমের বৈশ্বিক চিত্র

করোনাভাইরাসের এই ভয়াল থাবা শুধু বাংলাদেশের পত্রিকায়ই নয়, বিশ্বের ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব দেশের পত্রিকায়ই হানা দিয়েছে। সব দেশেই মুদ্রিত পত্রিকার সার্কুলেশন পড়ে গেছে, গ্রাহক কমে গেছে, বিজ্ঞাপন কমে গেছে। সংক্রমণের ভীতিতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অনেক সংবাদপত্র ছাপা বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের বিক্রি যেন হু-হু করে কমছে। মুম্বাইয়ে বন্ধ হয়ে গেছে বেশকিছু সংবাদপত্রের মুদ্রিত সংস্করণ। এ অবস্থা বিরাজ করছে পশ্চিমবঙ্গেও। কলকাতার নামকরা পত্রিকা 'বর্তমান'-এর মুদ্রিত সংস্করণ বন্ধ রাখা হয়েছে, যেটি ছিল কলকাতার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পঠিত কাগজ। এছাড়া বন্ধ রয়েছে 'আজকাল' ও 'দৈনিক গণশক্তি' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকাও' তাদের দৈনিক মুদ্রণ সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। (২৬ মার্চ ২০২০, বিবিসি বাংলা)

অন্যদিকে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাদের ইংরেজি ভাষার মুদ্রণ বন্ধ রেখেছে (১৫ এপ্রিল ২০২০, নিক্কি এশিয়ান রিভিউ)। করোনা মহামারির কারণে অস্ট্রেলিয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে ছোটোবড়ো ৬০টি কাগজ। বন্ধ হওয়া কাগজগুলোর নিয়ন্ত্রণে ছিল মিডিয়া মোগল রুপার্ট মার্ডকের প্রতিষ্ঠান নিউজ করপোরেশন। ইইউ অবজারভারের তথ্যমতে, আমেরিকায়ও অনেক নিউজ ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপনী আয় প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে এবং কিছু পত্রিকা টিকে থাকতে মার্কিন সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

করোনাকালে গণমাধ্যম যখন নিজেই গণমাধ্যমের শিরোনাম

* **করোনাভাইরাস: ছাপানো পত্রিকা বিক্রিতে বিরাট ধস, ঢাকাতেই এখন সার্কুলেশন কমেছে অর্ধেক** —২৬ মার্চ ২০২০, বিবিসি বাংলা
* **সাংবাদিকের করোনাকাল দেখা** —৩১ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো
* **সরকারি বিজ্ঞাপনের বিল সময়মতো পরিশোধ করুন** —৪ এপ্রিল ২০২০, কালের কণ্ঠ
* **করোনাকালে সাংবাদিকতার বিপদ ও রূপান্তর** —১৭ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো
* **করোনাকালে গণমাধ্যম: অস্তিত্বের সংকট ও জাতিকে সচেতন করার লড়াই** —২৮ এপ্রিল ২০২০, ভোরের কাগজ
* **করোনা মহামারিতে কি পত্রিকাও মরছে** —২৮ এপ্রিল ২০২০, দেশ রূপান্তর

ছবি: সংগৃহীত

* **করোনাকাল, সাংবাদিকতা ও উল্টো আয়না** —৪ মে, ২০২০, সংবাদ সারাবেলা
* **করোনাযুদ্ধঃ কতটা প্রস্তুত সংবাদমাধ্যম** —২১ মে, ২০২০, বাংলাদেশ প্রতিদিন
* **করোনা সংকট যেভাবে বদলে দিল সাংবাদিকতার দৃশ্যপট** —২৪ মে ২০২০, চ্যানেল আই অনলাইন
* **মিডিয়ার সামনে অশনিসংকেত** —২১ জুন ২০২০, বাংলাদেশ প্রতিদিন
* **সাংবাদিকরা করোনাকালে কতটা নিরাপদ?** —১১ জুন ২০২০, আন্দোলনের বাজার
* **করোনাকালে সংবাদপত্র ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা, বন্ধ ২৫৪টি** —৩ জুলাই ২০২০, প্রথম আলো
* **করোনাকালে মহাসংকটে মফস্বল সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র** —৯ জুলাই ২০২০, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

করোনাকালে রিপোর্টিংয়ের কিছু দিকনির্দেশনা

বর্তমানের এই মহামারির পরিস্থিতি বিশ্বকে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। যুদ্ধকালীন নানা সংকট এর আগেও মোকাবিলা করেছে বিশ্ব; কিন্তু করোনাভাইরাসের এই দুর্যোগ একবারে আলাদা সংকটের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই আশু পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমকর্মীরা অন্যান্য ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধার মতো সামনে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। তবে এই গণমাধ্যমকর্মীদেরও কিছু গাইডলাইন মেনে চলা জরুরি। নিম্নে কিছু পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

আসল চিত্র জানা: বিশেষ করে সংকটময় পরিস্থিতি বা যুদ্ধের সময় যেমন একজন সাংবাদিককে যুদ্ধের বা সংকট অবস্থার পূর্বাপর পরিস্থিতি জেনেবুঝে তারপর রিপোর্ট করতে হয়, তেমনই এই মহামারি করোনার পরিস্থিতিতে সাংবাদিককে গোটা বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। ভাসা ভাসা কথা বা কিছু শোনা তথ্য দিয়েই প্রতিবেদন তৈরি করা যথোচিত হবে না। আগে পুরো অবস্থার চিত্রটিই একজন সাংবাদিকের নখদর্পণে নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

অফিসে না এসে বাসা থেকে কাজ করার সুযোগ: এই সংকটময় পরিস্থিতে অফিসে না এসে বাসা থেকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে অফিসে কর্মীসংখ্যা কমে যাবে। এছাড়া অনলাইনে কর্মসম্পাদন করতে পারেন এমন কর্মী, যেমন– সম্পাদকীয় লেখক, বিভিন্ন পাতার দায়িত্ব পালনকারী লেখক ও সহসম্পাদক, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, বয়স্ক কর্মীদের সাময়িক সময়ের জন্য অফিসে আসা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাসায় থেকে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

ছবি ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা: সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে যে কোনো ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমনকি মাস্ক পরিহিত ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। যুক্তরাজ্যের নামি একটি সংবাদপত্র করোনা সংক্রমণের শুরুতে উহানের একটি মাস্ক পরা ছবি ছেপে তুমুল সমালোচনার পড়ে। কারণ তাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না যে ছবিটি উহানের।

হেডলাইন নিয়ে ভাবনা: এমনভাবে হেডলাইন লেখা যাবে না যা বিভ্রান্তি ছড়ায়। খুবই সতর্কভাবে মূল বিষয়টির সার-নির্যাস শিরোনামে তুলে আনতে হবে। শুধু ইন্ট্রো বা সূচনা পড়েই নয়, সহসম্পাদক যিনি শিরোনাম দেবেন তাকে প্রয়োজনে পুরো কপিটিই পড়তে হবে। এখানে কোনো ধরনের দায়সারা ভাব দেখানোর সুযোগ নেই।

সংখ্যার হিসাব নিয়ে সতর্কতা: যে কোনো সংখ্যা বা নম্বর যাচাই করতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকা বা ব্রেকিং নিউজ দেওয়ার উত্তেজনার লাগাম টানতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে। শুধু খবরের জন্যই খবর না করা, খবরের সামনে-পেছনে যে মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্রটি আছে, তা-ও মাথায় রাখা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নম্বর বা সংখ্যা সাংবাদিকদের উত্তেজিত করে। এই ফাঁদে কখনোই পা দেওয়া যাবে না।

সোর্সের সংখ্যা বাড়ানো: যুদ্ধের সময় ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গুজব ছড়ায়। সেজন্য তথ্য যাচাইয়ে সোর্সের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এই তথ্যের উৎসের মধ্যে পদস্থ বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন থাকতে পারেন, তেমনি মধ্যম, নিম্নপর্যায়ের বা কম গুরুত্বপূর্ণ অনেকে ব্যক্তিও থাকতে পারেন। সবার কাছে সব তথ্য হাতে নিয়ে সাংবাদিকতার যুক্তিভিত্তিক মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। কোনো তথ্যই এড়িয়ে যাওয়া নয় বা কাউকেই অবহেলা করা নয়।

গণমাধ্যমে সংকট: করোনাভাইরাসের এ সংকটে সাংবাদিকদের সংকট আসলে গোটা গণমাধ্যমেরও। একটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজে প্রস্তুতি না নিলে শুধু সাংবাদিকরা রক্ষা পাবেন না। বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সতর্ক বা প্রস্তুত, বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি। বিশ্বের বড়ো কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে করোনার আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর তারা নিজস্ব উদ্যোগেই কতগুলো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলো যেহেতু লকডাউন করা যাবে না, সেজন্য আমাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত এ বিষয়ে ভাবতেই হবে। উদ্যোগী হতে হবে নিউজরুমকেই। কারণ যে কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নিউজরুমই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

কোনো বিশেষ মন্তব্য নয়: কোনো তথ্য হাতের কাছে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তিতে কোনো উপসংহারে যাওয়া নয় কিংবা কোনো মন্তব্য নয়। বিদেশ বা ইতালি থেকে এলেই তিনি আক্রান্ত– এমন বলা যাবে না। এখন মাস্ক পরেননি বলে আক্রান্ত হয়েছেন বলে এই উপসংহারে পৌঁছা যাবে না যে মাস্ক না পরলেই কেউ আক্রান্ত হন। আক্রান্ত নারী বা বৃদ্ধ বা শিশুর সংখ্যা বেশি হলেই এমন কোনো সহজ সমীকরণে পৌঁছা যাবে না যে বৃদ্ধ, নারী বা শিশুরাই করোনার মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান বা মন্তব্য টানা যাবে, নিজস্ব কোনো মন্তব্য নয়।

বিশেষজ্ঞ ছাড়া ঢালাও বিশ্লেষণ বা মন্তব্য নয়: যেহেতু করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এজন্য এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে– করোনাবিষয়ক সংবাদগুলো 'বিশেষ সংবাদ'। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ মত ছাড়া কোনো ধরনের ধারণাপ্রসূত মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'তিনি বলেন'– এই জাতীয় শব্দ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জনমনের সাধারণ প্রশ্নগুলোর যৌক্তিকভাবে তুলে আনা। একজন সাংবাদিকের মুনশিয়ানা হলো বিশেষজ্ঞজনরা নানা তথ্য নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টি বের করে আনা। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বিশেষ তথ্য নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেই মূল তথ্যগুলো তুলে আনতে হবে।

প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাস নয়: সাংবাদিকতা আধুনিক পেশা, মূর্খদের নয়। করোনা নিয়ে প্রচলিত কোনো মিথকেই বিশ্বাস করা যাবে না। যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক ধারণায় বিশ্বাস সাংবাদিকতা নয়। যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর বিশেষজ্ঞ মত পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ সে বিষয়ে কিছুই লেখা বা বলা সাংবাদিকের কাজ নয়। 'অনেকে বলেন' বা 'অনেকে বিশ্বাস করেন' এর কোনোটাই সাংবাদিকতার গ্রহণযোগ্য ভাষা নয়।

সংকটময় পরিস্থিতিতে অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন: অদৃশ্যমান করোনাভাইরাস নিয়ে বর্তমানে বিশ্বে যা ঘটছে এমন পরিস্থিতি অন্তত

কয়েক দশক দেখা যায়নি। অর্থনীতির একটি বেশ পরিচিত কথা হলো– 'কখনো কখনো সংকট সুযোগ তৈরি করে'। আর এটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাভার করেছেন যে যুদ্ধসাংবাদিকরা, তারা আজ কেউ নেই। অনেকে আঞ্চলিক যুদ্ধ কাভার করেছেন। করোনা নিয়ে আজকের বিশ্ব সংকট একজন সাংবাদিকের সামনে সেই সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সুতরাং আজ যে সাংবাদিক এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করছেন, তাদের সামনে এক বিশাল সুযোগ এসেছে সংকটকালে সাংবাদিকতা করার বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার। পেশাজীবীদের সামনে এমন সুযোগ সব সময় আসে না। বিশ্বস্ততার সঙ্গে মাঠে থেকে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করে কেউ কেউ হয়ে উঠতে পারেন আগামী দিনের অনুসরণীয় সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ। ভালো সাংবাদিকতার জন্য তা সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে।

সব সময় প্রস্তুতি: এই রকম একটা বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার জন্য একজন সাংবাদিককে অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে সর্বব্যাপী। শুধু নোট, প্যাড, কলম আর ল্যাপটপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াই প্রস্তুতি নয়। এ প্রস্তুতি হলো মানসিক, শারীরিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি; প্রয়োজনে কাজে লেগে যাওয়া। যুদ্ধকালীন সাংবাদিকদের যেমন সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়, এটা হলো সেই প্রস্তুতি।

টকশোতে প্রযুক্তির ব্যবহার: বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে টেলিভিশনগুলোর টকশোয় অতিথিদের বাড়ি বা অফিসে প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযোগ করা যেতে পারে, এমনকি অতিথির সংখ্যাও কম রাখা যেতে পারে। বাইরের অনেক দেশ টেলিভিশন স্কাইপে ব্যবহার করে টকশো অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে।

সব সময়ই একরকম নয়: মনে রাখতে হবে, সব সময় একরকম নয়। এ চিন্তা মাথায় রেখে স্বল্প কর্মী নিয়ে পুরো পরিকল্পনা সাজানো যেতে পারে।

গণমাধ্যমগুলোর বাড়তি সতর্কতা: করোনাভাইরাসের এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম অফিসগুলোর বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। অফিসগুলোয় অতিথি আগমন যেমন শূন্যে নামিয়ে আনা জরুরি, তেমনই বিশেষ করে মাঠপর্যায়ের কর্মী যারা হাসপাতাল, কোয়ারেন্টিন জোন কাভার করবেন তাদের পোশাক ও পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া। অফিসগুলোর সতর্ক হতে হবে অফিস সহকারী, ড্রাইভার, নিরাপত্তকর্মীসহ সব সাপোর্ট স্টাফের ব্যাপারেও। যে কেউ যে কোনো পর্যায়ে এ ভাইরাস বহন করতে পারেন। কাজেই গাড়ি, সব ধরনের যন্ত্রপাতি এমনকি ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসটিও যাতে ঝুঁকিপূর্ণ না থাকে, এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাকার বাইরে যে সংবাদকর্মীরা কাজ করেন, তারাও যাতে ঝুঁকিমুক্ত থাকেন। এজন্য সতর্ক নির্দেশনা পাঠানোও গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা তাদের বিশেষ সমাগমস্থলে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ তো বটেই, নিজেদের সদস্যদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার কাজটি করতে পারেন এখনই। বয়স্ক ও অসুস্থদের বাড়িতে থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন। সাংবাদিক সংগঠনগুলো সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনবিমার জন্য মালিকপক্ষ ও সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারেন।

গণমাধ্যমকর্মীরা যখন পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন, তখন তাকে এ রকম একটি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অবশ্যই সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কারণ যে কোনো অপেশাদারি আচরণ গোটা দেশ বা সমাজকেই বিপদগ্রস্ত করতে পারে। উৎকৃষ্ট সাংবাদিকতাই ভালো সাংবাদিকের রক্ষাকবচ। এ যুদ্ধে তাই সংবাদকর্মীদের উৎকৃষ্ট সাংবাদিকতাই দেখাতে হবে। বর্তমান 'বিশ্বযুদ্ধ' পরিস্থিতি সামনে রেখে কিছু বিশেষ বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর রাখতে সাংবাদিকদের পরামর্শ দিচ্ছেন অভিজ্ঞজনরা। এ কথা তো সত্যিই– করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এখন আর শুধু স্বাস্থ্য বিট নয়; বিষয়টি এখন অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, খেলা, পর্যটন, বিনোদন এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কাজেই এ পরামর্শ কোনো বিশেষ বিটের সাংবাদিকের জন্য নয়, বরং এখন যারা সাংবাদিকতা করছেন, কি রিপোর্টিংয়ে, কি সম্পাদনায়– সবার জন্যই প্রযোজ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, 'মহামারি ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি সঠিক তথ্যপ্রবাহ। তাই সমাজের স্বার্থে, গণমানুষের স্বার্থেই গণমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বাধীন গণমাধ্যম ও সংবেদনশীল সরকার থাকলে মহামারি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। (২১ জুন ২০২০, বাংলাদেশ প্রতিদিন)

তথ্যসূত্র

* করোনাকালে সংবাদপত্র: ঢাকাসহ ৮ বিভাগে চালু ৮৬ পত্রিকা, বন্ধ ২৫৪টি; শরিফজ্জামান, ৩ জুলাই ২০২০, প্রথম আলো (https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666591/)
* করোনাভাইরাস: ছাপানো পত্রিকা বিক্রিতে বিরাট ধস, ঢাকাতেই এখন সার্কুলেশন কমেছে অর্ধেক, রায়হান মাসুদ, ২৬ মার্চ ২০২০, বিবিসি বাংলা (https://www.bbc.com/bengali/news-52046167)
* সাংবাদিকের করোনাকাল দেখা, কুররাতুল আইন তাহমিনা, ৩১ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো (https://www.prothomalo.com/opinion/article/1647988/)
* সরকারি বিজ্ঞাপনের বিল সময়মতো পরিশোধ করুন–মতামত, ৪ এপ্রিল ২০২০, কালের কণ্ঠ (https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/04/19/900732)
* করোনা মহামারিতে কি পত্রিকাও মরছে, আফরোজা সোমা, দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০২০ (https://www.deshrupantor.com/home/printnews/214260/2020-04-28)
* করোনাযুদ্ধ: কতটা প্রস্তুত সংবাদমাধ্যম, মনজুরুল আহসান বুলবুল, ২১ মে ২০২০, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (https://www.bd-pratidin.com/editorial/2020/03/21/512728)
* মিডিয়ার সামনে অশনিসংকেত–মতামত, ২১ জুন ২০২০, বাংলাদেশে প্রতিদিন (https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/06/21/540910)
* করোনাকালে মহাসংকটে মফস্বল সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র–সম্পাদকীয়, ৯ জুলাই ২০২০, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (https://www.jagonews24.com/opinion/article/596149)
* করোনাকালে সাংবাদিকতার বিপদ ও রূপান্তর, কামাল আহমেদ, ১৭ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো (https://www.prothomalo.com/opinion/article/1651348/)
* করোনাকালে গণমাধ্যম: অস্তিত্বের সংকট ও জাতিকে সচেতন করার লড়াই–মুক্তচিন্তা, ২৮ এপ্রিল ২০২০, দৈনিক ভোরের কাগজ (http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2020/04/28/305161.php)
* সাংবাদিকরা করোনাকালে কতটা নিরাপদ? ১১ জুন ২০২০, আন্দোলনের বাজার (https://www.dailyandolonerbazar.com)
* করোনাকাল, সাংবাদিকতা ও উল্টো আয়না, আহমেদ মুশফিকা নাজনীন, ৪ মে ২০২০, সংবাদ সারাবেলা (https://www.sangbadsarabela.com/opinion/5188/)
* করোনা সংকট যেভাবে বদলে দিল সাংবাদিকতার দৃশ্যপট, রাজীব নন্দী, ২৪ মে ২০২০, চ্যানেল আই অনলাইন (https://www.channelionline.com/)
* https://www.worldometers.info/coronavirus/

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতার নতুন সংকট কোভিড-১৯

শ্যামল দত্ত

সাংবাদিকতা সব সময়ই একধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশা। সাংবাদিকতার পথ আগেও যেমন কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তেমনই এখনো নয়। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত নানা সংকটের মধ্য দিয়ে সংবাদকর্মীরা এগিয়ে চলেছেন। তারা ধরেই নিয়েছেন, এভাবে প্রতিনিয়ত তাদেরকে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যেতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সাংবাদিকরা সব সময় সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অবশ্য আগের তুলনায় এখনকার সংকটের ধরন পালটেছে। তবে এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাংবাদিকতায় এখনকার সংকট বা সমস্যা আগের তুলনায় আরও প্রকট হয়েছে। সময় যত এগিয়ে চলেছে, সাংবাদিকতার সংকটেও সৃষ্টি হয়েছে নতুন মাত্রার জটিলতা। সূচনাপর্বে সাংবাদিকতার আলাদা একটি ধরন চালু ছিল, যা আজকের দিনের পেশাগত সাংবাদিকতা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন সাংবাদিকতার এই বিষয়টি ছিল শাসকের অধীন। সম্রাট অশোক পাথর ও স্তম্ভে খোদিত তার আদেশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং বাইরে প্রজ্ঞাপন জারি করতেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে

“সূচনাপর্বে সাংবাদিকতার আলাদা একটি ধরন চালু ছিল, যা আজকের দিনের পেশাগত সাংবাদিকতা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম”

গুপ্তচরও নিয়োগ করতেন। গুপ্তচররা সম্রাটের কাছে যেসব সংবাদ পৌঁছে দিত, সেই গুপ্তচররা ছিল শাসকের বার্তাবহ। আবার সুলতানি আমলে 'বারিদ-ই-মামালিক' বা গোয়েন্দা প্রধান কর্তৃপক্ষকে সাম্রাজ্যের তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কাজেই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই শাসককে এ ধরনের সংবাদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু রাখতে হয়েছে। তবে এসব ব্যবস্থাকে শাসকগোষ্ঠী যা-ই মনে করুক না কেন, সাংবাদিকতা হিসেবে তা কোনোভাবেই গণ্য করা যায় না।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে তৎকালীন ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি সংবাদপত্রেরও বিকাশ ঘটেছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ এবং সংগঠন ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশে সংবাদপত্র তখন আলোর মুখ দেখতে শুরু করে। তবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে আরও পরে। শুরুর দিকের প্রকাশনাগুলো অধিকাংশই ছিল মুখপত্রনির্ভর এবং সাহিত্যবিষয়ক। একটি মুদ্রিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি তুলে ধরা যেতে পারে, সেই ভাবনা এসেছে আরও পরে। তবে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শাসকদের মনোভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। তারা বিভিন্ন কালাকানুনের মাধ্যমে সব সময়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চান। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক আলী রীয়াজ তার *গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম* গ্রন্থের 'সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন' অধ্যায়ে লিখেছেন–

'এই উপমহাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে, যাকে আমরা হিকীর গেজেট বলে জানি। *বেঙ্গল গেজেট অব ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার* পত্রিকাটি যখন প্রকাশিত হয় সে সময়টিতে সংবাদপত্র বিষয়ে তৎকালীন শাসকদের কোনো আইন ছিল না। কিন্তু এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ তাদেরকে এতটাই উত্তেজিত করে তোলে যে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে সরকারি মহলে। প্রাথমিকভাবে এই পত্রিকাটি বঞ্চিত হয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সংবাদপত্র বিতরণের সুবিধাটি থেকে এবং পরবর্তীকালে মালিক-সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকীকে মানহানি ও দুর্নাম রটানোর মামলায় জড়ানো হয়। হিকী এই নিগ্রহ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সংবাদপত্র জগৎ থেকে সরে দাঁড়ান।' (*গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম/ আলী রীয়াজ, পৃ. ৫৬-৫৭*)

> এদিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক চাপের মুখে সংবাদ বা গণমাধ্যম থেকে মুখ ফেরাচ্ছে। গণমাধ্যমে তারা তাদের বিনিয়োগ ক্রমেই সংকুচিত করে চলেছে

এই ভূখণ্ডে সংবাদপত্রের সূচনা আরও পরে। ১৮৪৭ সালে তৎকালীন রংপুরের কাকিনায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জমিদার গুরুচরণ রায়ের অর্থায়নে 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল। আর এখান থেকেই পূর্ব বাংলার প্রথম সংবাদপত্র *রঙ্গপুর বার্তাবহ* (১৮৪৭) প্রকাশিত হয়। এ জেলা থেকেই প্রকাশিত অপর সাপ্তাহিক *দিন প্রকাশ* তৎকালীন পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় সংবাদপত্র। কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* (১৮৬৩) এ দেশের সংবাদপত্রজগতের একটি অন্যতম মাইলফলক। প্রথমে এটি কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত হলেও পরে কুমারখালীতে নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রণযন্ত্রটি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় ১৮৬৪ সালে হরিনাথ মজুমদারকে দান করেন। হরিনাথ মজুমদার তার *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* তৎকালীন সমাজপতিদের নানা অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করে সমাজের প্রভাবশালী মহলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। একসময় তার সংবাদপত্রটি বন্ধও হয়ে যায়। সাংবাদিকতার জন্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার থেকে শুরু করে এ যুগের সাংবাদিকরা নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ কখনো সমাজের আবার কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত বাঙালির জন্য ছিল এক চরম অন্ধকার যুগ। সংবাদপত্রও এর বাইরে ছিল না। তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসন সংবাদপত্রের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রেখেছিল। সামরিক শাসনে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সেখানে রুদ্ধ। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় এসে সংবিধান স্থগিত করে দেয়, রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করে। এ সময় সাংবাদিকরা কোনোভাবেই প্রকৃত সংবাদ তুলে ধরতে পারেন না। সংবাদ পরিবেশনের জন্য তখন তাদেরকে ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী তার একটি লেখায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

'আমার যতটুকু মনে আছে, ১৯৬২ সালে যখন শিক্ষা আন্দোলন হলো, সরকারি বাহিনীর গুলিতে লোক মারা গেল, তখন আমরা অনেকেই গ্রেফতার হলাম। জেলখানায় *দৈনিক ইত্তেফাক* পেতাম। একদিন দেখলাম, আহমদুর রহমান সেখানে *বাঁশ* নিয়ে লিখেছেন। বাঁশের চিহ্ন, আকার, কার্যকারিতা ইত্যাদি। কচুরিপানার মতো বিষয় নিয়েও তিনি লিখেছেন। এ রকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমনভাবে লিখতেন, যেগুলো প্রকারান্তরে ছিল সমালোচনা, তিরস্কার ও সামরিক শাসনের প্রতি কটাক্ষ। জেলখানার আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। আলজেরিয়ায় তখন মুক্তিসংগ্রাম চলছে। আলজেরিয়ায় মুক্তিসংগ্রামীদের বিপক্ষে তিনজন

মূল জেনারেল ছিলেন, এদের একজনের নাম সম্ভবত জেনারেল সালান (রাউল আলবিন লুই সালান)। এরা মানুষ হত্যা করে মুক্তিসংগ্রামকে দমন করছিল। এর বিরুদ্ধে জহুর হোসেন চৌধুরী আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন এবং তার লেখায় জেনারেলদের নামের আগে শুয়োরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, হারামজাদা গালিগুলো ব্যবহার করেন। সংবাদপত্রে এভাবে জেনারেলদের গালিগালাজের ঘটনা ছিল বিরল। এগুলোর মাধ্যমেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এক ধরনের আন্দোলন চলেছে।'

(*'সামরিক শাসনে সংবাদপত্র', কামাল লোহানী, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ জানুয়ারি ২০১৭*)

সাংবাদিকতা পেশা এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতাবিষয়ক এক সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহফুজ আনাম খোলামেলাভাবেই বলেছেন, স্বাধীনতাচর্চার দিক থেকে সাংবাদিকতা এখন সারাবিশ্বে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যেমন আমরা জানি আমেরিকা স্বাধীন সাংবাদিকতার দেশ হিসেবে সুপরিচিত। সে দেশে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মতো একটা অনন্য বিধান আছে, যা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। কিন্তু সেই দেশেই এখন প্রেসিডেন্ট কথায় কথায় সাংবাদিকদের বকাঝকা করেন। সংবাদমাধ্যমে যা কিছু তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়, সেটিকেই তিনি ফেক নিউজ বলেন। তিনি প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের নিকৃষ্টতম জীবদের অন্যতম বলছেন। এভাবে সাংবাদিকদের ও সাংবাদিকতা পেশাকে হেয় করা হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, একসময় বিশ্বের পশ্চিমা দেশগুলো ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার তীর্থস্থান, তাদের সাংবাদিকতার মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার চর্চা থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের সাংবাদিকরা অনুপ্রাণিত হতাম। অথচ সেটা এখন সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

মাহফুজ আনাম আরও বলেছেন, এখন সাংবাদিকতার স্বাধীনতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে অত্যন্ত কঠোর আইন এবং বিধান প্রণয়ন করা হচ্ছে। এটা একটা বৈশ্বিক প্রবণতা। আরও একদিক থেকে সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সেটা ঘটেছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আসার ফলে একজন পাঠকের সামনে সংবাদের অনেক পথ উন্মোচিত হয়েছে। সে এখন আর খবরের কাগজ, টেলিভিশন এবং রেডিয়োর ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না। যে কোনো খবর সে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তৎক্ষণাৎ জেনে ফেলছে। শুধু জেনে ফেলছে না, সে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে নিজের অভিমত দেওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু খবরের কাগজের পাঠকের সেই সুযোগ কখনো ছিল না, তাকে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখতে হতো, সেই চিঠি ছাপা হতো কি হতো না, হলে কদিন পরে ছাপা হতো ইত্যাদি অনেক সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন যার হাতেই একটা স্মার্টফোন আছে, সে তার মতামত প্রকাশ করতে পারছে এবং তার মতামত একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সর্বসাধারণের মতপ্রকাশের এত ব্যাপক স্বাধীনতা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ছিল না।

সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে মাহফুজ আনাম রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তার মতে, কঠোর কালাকানুন স্বাধীন সাংবাদিকতাকে আরও কঠিন করে তুলছে। আর এই সংকটকেই তিনি বৈশ্বিক প্রবণতা বলতে চেয়েছেন।

(*প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৯*)

কিন্তু অতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা আরও বড়ো এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জটির নাম করোনাভাইরাস বা 'কোভিড-১৯।' অতিমারি করোনাভাইরাসের এই চ্যালেঞ্জ কেবল সাংবাদিকতার জন্য নয়, বিশ্বের সব শ্রেণিপেশার মানুষকে আজ এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষের সামনে এখন স্যানিটাইজার, মাস্ক, আইসিইউ, কোয়ারেন্টিন, সোশ্যাল ডিসট্যান্স, আইসোলেশন, লকডাউন প্রভৃতি নতুন কিছু শব্দ অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। কিছু শব্দ পরিচিত হলেও এসব শব্দের ব্যবহার কখনো সেভাবে হয়নি। কিছুদিন আগে এসব শব্দ এবং শব্দের ব্যবহার সাধারণ মানুষ এমনকি সাংবাদিকদের কাছেও অজানা ছিল। কিন্তু সে যাই হোক, সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি মানুষের সামনে তুলে ধরা একজন সাংবাদিকের প্রধান দায়িত্ব। এটি প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক যে কোনো মাধ্যমের জন্য হতে পারে। সবখানেই বিষয়বস্তুর যথার্থ উপস্থাপনা জরুরি। কিন্তু করোনাভাইরাসের মহাদুর্যোগকালে এই চ্যালেঞ্জটি সাংবাদিকদের সামনে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকরা বুঝে উঠতে পারছেন না, তারা কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে সঠিক সংবাদটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। কেননা আজকের এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন। এই পরিস্থিতির সঙ্গে কারও পূর্বপরিচয়ও ছিল না। আর তাই কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক সমাজকে একটি নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এদিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক চাপের মুখে সংবাদ বা গণমাধ্যম থেকে মুখ ফেরাচ্ছে। গণমাধ্যমে তারা তাদের বিনিয়োগ ক্রমেই সংকুচিত করে চলেছে। ফলে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো থেকে সংবাদপত্র কিংবা রেডিয়ো ও টেলিভিশনে এখন আর আগের মতো বিজ্ঞাপন আসছে না। অবশ্য এই ধারা কিন্তু করোনাকালের বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। করোনাকালে বিষয়টি আরও সুদূরপ্রসারী হয়েছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন কমতে শুরু করেছে। অথচ বিজ্ঞাপনই যে কোনো সংবাদমাধ্যমের আয়ের অন্যতম ও প্রধান উৎস। একই সঙ্গে গণমাধ্যমগুলোর ডিজিটাল সংস্করণেও আগের তুলনায় বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কমে গেছে। এসব কারণে সাংবাদিকরা এখন এক চরম অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করছেন। এক কঠিন সময় অতিক্রম করার পরও সাংবাদিকরা আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাদের বেতন কমে যাচ্ছে এবং অনেকে তাদের কর্মস্থল থেকে ছাঁটাইয়ের শিকার হচ্ছেন। বিশ্বের শীর্ষ সংবাদপত্র *দি গার্ডিয়ান* এ বিষয়ে সম্প্রতি অনুসন্ধান করে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনাভাইরাস সংকট আরও দীর্ঘায়িত হলে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রগুলো তাদের ডিজিটাল রাজস্বের একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। তাদেরকে হারাতে হতে পারে অসংখ্য মিলিয়ন ডলার।

॥ দুই ॥

করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বসহ যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাংবাদিকদের এখন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রবেশাধিকারও আগের তুলনায় সীমিত এবং সংরক্ষিত হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকরা এখন ইচ্ছা করলেই যে কোনো জায়গায় যেতে পারছেন না। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের সেন্সরশিপ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চাপ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সাংবাদিকতার কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিন সংবাদ সংগ্রহ করা। তারপর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেই সংবাদটি পরিবেশন করা। কিন্তু করোনাকালীন নিরাপত্তাজনিত কারণে মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকতা এখন প্রায় থমকে গেছে। সাংবাদিকদেরকে সরেজমিন রিপোর্টিংয়ের পরিবর্তে ভার্চুয়াল

সংবাদ সম্মেলনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আবার জীবনঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সাংবাদিক ইতোমধ্যে মারা গেছেন। এখনো প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিকরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। মহামারি করোনা ছাড়াও সাংবাদিকদের আরও অনেক নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। তারা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো শারীরিক আক্রমণ এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকেন।

করোনাভাইরাস একটি বৈশ্বিক মহামারি। এই মহামারি মোকাবিলা করার জন্য বৈশ্বিক সহায়তা ও সঠিক তথ্য বিনিময় অপরিহার্য। সঠিক তথ্য প্রচারিত না হলে কিংবা কোনো ভুল তথ্য প্রচারিত হলে এই সংকট আরও প্রলম্বিত হতে পারে। *রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স জার্মানি*-এর পরিচালক ক্রিশ্চিয়ান মির ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তগণমাধ্যম চর্চার ওপর যে আঘাত দেখা যাচ্ছে, তা একেবারেই নতুন কিছু নয়। কারণ এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা এর আগেও ছিল, এখন করোনা পরিস্থিতিতে সেই সংকট আরও তীব্র হয়েছে। চীনের পরিস্থিতিকে সবচেয়ে উদ্‌বেগজনক উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, দেশটির অনেক সাধারণ নাগরিক এবং সাংবাদিক উহানের হাসপাতালগুলোকে নিয়ে সংবাদ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সংবাদ প্রচার করার পর তাদের অনেকেই সাময়িকভাবে বা পুরোপুরিভাবে দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে। কারণ তারা এই ঘটনার জন্য সে দেশের সরকারের ব্যর্থতার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে সঠিক তথ্য প্রকাশিত না হয়। চীনের বাইরে আরও অনেক দেশ আছে, যেসব দেশে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে সরকারের বিধিনিষেধ রয়েছে। আর্মেনিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশ গণমাধ্যমের ওপর বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এজন্য সেসব দেশের সাংবাদিকদের ওপর মহামারি ভাইরাসের পাশাপাশি দুঃসহ মানসিক চাপ তীব্রতর হয়েছে। সেসব দেশের সাংবাদিকরা করোনাকালে আরও কঠিন সময় পার করছেন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাংবাদিকদের এখন আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তারা সংবাদ গ্রহণ এবং পরিবেশনে এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। অথচ সংবাদকর্মীদের জন্য এক ভয়ংকর দুঃসংবাদ– বেশির ভাগ পাঠক সংবাদপত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। পাঠক এখন হাতে নিয়ে মুদ্রিত সংবাদপত্র পড়তে চাইছেন না। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুতে এমনও রটনা হয়েছে যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে রোগের সংক্রমণ ছড়ায়। কিন্তু পরে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে না। এ রকম দাবির পরও সাধারণ মানুষ শঙ্কার মধ্যে পড়েছেন। ফলে ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতায় প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রিত সংবাদপত্র টিকে থাকবে কি না, এ নিয়েও নতুন করে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে কোভিড-১৯ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসংখ্য গুজব ছড়িয়েছে। আতঙ্কিত মানুষ এসব গুজব অনেক সময় বিশ্বাসও করছে। এর সঙ্গে রয়েছে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ছড়াছড়ি। সাংবাদিকদের জন্য এই পরিস্থিতি সত্যিই চ্যালেঞ্জের। তারা কী প্রকাশ করবেন আর কী করবেন না, এ নিয়েও তারা অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, আমরা শুধু একটা মহামারির বিরুদ্ধে লড়ছি না, বরং সেই সঙ্গে আমাদেরকে তথ্যবন্যার (Infodemic) বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

“পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাংবাদিকদের এখন আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তারা সংবাদ গ্রহণ এবং পরিবেশনে এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর”

ক্রীড়া সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ আরও জটিল। কারণ ক্রীড়ামোদী পাঠক বা দর্শকদের খেলাধুলার আপডেট অথবা ব্রেকিং নিউজ জানাতে হলে সাংবাদিকদের মাঠে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তারা এখন মাঠেও যেতে পারছেন না। তাই আগের মতো এখন আর খেলাধুলার ব্রেকিং নিউজও ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে না। মাঠপর্যায়ের ইনভেস্টিগেটিভ নিউজ করার বদলে সাংবাদিকরা ঘরে বসে এখন স্পেশাল স্টোরি তৈরি করছেন। অনেক সময় তারা ক্রীড়াবিদদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। কিন্তু সাংবাদিকদের জন্য কোনো ক্রীড়াবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভীষণ কঠিন। কারণ আগে মাঠে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের ফাঁকে ক্রীড়া সাংবাদিকরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতেন, তাদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতেন। কিন্তু এখন সাংবাদিকদের ভরসা কেবলই ফোন। আবার ফোনে সব সময় সবাইকে পাওয়া যায় না। ফোনে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে অনেকে স্বস্তিবোধও করেন না।

প্রথমদিকে করোনাভাইরাস নিয়ে কাজ করাটাকে অনেকে স্বাভাবিক বলে মনে করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, সংবাদকর্মীদের অনেক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। ইতঃপূর্বে তারা প্রলয়ংকরী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, ভূমিকম্পের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছেন। তারা সার্স, মার্স, ইবোলার মতো মহামারিতেও কাজ করেছেন। কিন্তু এবারের কোভিড-১৯ মহামারিতে এসে ধীরে ধীরে সেসব ধারণা পালটে যায়। কোভিড-১৯ মহামারির কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের কাজ চালিয়ে

যাওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার স্বার্থে তাদেরকে মহামারির কেন্দ্রস্থলগুলো থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তখন সংবাদ সংগ্রহের জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা ছাড়া সাংবাদিকদের আর কোনো উপায় থাকে না। তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী পরে সরকারি ভিডিয়ো কনফারেন্সে প্রচারিত বুলেটিন থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে বাধ্য হন। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইউনিট প্রতিদিন তাদের করোনাভাইরাস বিস্তারের আপডেট ব্রিফিং করছে। সংবাদকর্মীরা সেখান থেকে তথ্য নিয়েই যে যার মতো করে সংবাদ পরিবেশন করছেন। শীর্ষ সংবাদ সংস্থা *এএফপি*'র বিশ্বব্যাপী ২০০টি ব্যুরো অফিস এবং ১ হাজার ৭০০'র মতো সাংবাদিক এখন নিয়মিত ভার্চুয়ালি কাজ করছেন। সাংবাদিকদের জন্য বিশাল নিউজরুমের আজ আর কোনো প্রয়োজন নেই, অস্তিত্বও নেই।

॥ তিন ॥

অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও করোনাভাইরাসের কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিক ইতোমধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। বাংলাদেশে বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ায় পত্রিকা বিক্রি আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। বিজ্ঞাপনের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কম। টেলিভিশন মাধ্যমগুলোয়ও প্রয়োজনীয় জনবল হ্রাস করা হয়েছে। ফলে অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচারে অনেক টেলিভিশন চ্যানেলকে এক দুঃসহ সময় পার করতে হচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বের কোনো দেশ কিংবা জনগোষ্ঠীকে ছাড় দেয়নি, গণমাধ্যমকর্মীরা তাই আজ এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা কমলেও অনলাইনে পাঠকসংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে টিভি সংবাদের দর্শকসংখ্যাও। অনেক শ্রোতা নতুন করে রেডিয়োমুখী হয়েছেন। অনেক সংকটের পাশে এসব তথ্য নিঃসন্দেহে নতুন আশার আলো।

ড. অলিউর রহমান তাঁর 'সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল' গ্রন্থের শুরুতেই একুশ শতকের সাংবাদিকতা সম্পর্কে বলেছেন– 'তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ও উৎকর্ষের সুবাদে একুশ শতকে এসে দ্রুতই বদলে যাচ্ছে মানবসভ্যতার দৃশ্যপট। নতুন সহস্রাব্দের সাংবাদিকতার ধ্যানধারণা এবং চর্চার কলাকৌশলগুলোতেও তাই লক্ষ করা যায় নানা পরিবর্তন। সাম্প্রতিককালের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নতুন নতুন শাখায় রিপোর্টিং করার অবারিত সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিউ মিডিয়া, নিউ জার্নালিজম, সাইবার বা অনলাইন জার্নালিজম, পাবলিক জার্নালিজম কিংবা সিটিজেন জার্নালিজম– আধুনিক সংবাদমাধ্যম জগতের এসব নিত্য পরিভাষার সঙ্গে আমরা দিনে দিনে কমবেশি পরিচিত হয়ে উঠছি।'

(*'সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল', ড. অলিউর রহমান, পৃ.* ২৯-৩০)

এখন সংবাদমাধ্যমের পরিধি বাড়ার পাশাপাশি সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণও একটি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ইনস্টিটিউট এবং সেন্টারে সাংবাদিকতা শিক্ষাবিষয়ক নানা ধরনের কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে নানাভাবে। সাংবাদিকতা এখন আর শখের কোনো পেশা নয়, এ পেশায় আসার জন্য রীতিমতো পড়াশোনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসতে হয়। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিশেষায়িত জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে পিআইবি সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ম্যাস কমিউনিকেশন (নিমকো) এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিসিডিজেসি এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। কিন্তু করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের প্রস্তুতি অথবা করণীয় সম্পর্কে কোনো তথ্য কারও কাছেই ছিল না। যেহেতু এই পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ নতুন এবং আকস্মিক, তাই এই ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগও অনুপস্থিত।

অতিমারির কারণে বৈশ্বিক সাংবাদিকতায় কী কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস (আইসিএফজে) এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টো সেন্টার ফর ডিজিটাল জার্নালিজম যৌথভাবে নতুন একটি গবেষণার কাজ শুরু করেছে। এই গবেষণার বেশকিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন:

ক. সাংবাদিকতার ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব এবং সাংবাদিকরা কীভাবে অতিমারি মোকাবিলা করছেন তা খুঁজে বের করা
খ. সাংবাদিকতার চর্চা ও ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা জানা
গ. ভুল তথ্য কীভাবে ছড়াচ্ছে এবং কীভাবে প্রতিরোধ করা হচ্ছে, তা জানা
ঘ. সাংবাদিকদের নিরাপত্তাঝুঁকি ও সেগুলোর প্রতিরোধব্যবস্থা সম্পর্কে জানা এবং
ঙ. অতিমারির কারণে কীভাবে বৈশ্বিক মুক্তগণমাধ্যম চর্চা ব্যাহত হচ্ছে তা খুঁজে বের করা।

গণমাধ্যমকর্মীদের ঝুঁকি এড়াতে যে ধরনের পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, সংবাদমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের মতো সামর্থ্যও ছিল না। আবার সংবাদকর্মীদের বাড়িতে থেকে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যেসব প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তা-ও মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হয়তো করতে পেরেছে। অনেকের পক্ষেই তেমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে মাঠের কাজে নিয়োজিত সংবাদকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতেও তাদের নিয়োগকারী বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে। মহামারির এই দুর্যোগকালে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিমাটিও কি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে? সম্ভবত এটিও হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার মতো দেশগুলোয় ছোটখাটো সাময়িকী এবং অনেক স্থানীয় পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের সংবাদ ম্যাগাজিন আউটলুক ৩০ মার্চ থেকে তাদের প্রিন্ট ভার্সন মুদ্রণ বন্ধ করেছে। নেপালে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পর সে দেশের সবচেয়ে বড়ো মিডিয়া হাউস কান্তিপুর গ্রুপসহ প্রধান সংবাদ প্রতিষ্ঠান গ্রুপগুলো নেপালি ও ইংরেজি দুই ভাষারই পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কা ও ভুটানে সংবাদপত্রশিল্পে ব্যাপক আঘাত হানলেও সেখানকার গণমাধ্যমে সংবাদকর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশের সংবাদপত্রশিল্পের চিত্র ভয়াবহ। সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একাধিক জাতীয় দৈনিকের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর আর্থিক অবস্থাও ভয়াবহ। দেশের সাংবাদিক নেতারা ইতোমধ্যে

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে তারা গণমাধ্যমের জন্য সরাসরি সহায়তা অথবা আর্থিক প্রণোদনার প্রস্তাব দিয়েছেন।

৬ মে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনা মহামারির ডিজইনফেকশন চেম্বার উদ্‌বোধন করেছেন। এ সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছেন, 'আমি সব সময় মন্ত্রী ছিলাম না; কিন্তু আমি সব সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে ছিলাম।' তিনি সাংবাদিকদের প্রতি গভীর মমতার কথা উল্লেখ করে তাদের করোনা পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে তিনি দুস্থ সাংবাদিকদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব সহায়তারও আশ্বাস দেন। ড. হাছান মাহমুদ এ সময় আক্ষেপ করে আরও বলেন, বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে মেডিকেল গবেষণায় যে অর্থব্যয় হয়, এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয় সামরিক খাতে। তিনি বিশ্ববিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেন, আমরা কি এখনো অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় থাকব, নাকি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর মানুষের সুরক্ষার জন্য কাজ করব?

এ রকম একটি পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীন সাংবাদিকতা টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেরা উদ্যোগী হয়েছেন। গণমাধ্যমের জন্য সরকারি সহায়তার বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েও সেসব দেশের রাজনীতিক, সমাজকর্মী এবং মানবতাবাদী সংগঠনগুলো এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনীতিতে যে ঋণ সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই ঋণগ্রহীতার তালিকায় শিল্প হিসেবে গণমাধ্যমকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, মার্কিন নাগরিকরা মুদ্রিত সংবাদপত্র কিনতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন, তাদেরকে সেই পরিমাণ কর রেয়াত দেওয়া হবে। এতে সাধারণ পাঠক সংবাদপত্র কিনতে উৎসাহী হচ্ছেন। স্কটল্যান্ডে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্থাপনার জন্য যে বাণিজ্যিক কর দেয়, তা দুই বছরের জন্য মওকুফের কথা বলা হয়েছে।

॥ চার ॥

চলতি বছর ৩ মে বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস পালিত হয়েছে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'ভয় ও পক্ষপাতমুক্ত সাংবাদিকতা'। সত্যিই কি এ বছর সাংবাদিকতা ভয় ও পক্ষপাতমুক্ত হয়েছে? ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৩ মে তারিখটিকে বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমকর্মীরা এ দিবসটি পালন করে আসছে। এই দিবসটিতে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও মুক্তগণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল্যায়ন, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার শপথ নেওয়ার পাশাপাশি ত্যাগী সাংবাদিকদের স্মরণ এবং তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো হয়। এবারের মুক্তগণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে ইউনেস্কো ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও তাদের পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই দিবসটি পালন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে ২ মে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাব 'গণমাধ্যমচিত্র: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি তার বক্তব্যে যথার্থই বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া সুন্দর দেশ বা সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্য গণমাধ্যমের বিকাশ ও মুক্তগণমাধ্যম অপরিহার্য।

> এ অবস্থায় সংবাদকর্মীরা বাধ্য হয়ে ঘরে বসে কাজ করছেন। অবশ্য এর মধ্যে কেউ কেউ যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন না তেমন নয়। আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকে সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে নানা সংকটেরও সম্মুখীন হচ্ছেন

মাঠপর্যায়ে বা সরেজমিনে রিপোর্টিং ছাড়া সাংবাদিকতার দায়িত্ব কখনো পুরোপুরি পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মহামারি করোনাভাইরাসের এই দুর্যোগে সংবাদকর্মীর পক্ষে স্বচ্ছন্দে মাঠপর্যায় থেকে রিপোর্টিং করা সম্ভব নয়। কেননা দায়িত্ব পালনের চেয়ে সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত সুরক্ষা বা নিরাপত্তার প্রশ্ন সবার আগে। এ অবস্থায় সংবাদকর্মীরা বাধ্য হয়ে ঘরে বসে কাজ করছেন। অবশ্য এর মধ্যে কেউ কেউ যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন না তেমন নয়। আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকে সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে নানা সংকটেরও সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে পরিস্থিতি মোটেই সাংবাদিকতার অনুকূলে নেই।

করোনাভাইরাস নিয়ে এই উদ্‌বেগ এখন সারাবিশ্বের। বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ এবং নেতারাও দারুণভাবে উদ্‌বিগ্ন। সম্প্রতি 'The New Age' এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 'COVID-19 challenges for journalists' শিরোনামে–

'THE COVID-19 pandemic that has become a global health concern appears to have made work challenging even for journalists, along with people in other professions, as much around the world as in Bangladesh. Julie Posetti, global director of research at the Washington-based International Centre for Journalists, in April said that the new coronavirus has not only been taking a heavy toll on human lives since it became a pandemic but also threatening the existence of a number of media houses.

The International Centre for Journalists and Columbia University's Tow Centre for Digital Journalism have banded together to conduct a study to assess the impact of the pandemic on journalism across the world. The head of the research team, Emily Bell, professor at Columbia University's graduate school of journalism, says that newsrooms have started facing economic, psychological and other pressure because of COVID-19. The Paris-based Reporters Without Borders says that as in other countries, journalists in Bangladesh too have been affected by the outbreak. The fearful proposition has not only stemmed from journalists having been infected with the virus. ... Journalists may not have been able to maintain social distancing when they discharge their duties. They have crowded places whey then have covered events. And this happened with journalists of media houses of repute. They have largely huddled together when they covered press briefings in some cases. This speaks of a failure of the media house management and the journalists to go by the health safety protocol that is required during COVID-19 emergencies.'

(Ahmed Shatil Alam and Wahida Alam, The New Age, May 12, 2020)

এই ব্যবস্থায় সাংবাদিকদের ঘর থেকে কাজ করার সুযোগ হয়তো তৈরি হয়েছে; কিন্তু করোনাভাইরাসের মতো একটি বিশ্বব্যাপী অতিমারি বিষয়ের সংবাদ পরিবেশনায় ঘরে বসে সংবাদকর্মীরা এই দায়িত্ব পালন করেই কি সন্তুষ্ট থাকবেন? সংবাদকর্মীরা কখনো এ ধরনের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। অবশ্য ঘরে বসে সংবাদকর্মীদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক কতদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে, তা এখনো কারও কাছে স্পষ্ট নয়। করোনার বিস্তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব হবে না। কাজেই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীদের যদি ঘরে বসেই কাজ করতে হয় তবে তার জন্য আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। করোনাভাইরাসের মতো অতিমারি সংক্রমণকে সঙ্গে নিয়েই অভ্যস্ত হওয়ার কৌশল রপ্ত করতে হবে। সংবাদকর্মীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঘরে বসে রিপোর্টিং করলেও তা যেন পাঠক বা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চয়ই সংবাদকর্মী বা সাংবাদিককেই তৈরি করতে হবে। পাঠক বা শ্রোতা যদি কোনো সংবাদের বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তবে তেমন সংবাদ পরিবেশন না করাই ভালো। এজন্য সাংবাদিককে অবশ্যই সেলফ সেন্সরশিপ মেনে চলতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ইনমা'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আর্ল জে. উইলকিনসন ইতঃপূর্বে ঢাকা সফরে এসে সংবাদপত্রশিল্পসহ গণমাধ্যমের নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে এ দেশের সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গণমাধ্যম সম্পর্কে তার খোলাখুলি মন্তব্য, সাংবাদিকতা এখন বিভিন্ন প্ল্যাটফরম ও প্রযুক্তির ব্যাপ্তির সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছে। আগে একটা সময় ছিল, যখন সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাধারণ বর্ণনামূলক লেখা লিখতে হতো। কিন্তু এখন সাদামাটা বর্ণনামূলক লেখা আর কাজ করছে না। কাজেই সাংবাদিকতায় শুধু সংবাদ লেখার চেয়ে ভিডিয়োচিত্র এবং ধারণকৃত শব্দের মাধ্যমে কীভাবে সংবাদের গল্পটা বলা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে। সাংবাদিকতায় এই পরিবর্তনটাই ঘটছে। তিনি আরও বলেছেন, কেউ যা পড়বে না, তা না লেখাই ভালো।

অতি সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক ও গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা সংবাদকর্মীদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে দেশের গণমাধ্যমগুলো থেকে সংবাদকর্মীদের ছাঁটাই না করে এবং বেতনভাতা না কমিয়ে বিকল্প উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকদের অনুরোধ করেছেন। তারা বলেছেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সবাই শারীরিক দূরত্বের কৌশল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপদে সুরক্ষা পেতে সামাজিক মানসিক নৈকট্য ও পেশাগত বন্ধন এখন খুবই জরুরি। সব প্রতিকূল বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে সংবাদপত্র, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসহ সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সম্পাদকের কাছে তারা আবেদন করেছেন যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ না করে দেন। তারা কোনো সংবাদকর্মী ছাঁটাই না করে, কারও বেতনভাতা না কমিয়ে কীভাবে এই মহাসংকটে সবাইকে সঙ্গে রেখে প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব, সেই উপায় ও কৌশল সম্মিলিতভাবে খুঁজে বের করার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ঐক্যবদ্ধ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও আর্থিক সক্ষমতাকে কাজে লাগালে কাউকে বাদ না দিয়েও এই কঠিন সময় উত্তরণ সম্ভব হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই সময় যিনি চাকরি হারাবেন তার পক্ষে আরেকটি চাকরি বা আয়ের উপায় খুঁজে বের করা বর্তমান বাস্তবতায় অসম্ভব। তখন সেই সংবাদকর্মী শুধু নন, তার গোটা পরিবারই বিপন্ন হবে। সংবাদকর্মীরা টিকে থাকলেই তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত থাকবে।

॥ পাঁচ ॥

রয়টার্স ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব জার্নালিজমের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বের ৩২ শতাংশ পাঠক স্বেচ্ছায় খবর দেখা বা শোনা বাদ দিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের ৫৮ শতাংশ পাঠক জানিয়েছেন, তারা সংবাদ এড়িয়ে চলেন। কারণ এগুলো তাদের মনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কি সমস্যাসংকুল সংবাদগুলো প্রচার করে সাংবাদিকরা কোনো ভুল করছেন? অবশ্যই না, সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই কোনো ভুল করছেন না; কিন্তু পাঠকের জন্য এটি একধরনের সমস্যা বটে। আর এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সলিউশনস জার্নালিজম নেটওয়ার্ক (Solutions Journalism Network)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলছে: 'Our mission is to spread the practice of solutions journalism: rigorous reporting on responses to social problems. We seek to rebalance the news, so that every day people are exposed to stories that help them understand problems and challenges, and stories that show potential ways to respond.' অর্থাৎ তারা সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের ওপর আলোকপাত করতে চান। এতে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ঘটনা থেকে তাদের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো জানতে পারবে।

বিষয়টির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গত সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় ঢাকা শহর নির্বাচনি পোস্টার দিয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের পরও নগরজুড়ে পোস্টারের ছড়াছড়ি। পোস্টারগুলো কীভাবে পরিবেশ দূষণ করতে পারে, তা নিয়ে সংবাদপত্রে সেসময় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, টেলিভিশনে অনেক আলোচনা হয়েছে। টেলিভিশনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত স্টুডিয়োতে বসে টকশোর বক্তারা নানা পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে অসংখ্য রিপোর্ট এসেছে। কিন্তু 'বিদ্যানন্দ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোনো মন্তব্য না করে এ সময় এগিয়ে আসে। নির্বাচনি পোস্টার যা সেসময় আবর্জনার জঞ্জাল হিসেবে

পরিচিত, তারা সেগুলো সংগ্রহ করে পথশিশুদের জন্য খাতা তৈরি করে দেয়। কারণ, পোস্টারটির একপিঠ মুদ্রিত হলেও অপর পিঠ সাদাই ছিল। সমস্যাটির চমৎকার সমাধান হয়। এ ধরনের বিষয় অবশ্যই সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে। সারাদিন নেতিবাচক খবরের ভারে ক্লান্ত পাঠক ও দর্শক যেন নড়েচড়ে ওঠার শক্তি খুঁজে পায়। ঠিক একইভাবে আজকের বাস্তবতায় করোনাভাইরাসের এই দুর্দিনে মানুষ প্রতিনিয়ত মৃত্যু আর সংক্রমণের সংবাদ শুনতে শুনতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তখন এ ধরনের কোনো বিষয় কি সংবাদকর্মীরা সামনে আনতে পারেন না? যাতে পাঠক আবার উদ্দীপ্ত হতে পারেন। খবরের কাগজ কিংবা টেলিভিশনের খবর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া পাঠক-শ্রোতা কি আবারও সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন-রেডিয়োর প্রতি আগ্রহ খুঁজে পেতে পারে না?

অবশ্য এজন্য সংবাদকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদে তারা যখন কোনো সমস্যার কথা বলেন, তখন সঠিক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সেই ঘটনার পুরোটা তুলে ধরা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্বের বিষয়ও এড়িয়ে গেলে চলবে না। নেতিবাচক খবরের উলটো একটা দিকও তো রয়েছে, প্রয়োজনে সেদিকটাও স্পর্শ করা যেতে পারে। তাছাড়া বেছে বেছে কেবল সমস্যা আর নেতিবাচক খবর খুঁজে বের করাই সংবাদকর্মীর একমাত্র কাজ হতে পারে না। সমাজের অসংখ্য ইতিবাচক কাজ আছে, যার বেশির ভাগই সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে যায়। সংবাদকর্মীরাও এসব বিষয়ে অনেক সময় আগ্রহী হন না। কিন্তু ইতিবাচক বিষয়গুলোরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই বিষয়গুলোও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত 'নিরীক্ষা' ২০৬তম সংখ্যায় ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে তাঁর 'জাতীয় উন্নয়নে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন–

'পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে অনেকে মহৎ পেশা এবং এ পেশায় কর্মরত সাংবাদিকদের জাতির জাগ্রত বিবেক অথবা সমাজের অতন্দ্রপ্রহরী ও নানা বিশেষণে ভূষিত করলেও পেশাজীবী সাংবাদিকরা একে স্রেফ একটি পেশা হিসেবে বিবেচনা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতা পেশার নিশ্চয়তা, আর্থিক ও মানসিক সুরক্ষা এবং প্রাপ্য সম্মানের পাশাপাশি অধিকার নিশ্চিতেরও দাবি জানানো হচ্ছে সভা-সেমিনারে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর 'What's the Points of Press Freedom' নিবন্ধে গণমাধ্যমের অবদান আলোচনায় বলেছেন, স্বাধীন গণমাধ্যম যেমন অবহেলিত ও বঞ্চিতদের বক্তব্য তুলে ধরে, তেমনি সরকারকে শোধরানোর সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে সরকারকে জনগণের রোষানল থেকে রক্ষা করে। কোনো মুক্ত গণমাধ্যমের দেশে দুর্ভিক্ষ সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।'

(*'জাতীয় উন্নয়নে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা: সমস্যা ও সম্ভাবনা'*, *ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে*, *নিরীক্ষা*, *সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫*)

একজন সংবাদকর্মীরও তার পেশার নিশ্চয়তা, আর্থিক ও মানসিক সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। সমাজে তার যোগ্য সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তারপরও সমাজের প্রতি এবং নিজের পেশার প্রতি তার কিছু দায়বদ্ধতা আছে

সাংবাদিকতা অন্য যে কোনো পেশার মতোই একটি পেশা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। একজন সংবাদকর্মীরও তার পেশার নিশ্চয়তা, আর্থিক ও মানসিক সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। সমাজে তার যোগ্য সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তারপরও সমাজের প্রতি এবং নিজের পেশার প্রতি তার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। অবশ্য এই দায়বদ্ধতা সব শ্রেণি-পেশার মানুষেরই আছে। তবু একজন সংবাদকর্মী কিংবা একজন সাংবাদিকের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। কারণ সংবাদকর্মী বা সাংবাদিককে সাধারণ মানুষ জাতির বিবেক বলে মনে করে। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা মানুষ তখনই বিশ্বাস করে, যখন সেই ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিক রিপোর্ট করেন। কাজেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখেই সাংবাদিককে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতিমারি করোনাকালও এর ব্যতিক্রম নয়।

তথ্যসূত্র

১. গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম/আলী রীয়াজ, মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
২. সাংবাদিকতা ধারণা ও কৌশল, ড. অলিউর রহমান, পলল প্রকাশনী, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩. নিরীক্ষা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫
৪. কালের কণ্ঠ, ১১ জানুয়ারি, ২০১৭
৫. প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৯
৬. দেশ রূপান্তর, ৪ মে ২০২০
৭. যুগান্তর, ৭ মে ২০২০
৮. The New Age, May 12, 2020

লেখক: লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

ফটোসাংবাদিকের ক্যামেরায় কোভিড-১৯ মহামারি

রোয়ান ফিলিপ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছয় ফটোসাংবাদিক জিআইজেএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন কীভাবে মহামারির এই সময়টাকে তারা ক্যামেরাবন্দি করেছেন, এই কাজ করতে গিয়ে কীভাবে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন এবং কারিগরি চ্যালেঞ্জগুলো সামাল দিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে কঠোর 'পঞ্চম পর্যায়ের' লকডাউনের সময় জোহানেসবার্গের ঘনবসতিপূর্ণ হিলব্রো অঞ্চলে ত্রাণের জন্য এভাবে ব্যালকনি ও ছাদে ভিড় করেছেন সেখানকার বাসিন্দারা

ছবি: ম্যাডেলিন ক্রোনিয়ে

গত মে মাসে, অবিশ্বাস ভরা চোখ নিয়ে একটি খবর দেখছিলেন ফটোসাংবাদিক ডেভিড গোল্ডম্যান। খবরে দেখাচ্ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাবেক সেনা সদস্যদের জন্য তৈরি একটি সরকারি হাসপাতালে কীভাবে মৃত্যুর সংখ্যা লাগামহীনভাবে বেড়েছে।

এই ঘটনা পরে একটি জাতীয় ট্র্যাজেডি ও কেলেঙ্কারিতে রূপ নেয়। দেখা যায়, ম্যাসাচুসেটসের হোলিয়োক সোলজার্স হোমে মহামারির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি সাবেক সেনা সদস্য মারা গেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যরাও তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। শুধু নার্সদের কাছে জানতে পেরেছেন শেষ মুহূর্তটি কেমন ছিল।

পরবর্তী সময়ে আরেকটি স্বাধীন অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল করোনা-আক্রান্ত এবং আক্রান্ত নন– এমন সবাইকে একই ওয়ার্ডে রাখার সিদ্ধান্ত।

ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো তথ্য বা সহযোগিতা পাননি গোল্ডম্যান। ফলে অ্যাসোসিয়েট প্রেস ফটোগ্রাফি দলের এই সদস্যকে তল্লাশি চালাতে হয় পত্রিকার পাতায় ছাপা হওয়া অবিচুয়ারিতে। তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করেন নিহতদের নাম-ঠিকানা এবং তাদের স্বজনদের খুঁজে বের করেন ফেসবুক থেকে।

শেষ পর্যন্ত শোকবিহ্বল পরিবারের সদস্যদের তিনি খুঁজে পান ঠিকই; কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাদের কাছাকাছি আর যাওয়া হয়নি। ফলে গোল্ডম্যানকে এমনভাবে ফটোগ্রাফির পরিকল্পনা সাজাতে হয়েছে, যা তিনি আগে কখনো করেননি। এটি কাজ করবে কি না, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন না তিনি। তার পরিকল্পনাটি ছিল: প্রজেক্টরের মাধ্যমে মৃত সেনা সদস্যের ছবি বাড়ির দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হবে, পরিবারের সদস্যরা সেই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় অনেক সমস্যা দেখা দেয়। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা পরিবারের সদস্যদের মুখে কীভাবে আলো ফেলা হবে? রাস্তা থেকে কীভাবে প্রজেক্টরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে? পরিস্থিতির কারণে সেই বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়াও সম্ভব ছিল না।

গোল্ডম্যানের কোনো ধারণাই ছিল না কীভাবে এসব সমস্যা সমাধান হবে। বরং তার শঙ্কা ছিল, এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তির স্বজনরা আরও বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাবেক সেনা সদস্যদের পরিবার নিয়ে তার এই কাজই হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলমান মহামারির অন্যতম স্মরণীয় ও মর্যাদাপূর্ণ চিত্রায়ণ।

প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনা সদস্য জেমস জুলিভানকে। তিনি মারা গেছেন করোনা-আক্রান্ত হয়ে। জানালায় দেখা যাচ্ছে তার ছেলে টম সুলিভান (বাঁয়ে) ও ভাই জোসেফ সুলিভানকে

ছবি: এপি ফটো/ডেভিড গোল্ডম্যান

প্রজেক্টরে দেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সাবেক নার্স কন্সট্যান্স 'ক্যান্ডি' পিনার্ডের ছবি। তিনি করোনা-আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৭৩ বছর বয়সে। জানালায় দেখা যাচ্ছে তার বোন ট্যামি পেট্রোউচজ (বাঁয়ে) ও ভাই পল ও ব্রায়ান ড্রিসকোলকে

ছবি: এপি ফটো/ডেভিড গোল্ডম্যান

ছবির সাবজেক্ট বা চরিত্রগুলোকে করোনা সংক্রমণ থেকে দূরে রাখা, তাদের অনুমতি পাওয়া এবং সার্বিকভাবে এমন একটি মহামারিকে ছবিতে তুলে আনা– এতকিছু মাথায় রেখে কাজ করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে ফটোসাংবাদিকরা এমন নানা ধরনের উদ্ভাবনী কৌশল খুঁজে বের করেছেন।

তাদের তোলা ছবি প্রভাবও ফেলেছে ব্যাপক। গোড়ার দিকে ইন্দোনেশিয়া সরকার করোনা মহামারিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। সামনে যে কত বড়ো বিপদ অপেক্ষা করছে, সেটি বোঝাতে গিয়ে তখন স্থানীয় ফটোসাংবাদিক জশুয়া ইরাওয়ান্দি, কোভিডে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির প্লাস্টিকে মোড়ানো মৃতদেহের একটি ছবি তোলেন, যা জনপরিসরে তীব্র বিতর্ক জন্ম দেয়। ছবিটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের আগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে জায়গা করে নেয়। ইনস্টাগ্রামে এই ছবিটি দিয়ে হাসপাতালের নার্সদের সাহসিকতার কথা তুলে ধরেছিলেন ইরাওয়ান্দি এবং লিখেছিলেন, 'আমার শুধু মনে হয়, এই মানুষটির ভাগ্যে যা ঘটেছে, তা আমার কোনো প্রিয়জনের সঙ্গেও ঘটতে পারে, আমাদের সবার প্রিয়জনের সঙ্গে ঘটতে পারে।' ইনস্টাগ্রামের এই পোস্টটি পেয়েছিল ৩ লাখ ৪৭ হাজার লাইক। কোভিড-১৯ মহামারির এই অনিবার্য একাকিত্ব ফুটিয়ে তোলা ছবিটি পোস্ট করা হয় ন্যাট জিও'র ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলেও। সেখানে একদিনের মধ্যে ছবিটি পেয়েছিল ১০ লাখেরও বেশি লাইক।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সঙ্গে কাজ

পেরুতে স্বাধীন ফটোগ্রাফার ওমর লুকাস কাজ করেছেন জিআইজেএনের সদস্য সংগঠন আইডিএল-রিপোর্তেরোসের অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সঙ্গে। তারা প্রমাণ করতে চাইছিলেন, সরকার থেকে করোনাভাইরাসে যত মৃত্যুর কথা জানানো হচ্ছে, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি।

লুকাসের ছবিগুলো এটি প্রমাণে সহায়তা করেছে। দাফন ও সৎকারের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ছবিগুলো তুলেছেন লুকাস। ছবি তোলার সময় তিনি পিপিই পরেছেন এবং ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

জিআইজেএনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে লুকাস বলেছেন, 'কাজটিতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে প্রধান চ্যালেঞ্জটি ছিল নিজের ভয় কাটিয়ে

মৃতদেহ রাখার ঘরটিতে যাওয়া। এটি মোটেই সহজ ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে ছবি তোলার জন্য আমাদের সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে সব ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং ভালো মাস্ক পরতে হয়েছে। বারবার জীবাণুমুক্ত করার জন্য অ্যালকোহল ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি এই কাজে হালকা সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি যেন সব সময় প্রস্তুত থাকা যায়।'

'অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সঙ্গে কাজের ধরনটা হয় অনেক বিস্তারিত। খুঁটিনাটি কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। অন্যদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হলো– এখানে আপনাকে অনেক বেশি জায়গা দেওয়া হয়, যা হয়তো অন্য সংবাদমাধ্যমে সব সময় পাওয়া যায় না।'

পেরুর লিমায় স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকারের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে
ছবি: ওমর লুকাস/আইডিএল-রিপোর্টেরোস

পেরুর রাজধানী লিমার সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর করোনাভাইরাস প্রভাব ক্যামেরাবন্দি করতে অনেক সময় ব্যয় করেছেন লুকাস।

'মাস্ক ব্যবহার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা পদক্ষেপের বাইরে একটা কাজ আমি এখানেও করেছি এবং সব সময়ই করি। তা হলো– মানুষের সঙ্গে একটি সংবেদনশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা, যেন আমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারি এবং তাদের জীবনের নানা দিক তুলে আনতে পারি', বলেছেন লুকাস। তিনি আরও বলেন, 'এসব কাজে আমি ভারী কিছু বহন করি না। আমার সঙ্গে থাকে ক্যামেরা এবং একটি ৩৫ এমএম লেন্স।'

লিমার উত্তরে কোমাস জেলার একটি কবরস্থানে কয়েকদিন কাটিয়েছেন লুকাস। তিনি সেখানে যান ভেনিজুয়েলান একটি পরিবারের দাওয়াতে। তাদের কোভিডে হারানো স্বজনের শেষকৃত্যে অংশ নিতে।

সেই সময়ের স্মৃতি স্মরণ করে লুকাস বলেছেন, 'তারা কফিন খুলে দেখতে চাইছিলেন, ভেতরে থাকা মৃতদেহটি তাদের পরিবারের সদস্যের কি না। কিন্তু খুলে দেখা যায়, দেহটি একটি প্লাস্টিক ব্যাগে পুরোপুরি মুড়িয়ে রাখা। মৃত ব্যক্তির প্রেমিকা লাশের কাছে যান, কাঁদতে শুরু করেন। তিনি তখন পুরোপুরি ভেঙে পড়া, আকাশের দিকে তার চোখ তোলা। এটি সত্যিই খুব বেদনাদায়ক একটি মুহূর্ত ছিল।'

লুকাস আরও একটি ছবি তুলেছেন, যেখানে দেখা যায়: মৃত ব্যক্তির মা-বাবা অনুপস্থিত থাকায় তার বোন শেষকৃত্যের প্রথাগুলো লাইভস্ট্রিম করছিলেন। কিন্তু আবেগে ভেঙে পড়ায় তিনি সেটি আর করতে পারছিলেন না। 'আমি কিছুক্ষণের জন্য ক্যামেরা নামিয়ে রেখেছিলাম', বলেছেন লুকাস।

লিমার একটি কবরস্থানে মৃতদেহটি পুরোপুরি প্লাস্টিকে জড়ানো দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা *ছবি: ওমর লুকাস*

মৃত ব্যক্তির মা-বাবা অনুপস্থিত থাকায় তার বোন শেষকৃত্যের প্রথাগুলো লাইভস্ট্রিম করছিলেন। কিন্তু আবেগে ভেঙে পড়ায় তিনি সেটি আর করতে পারছিলেন না
ছবি: ওমর লুকাস

পেরুতে থাকা একটি ভেনিজুয়েলান কমিউনিটির ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব কেমন, তা নিয়ে একটি ফটোগ্রাফিক সিরিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লুকাস।

তিনি বলেছেন, 'এই কমিউনিটির মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোভিড-১৯-এর আগে এই কমিউনিটির ৮০ শতাংশ মানুষই অনানুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু কোয়ারেন্টিন বিধিমালা জারির পর তাদের অনেকেরই উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনেকেই তাদের বাড়িভাড়া দিতে পারেননি এবং উচ্ছেদ হয়েছেন। অনেকে হেঁটে রওয়ানা দিয়েছেন নিজ দেশের দিকে।'

এই কাজে লুকাস তুলে ধরেছেন লিমার একটি আশ্রয়কেন্দ্রের চিত্র, যেখানে ভেনিজুয়েলান এই কমিউনিটির ৩৪ জন বাস করতেন। রাস্তার কিছু হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যও ক্যামেরাবন্দি করেছেন লুকাস। যেমন– একটি ছবিতে দেখা যায়, লিমার সান্তা রোজা চার্চের এক যাজিকা জানালা দিয়ে রুটি ফেলছেন এবং নিচে দাঁড়িয়ে এক নারী সেটি তোয়ালে দিয়ে লুফে নিচ্ছেন। এই নারীর নাম মারেইলা ডেল ভালে। তিনি যে শপিং সেন্টারে কাজ করতেন, সেটি করোনাভাইরাসের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তাই তিনি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যান। এমন পরিস্থিতি দেখে তাকে সেই নানের কাছে নিয়ে যান অন্য দুই পেরুভিয়ান নারী।

লিমায় দ্বিতীয় তলার জানালা দিয়ে রুটি ফেলছেন এক যাজিকা। নিচে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে সেটি লুফে নিচ্ছেন ভেনিজুয়েলার মারেইলা ডেল ভালে
ছবি: ওমর লুকাস

একটি টেক্সটাইল কোম্পানিতে কাজ করতেন ৪৭ বছর বয়সি ম্যারিলিন মুরো। কোভিড-১৯-এর কারণে চাকরি হারিয়ে আরও ৩৩ জন ভেনিজুয়েলানের সঙ্গে তিনি এসেছেন সিন ফ্রোন্টেরাস আশ্রয়কেন্দ্রে
ছবি: ওমর লুকাস

ঘর থেকে ফটোগ্রাফি

প্যারিসে মহামারি শুরুর প্রথমদিকে কিছুদিন সাইকেলে চেপে এই সংকটের সময়কে ক্যামেরাবন্দি করতে চেয়েছিলেন সাবেক 'ওয়ার ফটোগ্রাফার' ও ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো পুরস্কার বিজয়ী টমাস ডোরজাক। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি প্রথাগত ফটোগ্রাফির চিন্তা পুরোপুরি বাদ দেন।

নিজে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া বা সেটি ছড়িয়ে দেওয়ার ঝুঁকি বিবেচনা করে ঘরে বসে বিভিন্ন ইভেন্ট ও মিটিংয়ের স্ক্রিনশট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ডোরজাক। ভিডিয়ো প্ল্যাটফরম, জুমের বিভিন্ন মিটিংয়ে অংশ নিয়ে তিনি এসব স্ক্রিনশট নিয়েছেন। কখনো কখনো তিনি হয়তো কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স বা কর্মীকে বলেছেন তাদের ল্যাপটপ ও ভিডিয়ো চ্যাটটি চালু রাখতে। এভাবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানকার জীবনযাত্রা দেখেছেন এবং সেখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়েছেন।

ডোরজাক ভেবেছিলেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা যদি টেলিফোনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে একজন ফটোগ্রাফার কেন কম্পিউটারের মাধ্যমে নানা আকর্ষণীয় ছবি-ভিডিয়ো সংগ্রহ করতে পারবে না?

তিনি বলেছেন, 'এই সংকট শুরুর প্রথমদিকেই আমি ভেতরের দিকে নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। মনে হয়েছিল, সবাই যেহেতু লকডাউনে আছে সুতরাং পুরো অন্য একটি দুনিয়া এখন খুলে যাচ্ছে এবং সেটি খুলছে জুমের মাধ্যমে। পুলিশি বাধা বা নিষেধাজ্ঞা না থাকার পরও ঘটনাস্থলে যাচ্ছি না– এমনটা আমার জীবনে এবারই প্রথম ঘটল। কারণ ভয় ছিল, আমি হয়তো অন্যদের ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারি। অবশ্য জুম থেকে নেওয়া স্ক্রিনশটগুলোর ভিজুয়াল মান ততটা ভালো হয় না। একটু সাদামাটা। কিন্তু এগুলোও খুব আকর্ষণীয় হতে পারে।'

ম্যাগনাম ফটোজের বিদায়ি সভাপতি ডোরজাক এই মহামারির সময় অংশ নিয়েছেন প্রায় এক হাজার জুম মিটিংয়ে। তার কাজটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হেফাজতে মারা যাওয়া আফ্রিকান-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে মজার অভিজ্ঞতা হয় ডোরজাকের। অনুষ্ঠানটি চলার সময় তিনি হঠাৎ তার স্ক্রিনের এক জায়গায় একটি প্রোফাইলে কিছু একটা পোড়ার ভিডিয়ো খেয়াল করেন। সেটি বড়ো করার পর দেখা যায়, কেউ একজন (জুম বোম্বার) সেখানে বর্ণবাদী বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে 'ক্লু ক্লাক্স ক্লান' সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিয়ো চালাচ্ছিল। সেসময় ডোরজাক, অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যদের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করেছেন, স্ক্রিনশট নিয়েছেন।

জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে কেউ একজন (জুম বোম্বার) সেখানে বর্ণবাদী বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে 'ক্লু ক্লাক্স ক্লান' সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিয়ো চালাচ্ছিল
ছবি: টমাস ডোরজাক/ম্যাগনাম ফটোজ

টুইটারে সার্চ করে অনেক উন্মুক্ত মিটিংয়ের খোঁজ পেতেন তিনি। অথবা অন্যদের আমন্ত্রণে যোগ দিতেন প্রাইভেট মিটিংয়ে। কখনো কখনো তিনি ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড, গ্যাবন ও ফ্রান্সের কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সহায়তাও পেয়েছেন, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের ল্যাপটপ ক্যামেরা চালু রেখেছেন সেখানকার পরিস্থিতি দেখানোর জন্য।

'আমি গতকাল রাতেই গ্যাবনের একটি দারুণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছবি পেয়েছি। এটি বেশ সুন্দর ছিল', বলেছেন ডোরজাক। তিনি আরও বলেন, 'আরেকটি দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল ফ্রান্সের একটি প্রবীণকেন্দ্র নিয়ে। সেখানে আমি একটি জুম মিটিং চালু করে একজনকে বলেছিলাম তার ল্যাপটপটি কমিউনিটি রুমের মাঝখানে একটি টেবিলের উপর রেখে দিতে। এটি এভাবে কয়েক ঘণ্টা চলত। মাঝেমধ্যে ক্যামেরাটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেওয়া হতো। এগুলো খুব গভীর-চিন্তাশীল ফটোসাংবাদিকতা নয়; কিন্তু চারপাশের জীবন যেভাবে সিনেমার মতো আবর্তিত হচ্ছে, তা দেখতে ভালো লাগে।'

অ্যাপল কিবোর্ডের কমান্ড-শিফট-৩ প্রেস করে খুব সহজেই স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলতে পারেন ডোরজাক। রেকর্ড করে রাখতে পারেন এই মহামারির সময়ের আকর্ষণীয় বা যে কোনো সাধারণ মুহূর্ত।

ফ্রান্সের একটি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের কর্মী ও বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্ক্রিনশট
ছবি: টমাস ডোরজাক/ম্যাগনাম ফটোজ

হংকংয়ের গণতন্ত্রকামী আন্দোলনকারীদের ভাবধারা রেকর্ড করার জন্য ডোরজাক এমনকি ভিডিয়ো গেমের দিকেও ঝুঁকেছেন। তিনি সেখানে খেলেছেন নিনটেনডোর 'অ্যানিমেল ক্রসিং' নামের একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিডিয়ো গেম।

ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে এবং একটি ভার্চুয়াল পশুর রূপ নিয়ে ডোরজাক অংশ নিয়েছিলেন এই গেমে। শুরুতে সেখানে তিনি ক্রমাগত গাছ ও দালানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মুশকিলে পড়লেও সেখানকার অন্য ভার্চুয়াল পশুরূপী আন্দোলনকারীরা তাকে সাহায্য করে এবং তাদের একজন হিসেবে গ্রহণ করে। ডোরজাক তাদের এই আন্দোলনের প্রতীকী ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য সেই গেমের অনেক স্ক্রিনশট নিয়েছেন।

'আমি আসলে সেখানে হংকং বিক্ষোভের এক নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। গেমের ভেতরে আমরা দুজনেই ছিলাম টেডি বিয়ার। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড আমি আর কখনো করিনি। তবে তারা আমাকে তাদের গেমের ভেতরে চলা বিক্ষোভ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। আমার কাছে এমন কিছু ছবি আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে– গেমের টেডি বিয়াররা চীনের রাজনীতিবিদদের কচুকাটা করছে। এটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্ল্যাটফরম এবং চীনা সরকার এটি নিষিদ্ধ করেছে', বলেছেন ডোরজাক।

জোহানেসবার্গের দক্ষিণে একটি উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে সেখানকার বিক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের দিকে রাবার বুলেট ছুড়ছে জোহানেসবার্গ মেট্রো পুলিশ। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় উচ্ছেদের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অনেককে উচ্ছেদ করেছে *ছবি: জেমস ওটওয়ে*

মহামারির সময়ে সহিংসতার ছবি তোলা

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফটোগ্রাফার জেমস ওটওয়ে এই মহামারির সময় ঘটে চলা সহিংসতা কাভার করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ফটোগ্রাফির কৌশল অনুসরণ করেছেন। প্রায়ই তাকে বডি আর্মার পরতে হয়েছে, বড়ো বড়ো করে প্রেস লিখে রাখতে হয়েছে এবং প্রতিদিন নানা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

লকডাউনের সময় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্মমতার চিত্র ক্যামেরাবন্দি করেছেন ওটওয়ে, যা প্রকাশিত হয় নিউ ফ্রেমে। এখান থেকে প্রমাণ হয়, কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় উচ্ছেদের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অনেককে উচ্ছেদ করেছে।

'আমার কাজের ধরন অনেক সহনশীল। এটি অনেকের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংবাদ ও তথ্যচিত্র নির্মাণের একটি পদ্ধতি। কখনো কখনো আমি কোনো খবরের সূত্র ধরে কাজ শুরু করি, কখনো এনজিওর সঙ্গে ভিড়ে যাই, কখনো নিজেই চারপাশে ঘুরে দেখি এবং এমন ঘটনার মধ্যে পড়ে যাই, যেখানে পুলিশ মানুষের দিকে রাবার বুলেট ছুড়ছে। এই কাজের সময় আমি একটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরি। এর উপরে বড়ো বড়ো করে প্রেস লেখা থাকে। কারণ আমি চাই, আমাকে যেন খুব সহজে শনাক্ত করা যায়। আমাদের জানা থাকে না যে, পুলিশ কতটা বল প্রয়োগ করবে। ফলে প্রেস লেখার কারণে আমার নিজের হেনস্তা হওয়ার সুযোগ কম থাকে। সোর্সের সঙ্গে আগে থেকেই কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা এবং কিছুটা ভাগ্য এসব কাজে অনেক সাহায্য করে।'

নিরাপত্তা, স্থানান্তর ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত সেবা প্রতিষ্ঠান রেড অ্যান্টের নিরাপত্তাকর্মীরা জোহানেসবার্গের কাছে একটি অনানুষ্ঠানিক বসতি উচ্ছেদের জন্য অভিযান চালাচ্ছে
ছবি: জেমস ওটওয়ে

কমিউনিটির সঙ্গে মিশে যাওয়া

দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক ফটোগ্রাফার ম্যাডেলিন ক্রোনিয়ে লকডাউনের কারণে তার ছবি তোলার পদ্ধতি নিয়ে পুরোপুরি ভিন্নভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি দুস্থ-দুর্গতদের মানবিক সহায়তা দিতে গিয়ে সাংবাদিকতার নৈতিকতা নিয়েও চিন্তা করেছেন নতুন করে।

দেশটির আরও অনেক ফটোগ্রাফারের মতো নিউ ফ্রেমের অভিজ্ঞ কর্মী ক্রোনিয়েও মহামারির শুরুতে অনেক সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলেন এর কাভারেজ নিয়ে। পুলিশ, এমনকি সাংবাদিকরাও নিশ্চিত ছিলেন না– রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের জরুরি সেবাকর্মী হিসেবে গণ্য করা হবে কি না এবং তাদের কারফিউ ও চলাচল নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হবে কি না।

ক্রোনিয়ে বলেছেন, 'আমাদের এখানে পঞ্চম পর্যায়ের (দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে কঠোর কোয়ারেন্টিন নীতি) লকডাউনে, উচ্ছেদ ও কারফিউ বলবৎ করার সময় বাজে ধরনের পুলিশি বর্বরতা দেখা গেছে। শুরুতে নতুন নিয়মগুলো মেনে চলা অনেকের জন্যই কঠিন ছিল। কিন্তু পুলিশ বেছে বেছে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোয় অভিযান চালিয়েছে এবং

তারা সত্যিই মানুষের সঙ্গে খুবই খারাপ আচরণ করেছে। অনেক মারধর ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।'

নিজের হোম কোয়ারেন্টিন অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে গিয়ে ক্রোনিয়ে একটি কৌশল তৈরি করেন অন্য নাগরিকদের অভিজ্ঞতাগুলো ক্যামেরাবন্দি করার।

তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে আপনি ভিন্নভাবে ছবির কথা ভাবতে বাধ্য হবেন। আপনি বাধ্য হবেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে এবং এই একাকিত্বের কথা চিন্তা করতে। আমরা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করছিলাম– আমাদের কি আসলেই ছবি তোলা উচিত? হ্যাঁ, চারপাশে যা ঘটছে, তা তুলে আনাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যদিকে বাইরে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি অন্যকে ঝুঁকির মুখেও ফেলতে চাইবেন না। নিজের সঙ্গেই একধরনের লড়াই চলছিল। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছিলাম– আমি কি যথেষ্ট চেষ্টা করছি? যদি না করে থাকি, তাহলে আমি কি দায়িত্বশীল আচরণ করছি নাকি অলসতা করছি?'

জোহানেসবার্গের একটি আবাসিক ভবনে বসবাস করেন ক্রোনিয়ে। সেখানে থাকতে থাকতে তিনি উপলব্ধি করেন, ভবনটির গৃহকর্মীদের শিশুরা এই লকডাউনের মধ্যে কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছে কংক্রিটঘেরা ছোট্ট একটি উঠোনে। মাসের পর মাস তাদের সেই জায়গাতেই খেলতে হচ্ছে, পড়াশোনা করতে হচ্ছে। তারা স্কুলে যেতে পারছে না, তাদের পারিবারিক বাড়িতেও ফিরতে পারছে না। লকডাউনের মধ্যে এই শিশুদের জীবন ক্যামেরাবন্দি করেছেন ক্রোনিয়ে।

ভবনটির গৃহকর্মীদের শিশুরা এই লকডাউনের মধ্যে কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছে কংক্রিটঘেরা ছোট্ট একটি উঠোনে। মাসের পর মাস তাদের সেই জায়গাতেই খেলতে হচ্ছে, পড়াশোনা করতে হচ্ছে *ছবি: ম্যাডেলিন ক্রোনিয়ে*

পরবর্তী সময়ে কোভিড-১৯-এর কারণে গৃহহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে নেওয়া প্রকল্প কাভার করতে গিয়ে ক্রোনিয়ে খুঁজে পান অবহেলা, চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার চিত্র।

'গৃহহীনদের একটি আবাসন ক্যাম্পে জরুরিভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছিল। সেই ছবি তুলতে ওয়েম্বলি নামের সুন্দর একটি জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে নতুন আর্মি টেন্ট দিয়ে ভালো একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু একই মাঠের অন্যদিকে আরেকটি অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলা হয়েছিল তিন বছর আগে। (ওয়েমার শেল্টার নামের) এটি তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন ভবন থেকে বিতাড়িত মানুষকে আশ্রয় দিতে। এই জায়গাটি খুবই বাজে ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এখানে কোনো ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা রক্ষণাবেক্ষণ ছিল না। বাইরে কিছু মানুষ ঘুমিয়ে আছে। অনেক অপরাধ কর্মকাণ্ড চলছে। এই অবহেলিত মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল অভিবাসী। কেউ তাদের কোনো স্যানিটাইজার বা মাস্ক বিতরণ করেনি। কোনো ধরনের সাহায্য দেয়নি।'

ইউসুফ মোম্বা জোহানেসবার্গের যে ভবনটিতে থাকতেন, সেটি আগুনে পুড়ে যায় তিন বছর আগে। এরপর তার অস্থায়ী একটি তাঁবুও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন তিনি থাকেন ওয়েমার শেল্টারে। চরম অবহেলিত এই আশ্রয়কেন্দ্রের পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে নতুন আরেকটি জরুরি পুনর্বাসন কেন্দ্র *ছবি: ম্যাডেলিন ক্রোনিয়ে*

ক্রোনিয়ে তাদের সহায়তার জন্য একটি দাতব্য সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের সহযোগিতায় ওয়েমার ক্যাম্পের মানুষের মধ্যে ৪০০টি কম্বল এবং প্রায় তিন হাজার ডলার সমমূল্যের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।

এই পর্যায়ে ক্রোনিয়ে তার ক্যামেরা নামিয়ে রেখে ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জন্য স্যুপ তৈরি করার কাজে হাত লাগান। প্রতি সপ্তাহে দুবার করে এই কাজটি তিনি করেছেন চার সপ্তাহ।

ক্রোনিয়ে বলেছেন, 'সাংবাদিক হিসেবে আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন, এমনটিই আশা করা হয়। কিন্তু এই মানুষগুলো একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় আছে। শীত চলে আসছে আর এখানে অনেক শিশুও আছে। ফলে আমরা কিছু সময়ের জন্য এখানে স্যুপ তৈরি ও বিতরণ করেছি। কিন্তু তারপর আমি দেখলাম, আমরা এখানে খুব বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছি।'

টুরফোন্টেইন কোভিড ক্যাম্পে শরীরচর্চা করছে গৃহহীন মানুষ। মহামারির বিস্তার রুখতে জোহানেসবার্গে গড়ে তোলা হয়েছে এমন বেশকিছু ক্যাম্প
ছবি: ম্যাডেলিন ক্রোনিয়ে

ছাঁচঢালা মনোভাব পালটে দেয় যে ছবি

ওয়াশিংটন ডিসিতে কোভিড-১৯ কীভাবে শহুরে অশ্বেতাঙ্গ কমিউনিটিগুলোয় দারিদ্র্য ও দুর্দশা তৈরি করছে, সেদিকে নজর দিয়েছিলেন অ্যাসোসিয়েট প্রেসের ফটোগ্রাফার জ্যাকুলিন মার্টিন।

নিউজরুমের নির্দেশনা মেনে কারও ঘরের ভেতরে ঢুকে ছবি তোলা বাদ দিয়েছিলেন তিনি। কাজের ধরনও বদলে নিয়েছিলেন। যেমন– তিনি এমন একটি ছবি তুলেছেন, যেখানে এক ইহুদি পুরোহিত ভার্চুয়াল প্রার্থনা পরিচালনা করছেন।

কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত শঙ্কা থাকায় তিনি বাইরে অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার জন্য একটি 'ইউনিফর্ম' তৈরি করেন এবং বাসায় ফেরার পর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালান।

মার্টিন বলেন, 'বাইরে যে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার সময় আমি মাস্ক ও গ্লাভস পরি। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট শেষে আমি পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাই। হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি। অ্যালকোহল দিয়ে ক্যামেরা ও কম্পিউটার পরিষ্কার করি। বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গোসল সেরে ফেলি এবং কাপড় ধুয়ে ফেলি। বড়োসড়ো একটা পরিবর্তন হয়েছে যে, আমি বাড়িতে ফেরার পর গোসল ও জামাকাপড় পরিবর্তন না করে আমার ছোটো ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে পারি না। যদি জনসমাগমপূর্ণ কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হয়, তাহলে আমি সার্জিক্যাল মাস্কের বদলে এন৯৫ মাস্ক ব্যবহার করি। আলাদা করে চোখের সুরক্ষার জন্য গগলস পরি। আমরা খুবই ভাগ্যবান যে, নিউজরুম থেকে অনেক সহায়তা পাচ্ছি।'

মহামারির মধ্যে চালু হওয়া কিছু বর্ণবাদী স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ জানানোই ছিল মার্টিনের ফটোসাংবাদিকতার শক্তিশালী দিক। যেমন– প্রচলিত ধারণা হলো, অশ্বেতাঙ্গ মানুষ বেশি ঝুঁকিতে আছে, কারণ তারা কোভিড সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। 'কিন্তু আমি এমনটি একদম দেখিনি', বলেছেন মার্টিন।

মে মাসে তিনি এমন একটি শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ছবি তুলেছিলেন, যেটি কোভিড-১৯ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। এই ফটো প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে এখানে।

মহামারির শুরুর দিকে, কর্তৃপক্ষ তখনও মাস্ক পরাকে বাধ্যতামূলক করেনি– এমন সময়ে ওয়াশিংটনের দক্ষিণপূর্বে একটি খাদ্য বিতরণ সেন্টারের সামনে ১২ বছর বয়সি এক আফ্রিকান আমেরিকান শিশুর ছবি তুলেছিলেন মার্টিন। ছেলেটিকে হিজাবের মতো স্যুট দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে বাইরে পাঠিয়েছিল তার মা।

মার্টিন বলেছেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিটিতে কোভিড-১৯ মৃত্যুহার বেশি হওয়ার পরিসংখ্যান এখনো সামনে আসেনি। কিন্তু মানুষ যে সত্যিই উদ্‌বিগ্ন, তা আপনি সহজেই দেখতে পাবেন। ১২ বছরের এই ছেলের ছবিটি খুব শক্তিশালী। কারণ তার বয়স এত কম এবং আশপাশে সে ছাড়া আর কেউ এত ভারি সুরক্ষা পোশাক পরেনি। পুরোপুরি সুরক্ষা নিশ্চিত না করে তার মা তাকে বাসার বাইরে বেরোতে দেয়নি। এই সময়ে কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিটি যে কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল, এই ছবি তারই প্রতিনিধিত্ব করে। কোভিড-১৯ এখানে অনেক ধরনের বৈষম্যের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এবং এটি কাভার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

মার্চে ওয়াশিংটন ডিসির একটি খাদ্য বিতরণকেন্দ্রের সামনে এভাবেই সুরক্ষা পোশাক পরে অপেক্ষা করছিল ১২ বছর বয়সি সিরে উইলসন ছবি: এপি ফটো/জ্যাকুলিন মার্টিন

ছবি যখন সেতুবন্ধ

হোলিয়োক শহরের সোলজার্স হোম প্রকল্পে কোভিডে মারা যাওয়া সাবেক সেনা সদস্যদের ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের আত্মীয়দের বাড়িতে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সেটির ছবি তুলেছেন এপির গোল্ডম্যান। তিনি বলছিলেন, 'এই মহামারিতে ফটোগ্রাফারদের জন্য অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত হয়ে যাওয়া। এইচআইপিএএ'র (ইউএস হেলথ প্রাইভেসি রেগুলেশন) কারণে আগে থেকেই হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলোর ছবি তোলা কঠিন ছিল। এখন ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি সত্যিই কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম।'

সাবেক সেনা সদস্যদের মৃত্যু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গোল্ডম্যান ফেসবুকের মাধ্যমে তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তিনি ১২টি পরিবারকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যারা এই কাজে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল।

গোল্ডম্যান বলেছেন, 'আমি এই সাবেক সেনাদের একটি পোর্ট্রেট সিরিজ করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখানে যে একটি হারানোর বেদনা মিশে আছে, তা-ও আমি তুলে আনতে চেয়েছি। ফলে আমি এই দুইটিকে এক জায়গায় আনতে চেয়েছি।'

কাজটি ভিজুয়ালি দৃষ্টিনন্দন করার জন্য ১২টি ছবি কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সাজানোর দরকার ছিল। ফলে মারা যাওয়া সব সেনা সদস্যের সামরিক পোশাক পরা ছবি ব্যবহার করেছেন গোল্ডম্যান। ছবিগুলো বিভিন্ন বাড়িতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়েছেন। সেটি ছিল সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে। সব ছবিতেই দেখা গেছে– বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন মৃত ব্যক্তির স্বজনরা এবং তাদের মুখ আলোকিত করা আছে।

এই ১২ মৃত সেনা সদস্যকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছেন গোল্ডম্যান। পুরোনো সব ছবি ঘাঁটতে গিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন অবাক করে দেওয়ার মতো সব গল্প।

যেমন– তিনি জেনেছেন, ৯৩ বছর বয়সি এমিলো ডিপালমা একসময় নিজের মতো করে শাস্তি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক কুখ্যাত নাৎসি অফিসারকে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারাধীন থাকা বন্দিদের পাহারা দেওয়ার জন্য ন্যুরেমবার্গে পাঠানো হয়েছিল ডিপালমাকে। সেখানে খাবার পানি নিয়ে অভিযোগ করায় হেরম্যান গোয়েরিংয়ের কাপে বাথরুমের নোংরা পানি মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে ডিপালমা স্মরণ করেন, গোয়েরিং বাথরুমের পানিই বেশি পছন্দ করেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম– হা হা, এবার তোমাকে ধরে ফেলেছি।' গোল্ডম্যান আরও জেনেছেন ৮৪ বছর বয়সি ফ্রান্সিস ফোলির কথা, যিনি হাসতে হাসতে নার্সদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন এবং গানও গাইতে পারতেন।

সবকিছুর বাইরে গোল্ডম্যান জেনেছেন, এই ১২ জন সাবেক সেনা সদস্য তাদের পরিবারের কাছে অনেক বড়ো একজন মানুষ ছিলেন, যারা সব সময়ই সবাইকে রাস্তা দেখিয়েছেন।

এই কাজ করতে গিয়ে প্রজেক্টরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর জেনারেটর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গোল্ডমানকে ১০০ ফুট লম্বা বৈদ্যুতিক তার কিনে আনতে হয়েছে। সবার বাড়ির বাইরে একটি করে বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা দেখে তিনি যারপরনাই স্বস্তিও পেয়েছিলেন। বাড়ির জানালায় দাঁড়ানো আত্মীয়দের মুখ আলোকিত করার জন্য গোল্ডম্যান একটি বাতি কিনেছিলেন। সেই পরিবারকে বলে দিয়েছিলেন কীভাবে সেটি জানালার সঙ্গে আটকে দিতে হবে।

গোল্ডম্যান বলেছেন, 'সাবেক সেনা সদস্যের পরিবারগুলো আমার ছবি তোলার ক্ষেত্রে দূর থেকে সহযোগীর কাজ করেছে। তারা এমনকি জানালার কাছে থাকা আসবাবপত্রগুলোও সরিয়ে দিয়েছে। আমি আগে কখনো প্রজেক্টর পরিচালনা করিনি। ফলে অনেক কিছুই আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, আমি শুধু প্রিয়জনের ছবি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো কোনো পোর্ট্রেট তুলতে চাই না।'

প্রতিটি ছবির জন্য গোল্ডম্যানকে প্রথমে সেই সাবেক সেনা সদস্যদের বাড়ির দেওয়ালে একটি ছবি প্রক্ষেপণ করতে হয়েছে। তারপর পরিবারের সদস্যদের আহ্বান জানাতে হয়েছে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সামনে তাকানোর জন্য।

'কিছু সময় বিষয়টি এত আবেগঘন হয়ে পড়েছিল যে, তারা সামনে এসে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তারা তাদের বাবা বা মাকে কখনো এভাবে চিন্তা করেননি। আবার এই ফটোগ্রাফি প্রজেক্টটির কারণে তারা নিজেদের প্রিয়জনকে এভাবে শ্রদ্ধা জানানোরও সুযোগ পেয়েছেন।

অন্যদিকে পেরুতে থাকা লুকাস হিমশিম খাচ্ছিলেন ক্রমাগত বাড়তে থাকা কোভিড মৃত্যুর সংখ্যা এবং প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে গিয়ে।

তিনি বলেছেন, শুধু নিচের এই ছবিটি দিয়েই তিনি দুটো বিষয়কে একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

লেখক: জিআইজেএনের রিপোর্টার
সৌজন্যে– জিআইজেএন

করোনাকালে গণমাধ্যমে শিক্ষার হালচাল

সাইফুল সামিন

শুরু থেকেই আশঙ্কা কাজ করছিল। সেই আশঙ্কা যে এমন ভয়াবহভাবে সত্যি হবে, তা কে ভেবেছিল। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে চীনের বাইরে বিভিন্ন দেশে হু-হু করে করোনাভাইরাস ছড়াতে থাকে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। ১১ মার্চ করোনাভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। করোনাভাইরাসের ভয়ংকর ছোবলে সারাবিশ্বের জনজীবন থমকে যায়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সব খাত। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা নিঃসন্দেহে অন্যতম। করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজসহ বিশ্বের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন ক্লাসে চলে যায়। বাংলাদেশে ১৭ মার্চ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। ১৮ মার্চ দেশে করোনায় প্রথম কারও মৃত্যু হয়। ২৬ মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এই ছুটি টানা ৬৬ দিন চলে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দফায়

“করোনাভাইরাসের ভয়ংকর ছোবলে সারাবিশ্বের জনজীবন থমকে যায়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সব খাত। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা নিঃসন্দেহে অন্যতম”

দফায় ছুটি বাড়ানো হয়। এই কঠিন সময়ে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে যতটা সম্ভব শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রাখতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষায় করোনার সার্বিক প্রভাব ও করোনাকালের শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই নানা খবরাখবর আসে। এই আলোচনায় করোনাকালে গণমাধ্যমে শিক্ষা-সংক্রান্ত খবর-মতামতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে।

গুজবে কান নয়

বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার পর দেশজুড়ে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এই ভীতি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে দারুণভাবে লক্ষ করা যায়। এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে বলে গুজব ছড়ায়। এই গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাই এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ করছে মন্ত্রণালয়। এদিন এই বিজ্ঞপ্তি দেশের সব টিভি চ্যানেল ও অনলাইন গণমাধ্যমে গুরুত্বসহকারে প্রচার পায়। যুগান্তর অনলাইনের শিরোনাম: 'করোনাভাইরাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়নি: শিক্ষা মন্ত্রণালয়'। পরদিন এই খবর দেশের সব প্রধান সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

উদ্‌বেগে অভিভাবকরা

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো নিয়ে অভিভাবকরা বিশেষভাবে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাদের এই উদ্‌বেগের কথা বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বসহকারে প্রচারিত হয়। ১৫ মার্চ বিবিসি বাংলা অনলাইনে 'করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ কি বন্ধ করা হবে?' শিরোনামে খবর প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠানো নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্‌বেগ বাড়ছে। তাদের অনেকেই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই সন্তানদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। ঢাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৬ মার্চ জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম 'শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের করোনা আতঙ্ক: বিদ্যালয়ে কমছে উপস্থিতি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে ঢাকা মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি দেখা গেছে। সন্তানকে নিরাপদে রাখতে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যেতে দিচ্ছেন না। শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও নমনীয় আচরণ করছে। কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিত হতে না চাইলে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে না।

> করোনাভাইরাসের কারণে ছুটি দীর্ঘ হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। করোনাকালে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা-সম্ভাবনাসহ নানা বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম অনেক খবর ও মতামত প্রচার করে

বন্ধের ঘোষণা

১৬ মার্চ সরকার ঘোষণা দেয়, ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনটি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়। অনলাইন গণমাধ্যমেও খবরটি দ্রুত প্রকাশ করা হয়। প্রথম আলো অনলাইন শিরোনাম করে '৩১ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ'। পরদিন দেশের সব সংবাদপত্র এই খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

সংসদ টিভিতে ক্লাস

করোনাভাইরাসের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ২৯ মার্চ থেকে মাধ্যমিকের এবং ৭ এপ্রিল থেকে প্রাথমিকের রেকর্ড করা ক্লাস সংসদ টেলিভিশনে প্রচার শুরু হয়। ১২ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের ক্লাস প্রচার শুরু হয়। এই ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ও পরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে সংবাদ হয়। ২৯ মার্চ দৈনিক সমকাল শিরোনাম করে 'আজ থেকে টিভিতে মাধ্যমিকের ক্লাস'। একই পত্রিকার ৮ এপ্রিলের শিরোনাম: 'সংসদ টিভিতে প্রাথমিকের ক্লাস শুরু'। ৯ আগস্টের শিরোনাম: 'এবার রেডিয়োতে হবে প্রাথমিকের ক্লাস'। পরবর্তী সময়ে টিভিতে প্রচারিত ক্লাস মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন করে বিভিন্ন গণমাধ্যম। ১৬ জুন সমকাল পত্রিকার শিরোনাম: 'শিক্ষার্থী টানতে পারছে না টিভির আকর্ষণহীন ক্লাস'।

অনলাইনে ক্লাস

করোনাভাইরাসের কারণে ছুটি দীর্ঘ হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। করোনাকালে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা-সম্ভাবনাসহ নানা বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম অনেক খবর ও মতামত প্রচার করে। ২ মে বাংলা ট্রিবিউন 'করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন কার্যক্রমে ঝুঁকছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে। ১৫ এপ্রিল প্রথম আলোয় 'করোনায় অনলাইন ক্লাস একটা সুযোগ' শিরোনামে মতামত প্রকাশিত হয়। ১১ জুন বিবিসি বাংলা অনলাইনের খবরের

শিরোনাম: 'করোনাভাইরাস: অনলাইন ক্লাসের সুফল শহরে, পিছিয়ে পড়ছে প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা'। ১৭ জুলাই প্রথম আলোর শিরোনাম: 'করোনাকালে অনলাইন ক্লাসের হরেক তরিকা'। ২৭ জুলাই সমকালের শিরোনাম: 'কেমন চলছে অনলাইনে পড়াশোনা'।

ইন্টারনেট সুবিধা

করোনাকালে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নানা পদক্ষেপ নেয়। সরকারের পদক্ষেপগুলোর খবরাখবর গণমাধ্যমে গুরুত্ব পায়। ২৬ জুন জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের খবর 'ফ্রি ইন্টারনেট দেয়া হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের'। ৭ জুলাই বণিক বার্তার খবর: 'শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট দিতে আলোচনা চলছে: শিক্ষামন্ত্রী'। ২৩ জুলাই বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম প্রতিবেদন করে 'বিনামূল্যে নয়, শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট-ডিভাইস সুলভ করতে চায় সরকার'। ১০ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনের শিরোনাম: 'শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সরবরাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি'। ২ সেপ্টেম্বর যুগান্তরের খবর '১০০ টাকায় পুরো মাস ইন্টারনেট পাবেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা'। ১১ সেপ্টেম্বর বাংলা ট্রিবিউনের শিরোনাম: 'শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেওয়া শুরু'।

পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা বাতিল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এসব পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে উদ্‌বেগ দেখা দেয়। এই উদ্‌বেগের কথা তুলে ধরে গণমাধ্যম। এ অবস্থায় ২৫ আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও সমমানের পরীক্ষা চলতি বছরের জন্য বাতিলের কথা জানানো হয়। ২৬ আগস্ট দৈনিক সমকাল শিরোনাম করে 'প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা বাতিল'। পরবর্তী সময়ে চলতি বছরের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষাও বাতিল করা হয়। এ নিয়ে ২৮ আগস্ট সমকাল পত্রিকার শিরোনাম: 'জেএসসি জেডিসি হচ্ছে না'।

আলোচনায় এইচএসসি

২ এপ্রিল চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৩ দিন আগে তা স্থগিত হয়ে যায়। করোনা সংকট দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই পরীক্ষা কবে হবে, হলে কীভাবে হবে, তা নিয়ে চলে নানা আলোচনা। ছড়ায় গুজবও। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রসঙ্গটি গণমাধ্যমে বেশ গুরুত্ব পায়। ২১ আগস্ট বিবিসি বাংলা অনলাইনের খবর 'করোনা ভাইরাস: বাংলাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে কী ভাবছে কর্তৃপক্ষ?'। ২৮ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিদিন অনলাইনের শিরোনাম: 'এইচএসসি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়নি: শিক্ষা মন্ত্রণালয়'। ২৯ আগস্ট যুগান্তর অনলাইনের শিরোনাম: 'এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান'। ১ সেপ্টেম্বর বাংলা ট্রিবিউনের শিরোনাম: 'পরিস্থিতি বুঝেই এইচএসসি পরীক্ষা'। ১৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদন: 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি'।

অনিশ্চয়তায় শিক্ষা

করোনাভাইরাসের মহামারি দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতোমধ্যে কতটা বিপর্যয় ডেকে এনেছে বা সামগ্রিকভাবে কতটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে শুরু থেকেই নিয়মিত প্রতিবেদন প্রচার করে আসছে গণমাধ্যমগুলো। ১৯ মে সমকাল শিরোনাম করে 'করোনার পরে ৩০ ভাগ শিশু শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে'। ১৫ জুলাই যুগান্তর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ায় করোনার প্রভাব: পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিন'। ১৮ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠ শিরোনাম করে 'তছনছ শিক্ষা ব্যবস্থা, করোনায় সব ওলটপালট'। ২৪ আগস্ট বণিক বার্তার শিরোনাম: 'করোনায় বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা: শূন্যতা সহসা পূরণ হবে কি?'। ২৭ আগস্ট প্রথম আলোর শিরোনাম: 'অনিশ্চিত যাত্রায় শিক্ষা-শিক্ষার্থী'। ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম: 'করোনায় বিপর্যস্ত শিক্ষা খাত'।

মতামত-পরামর্শ

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর করোনাভাইরাসের যে প্রভাব, তা আর দিনের হিসাবে নিরূপণ করার উপায় নেই। করোনাভাইরাস চলে গেলেও এই ক্ষতির মাশুল বাংলাদেশকে অনেকটা সময় ধরে গুনতে হবে। ভয়াবহ এই ক্ষতি কীভাবে পুষিয়ে নেওয়া যাবে, ভবিষ্যতে শিক্ষা খাতে কীভাবে গতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে– এসব প্রসঙ্গ নিয়ে দেশের প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক-অনলাইন গণমাধ্যমে প্রায়ই বিশেষজ্ঞদের মতামত-অভিমত-পরামর্শ-সাক্ষাৎকার প্রকাশ-প্রচারিত হতে দেখা গেছে। ব্যাপারটিকে গণমাধ্যম যে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা বোঝা যায় 'ট্রিটমেন্ট' দেখে। মতামত পাতার পাশাপাশি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়ও এসব নিয়ে প্রায়ই লেখা ছাপা হচ্ছে। যেমন– শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ১৭ সেপ্টেম্বর দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয় 'শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাবনায় একাধিক বিকল্প'।

বিশ্বপরিস্থিতি

মে মাসের মাঝামাঝি যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের সব ক্লাস অনলাইনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে ২০ মে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের খবর: 'এক বছর অনলাইনে ক্লাস নেবে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি'। খবরে বলা হয়, চলমান করোনা মহামারির কারণে পরবর্তী ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে কোনো মুখোমুখি লেকচার শুনতে পাবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি। এই শিক্ষাবর্ষের সব লেকচার দেওয়া হবে অনলাইনে। পাশাপাশি ছোটো সেমিনারগুলোয় অংশ নিতে পারবেন মর্যাদাপূর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

করোনাভাইরাসের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডসহ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে ১১ মার্চ জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম প্রতিবেদন করে। প্রতিবেদনের শিরোনাম: 'করোনা: যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে ক্লাস চালু'। এদিকে করোনাকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এক সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েন দেশটিতে থাকা বিদেশি শিক্ষার্থীরা। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বিভাগ জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি অনলাইনে চালু হলে সেখানে ভর্তি হওয়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে। দেশটির খ্যাতনামা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের সব কোর্স অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্তের দিন শিক্ষার্থীদের দেশত্যাগ সংক্রান্ত নির্দেশনাটি জারি করা হয়। এমন নির্দেশনায় গভীর উদ্‌বেগ জানায় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। এ নিয়ে ৭ জুলাই দ্য ডেইলি স্টার অনলাইনের বাংলা সংস্করণের শিরোনাম: 'অনলাইনে ক্লাস-পরীক্ষা হলে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের'। ৯ জুলাই যুগান্তর শিরোনাম করে 'যুক্তরাষ্ট্রে অনিশ্চয়তার মুখে ১১ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন'। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও অন্তর্ভুক্ত।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক, প্রথম আলো

কোভিড-১৯ ॥ গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ও ভূমিকা

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)[১] ১১ মার্চ কোভিড-১৯ সংক্রমণকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ এ বিষয়ে তথ্য পেয়েছে। এ সংবাদমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে তথ্য জেনে মানুষ কোভিড-১৯ সংক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তামূলক নিয়ামকগুলো গ্রহণ করেছে। ফলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রশমন নিশ্চিত করতে পেরেছে অনেকখানি। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসাব্যবস্থা, সংক্রমণের মাত্রা ও ফলাফল প্রভৃতি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মানুষ চর্চা করতে শুরু করেছে কী করে এই সংক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়। এসব তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা যেমন– লকডাউন, মাস্ক ব্যবহার, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার, সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব মেনে চলা, আইসোলেশনে থাকা– এ বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়েছে; নিজেকে রক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে পরিবার, সমাজ

“বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসাব্যবস্থা, সংক্রমণের মাত্রা ও ফলাফল প্রভৃতি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মানুষ চর্চা করতে শুরু করেছে কী করে এই সংক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়”

ও দেশের মানুষকে। এ বিষয়গুলো মেনে চলার কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী হারের লাগাম টেনে ধরা গেছে বেশ খানিকটা। কোভিড-১৯-এর মতো এরকম একটি বৈশ্বিক মহামারি অথচ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা থেকে অনেকখানি স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারা গিয়েছে। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের তথ্য এবং এর প্রয়োগের নিকটবর্তিতা পৃথিবীর মানুষকে অনেকখানি সাহস জোগাচ্ছে। এই খবরগুলো পাওয়া যাচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে। অতএব, পৃথিবীর মানুষকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রদত্ত তথ্যগুলো মানুষকে যেমন সচেতন হতে সাহায্য করেছে, তেমনি মনোবল বাড়াতেও সাহায্য করেছে। এর মানে হচ্ছে– ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং মিডিয়াকর্মীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করা কাজগুলো মানবজাতির জন্য আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে।

পক্ষান্তরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের এই সময়ে কিছু মিডিয়া কাভারেজ বেশকিছু নেতিবাচক অবস্থাও তৈরি করেছে। ইউনিসেফের মতে, সংবাদমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনলাইনে কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তিমূলক ও রটনামূলক খবর প্রকাশিত হয়েছে।[২, ৩] কোভিড-১৯ সংক্রমণ কীভাবে ঘটে বা কীভাবে ছড়ায়, কী কী কারণে এই ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হবে এবং কী কী করলে এর সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে– এ ধরনের বিষয়ে প্রচুর ভ্রান্ত তথ্য অনলাইনে ছড়িয়ে আছে। যেমন– প্রথম যখন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগী চীনে শনাক্ত হয়, তখন সংবাদমাধ্যমে এই ভাইরাসকে চীনা ভাইরাস[৪] হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে ওই সময়ে বিদেশে ভ্রমণরত যেসব চীনা নাগরিক/পর্যটক ছিলেন, তাদের মধ্যে একটি বড়ো ধরনের মানসিক সংকট বা আতঙ্ক তৈরি হয়; তারা বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে যান এবং একধরনের বন্দিজীবন কাটাতে বাধ্য হন। যদিও তখনও কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ কেবল চীনের কিছু এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা ঠিক যে, এটি একটি নতুন ভাইরাস এবং তখন পর্যন্ত এটি সম্পর্কে মানুষ বেশিকিছু জানতে পারেনি। তারপরও সংবাদমাধ্যমের কিছু নেতিবাচক সংবাদের কারণে চীনের মানুষের মাঝে একধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আতঙ্ক তৈরি হয়। এমনকি ওই সময়েই আরেকটি খবর সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও কোভিড-১৯ ভাইরাসকে চাইনিজ ভাইরাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রচার করেন।[৫] এই সংবাদ প্রচারের কারণে চীনা পর্যটক ও ছাত্রছাত্রীদের ওপর মানসিক ও শারীরিক আক্রমণ শুরু হয়, যা একধরনের বিভ্রান্তিকর, অপবাদ ও বৈষম্যমূলক চর্চা। এটি এমন একধরনের মিডিয়া রিপোর্ট, যেটি প্রকাশ করায় অনেক বেশি সতর্কতা কাম্য ছিল। কোভিড-১৯ মহামারি গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় প্রচারিত অপবাদমূলক, বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত তথ্য সাধারণ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা তাদের মানসিক অবস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।[৬] আজকের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে কোভিড-১৯ মহামারিতে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় প্রচারিত অপবাদমূলক, বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত তথ্য সাধারণ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেতে পারে এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা:

> কিছু রিপোর্টিং মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। অতএব এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন, তথ্যচিত্র উপস্থাপন অথবা ভিডিয়ো ধারণবিষয়ক সংবাদগুলো পরিবেশনে সতর্কতা কাম্য

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সংবাদকর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত ও পরিবেশিত সংবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সংবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে যে কোনো ধরনের দুর্যোগ কিংবা সংকটপূর্ণ অবস্থায় সংবাদপত্র আমাদেরকে তাৎক্ষণিক ঘটনার জানান দেয়। সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর সার্বক্ষণিক এই তৎপরতার কারণে মানুষ আজ সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উপরের আলোচনার যে বিষয়টি ছিল তা হলো– 'চীনা ভাইরাস বা চাইনিজ ভাইরাস বিভ্রান্তি'। এটির আরেকটি বিষয় হচ্ছে– সারা পৃথিবীর মানুষের অনেককেই বলতে শোনা গেছে যে, চীনা শিশুদের ঘরেই অবস্থান করা উচিত। যাতে তারা এটি অন্য শিশুদের মধ্যে ছড়াতে না পারে। এটি মূলত চাইনিজদের ওপর একধরনের জাতিগত অপবাদ। অনেকে এ-ও বলেছেন যে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ চলাকালীন চাইনিজ নাগরিকদের এড়িয়ে চলা উচিত।[৭] এ ধরনের অপবাদমূলক সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকা উচিত। বিষয়গুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে নিচে উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক:

১. সংবেদনশীল ও ভীতিমূলক সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকা

যে কোনো ধরনের মহামারি অবস্থায় মানুষের সবচেয়ে সহজাত আবেগীয় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়।[৮] পরিবেশগত হুমকি মোকাবিলায় মানুষ সব সময় একধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করে থাকে।[৯, ১০] এ ধরনের পরিবেশগত হুমকির কারণে তাই মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়, যা তাদের মধ্যে ভয়ের জন্ম

দেয়।[১১] যদিও কারও কারও ক্ষেত্রে ভয়ের অনুভূতি উপকারী হয়; কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তা হয় না– তখন তাদের মধ্যে তৈরি হয় অসহায়বোধ। আর তখনই এসব মানুষের মধ্যে একধরনের দিগ্‌বিদিকশূন্য অবস্থা লক্ষ করা যায়।[১২] অনেক সংবাদমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা মহামারির শুরুর দিকের সময়ে বিভিন্ন সুপার মার্কেটের ছবি/ইমেজ প্রদর্শন এবং ব্যাখ্যা করেছেন অনেকখানি ভূতুড়েভাবে। যেমন– কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রথমদিকে চীনের উহানের রাস্তাঘাট এবং শপিংমলগুলোর জনমানবহীন ছবিগুলো দেখিয়েছে খুবই নিরিবিলি, নির্জন হিসেবে। এতে খুব একটা বিপত্তি ছিল না। কারণ, মানুষ আসলে সঠিক চিত্রটিই দেখতে পেরেছে। এই ইমেজগুলোর ক্যাপশন এমনভাবে লেখা হয়েছিল, যা ছিল খুবই ভয়াবহ। বিপরীতে ক্যাপশনগুলোকে সচেতনতা বা সাবধানতার নিরিখে উপস্থাপন করা যেত।

আবার সরকারিভাবে লকডাউন-পূর্ব ঘোষণার সময় কখনো কখনো দেখানো হয়েছে যে, মানুষ হুমড়ি খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ঘরে মজুত করার জন্য একসঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে কিনতে এবং মজুত করতে শুরু করেছে। ফার্মেসি থেকে ভিটামিন-'সি'যুক্ত ওষুধ, মুখে ব্যবহার্য মাস্ক, হাতের গ্লাভস, স্যানিটাইজার ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে। আবার কোনো কোনো দোকানের কেনাকাটার তথ্য পরিবেশন করেছে এভাবে যে, ডিটারজেন্ট, সাবান, অ্যান্টিসেপটিক, ডেটল, স্যাভলন প্রভৃতি জিনিস কিনতে শুরু করেছে অপরিমিতভাবে। দীর্ঘমেয়াদে লকডাউনে থাকার মতো জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্যসামগ্রী মজুত করতে শুরু করেছে। এটা ঠিক যে, যে কোনো ধরনের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ এ ধরনের কাজ করেই থাকবে। কিন্তু সংবাদকর্মীদের এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ এবং সংবাদমাধ্যমে সেগুলোর প্রচার মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা এবং অজানা ভীতির জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ সংক্রমণ চলাকালীন কিছু রিপোর্টিং মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। অতএব এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন, তথ্যচিত্র উপস্থাপন অথবা ভিডিয়ো ধারণবিষয়ক সংবাদগুলো পরিবেশনে সতর্কতা কাম্য। কারণ, এতে নিম্ন আয়ের এবং দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের মধ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা এবং অনিরাপত্তাবোধের জন্ম নেয়, যা তাদের মানসিক প্রস্তুতিতে একধরনের হতাশাবোধ তৈরি করে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে নিয়ম মেনে সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রতি একধরনের অনীহা ও সমস্যাকে অস্বীকার (ডিনায়াল) করার ঝুঁকি তৈরি হয়।[১৩-১৫]

অন্যান্য গবেষণা মতে, এ ধরনের মানসিক অবস্থার জন্য সংক্রমণের বিস্তার আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।[১৬] কারণ, যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।[১৭, ১৮] যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে এই শ্রেণির (নিম্ন আয়ের) মানুষের সংখ্যাই বেশি, তাই তাদের মাধ্যমে অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

২. জাতিগতভাবে বৈষম্যমূলক তথ্য পরিবেশন না করা

আগেই বলেছি, জাতিগত বৈষম্য তৈরি না করার মতো সংবাদ পরিবেশনে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নতুন কোনো সংক্রমণের খবর প্রকাশ এবং তা বর্ণনা করতে গিয়ে পুরোনো কিছু খবরের পুনরাবৃত্তি করা হয়। যেমন, নতুন আক্রান্তের খবর প্রকাশ করার সময় আবারো মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ভাইরাসের উৎপত্তি কোথায় এবং এ ভাইরাস কোথা থেকে এসেছে। সংবাদ সংগ্রাহক, সংবাদ পাঠক, অন্যান্য সংবাদকর্মী, এমনকি নিউজরুম এডিটররা এ বিষয়টি বারবার উল্লেখ করার অর্থ এই যে, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে অপবাদ বা বৈষম্যমূলক তথ্য পরিবেশন এবং অঙ্গুলিপ্রদর্শন।[৬] কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এ ধরনের কোনো রোগের জন্য দায়ী করা সেই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে দোষারোপ করা, তাদের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং শাস্তিমূলক আচরণের শামিল।[১৯-২২]

কোভিড-১৯ ইস্যুতে ফরাসি একটি স্থানীয় পত্রিকা তাদের ফ্রন্ট পেজে 'এশীয়া বিরোধী' মনোভাব প্রকাশ করেছিল 'ইয়েলো অ্যালার্ট' শিরোনামে।[২৩] এর বিপরীতে চাইনিজরা তাদের টুইটার প্রতিবাদ জানিয়েছিল হ্যাশট্যাগ '#JeNeSuisPasUnVirus' (I am not a virus) লিখে।[২৪] অতএব জাতিগত বৈষম্যমূলক এ ধরনের তথ্য পরিবেশন থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

৩. আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখা

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু সংবাদকর্মীরা সংবাদে এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন, যেখানে ব্যক্তির নাম-পরিচয় প্রকাশ না করলেও আক্রান্ত ব্যক্তির বিষয়ে এমন কোনো ক্লু প্রকাশ বা প্রচার করেছেন, যা ওই ব্যক্তির পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম-পরিচয়, তার অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরি। কারণ এতে অনেকের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, যা কখনোই কাম্য নয়। এ ধরনের চর্চা অনৈতিক। কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি, আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রবর্তী, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ওনাদের পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বস্তিবোধ করেন। এ ধরনের তথ্যের প্রকাশ তাদের আত্মগ্লানি, আত্মসম্মানবোধের হানি, দুশ্চিন্তা ও হতাশাবোধের জন্ম দেয়।[৫]

৪. নিশ্চিত এবং বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করুন

গুজবে কান না দেওয়া এবং নিশ্চিত তথ্য-উপাত্তভিত্তিক তথ্যবহির্ভূত কোনো বিষয়ের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী না করা। কারণ কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিষয়ে এমনিতেই কানাঘুষার শেষ নেই এবং বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য চারপাশে ঘোরাফেরা করেই চলছে। তাই আগে নিজে নিশ্চিত হোন এবং এরপর এ বিষয়ে সঠিক খবরটি সংগ্রহ করে উপস্থাপন করুন। মনে রাখবেন, সব ধরনের গুজব খবর হিসেবে কাভার করব না। আপনি যদি কোনো খবরকে গুজব বলে মনে হয় বা সন্দেহ করে থাকেন, তাহলে সে খবরের বিষয়ে এর উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। অতঃপর তথ্য উপস্থাপন করুন। নিজ থেকে কোনো খবরের দুর্নাম নিজের ঘাড়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। নিজের প্রত্যয়ী মনোবলের ওপর মানসিক হুমকি থেকে দূরে থাকার জন্য নিজেই সচেতন হোন। মনে রাখবেন, আপনার পরিবেশিত খবর অন্যের জন্য পারে অশান্তি বা বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে, যা কখনো কখনো ভয়ংকর দুর্ঘটনা বা মানসিক সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[৬] যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারি সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই একধরনের ভয় বা আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে, এ ধরনের নেতিবাচক আবেগের কারণে কোনো বিষয় সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য গ্রহণে ভূমিকা রাখে।[২৫, ২৬]

৫. বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করুন

বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক অথবা সরাসরি সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক মতামত নিন এবং তদানুযায়ী খবর

পরিবেশন করুন। নতুবা অবৈজ্ঞানিক এবং বিশেষজ্ঞ মতামতবহির্ভূত সংবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে। সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন– এ বিষয়ে কখনোই একজন মাত্র বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তথ্য পরিবেশন করবেন না।

৬. বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট বিবেচনাপ্রসূত তথ্য উপস্থাপন করুন

আপনি যে তথ্যগুলো পরিবেশন করছেন, সেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য উৎস এবং রেফারেন্স প্রদান করুন। অন্যথায় সংবাদ উপস্থাপন এবং পরিবেশনের প্রতি মানুষের একধরনের অনাস্থা তৈরি হয়, যা উভয়পক্ষের জন্যই অস্বস্তিকর।

৭. আক্রান্ত ব্যক্তির করা টেস্টের রিপোর্টের ফলাফল প্রকাশ বিষয়ে সতর্ক থাকুন

কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ভুল রিপোর্ট মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তামূলক মানসিক সংকটের সৃষ্টি করে, যা মানুষের মধ্যে একধরনের অসহায়বোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।[৫] ফলে সম্ভাব্য ব্যক্তি সংক্রমিত হলো কি না, সে বিষয় নিয়ে একধরনের দ্বিধাবোধ তৈরি হয়। আর এ কারণে অনেকেই তাদের সংক্রমণের পরীক্ষা করাতে নিরুৎসাহবোধ করেন, যা পুনরায় তাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে এবং নীরব সংক্রমণ বাড়াতে ভূমিকা রাখে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই টেস্ট করানোর সীমাবদ্ধতার কারণে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, সেই বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণ তথ্য প্রদান করতে হবে।

> মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, যথাযথ তথ্য উপস্থাপনের ঘাটতি আচরণ পরিবর্তনে বাধা হিসেবে কাজ করে

৮. ফেস মাস্ক পরিহিত ইমেজ বা ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সচেতন থাকুন

ফেস মাস্ক কীভাবে যথাযথ উপায়ে পরতে হবে এবং কীভাবে পরলে কার্যকর হবে, নাক বা মুখ কতখানি ঢেকে রাখতে হবে এবং কীভাবে যথাযথ উপায়ে পরলে তা একজন মানুষকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে, এ বিষয়ে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর ছবি বা ইমেজ প্রদান না করা। কারণ এতে মানুষের মধ্যে অনিরাপত্তা বোধ এবং সংশয় বৃদ্ধি পায়। সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক তথ্যবহির্ভূত এ ধরনের দ্বিধাযুক্ত তথ্য ফেস মাস্ক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। ফেস মাস্ক ব্যবহার করব কি করব না, সে বিষয়ে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব বা চাপ সৃষ্টি করে। মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, যথাযথ তথ্য উপস্থাপনের ঘাটতি আচরণ পরিবর্তনে বাধা হিসেবে কাজ করে।[২৭]

৯. আক্রান্ত ব্যক্তিদের চরম ভোগান্তিমূলক পরিস্থিতি খুব তীব্রভাবে উপস্থাপন না করা

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ভর্তি থাকা কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সবচেয়ে খারাপ শারীরিক অবস্থাসম্পন্ন কেসগুলো খুব ভয়াবহভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা বাড়িতে থাকা অথবা কম খারাপ অবস্থাযুক্ত মানুষের মধ্যে ভয়াবহ রকম আতঙ্ক ও জীবন সম্পর্কে মারাত্মক নিরাশা তৈরি করে। এ কারণে অনেকেই বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন, ওষুধ খেতে চান না এবং বেঁচে থাকার প্রতি আশা হারিয়ে ফেলেন, যা খুবই ভয়াবহ।[২৮, ২৯] এ ধরনের মানুষের বিষণ্নতা যখন চরম পর্যায়ে চলে যায়, তখন অনেকেই আত্মহত্যা করার মতো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন দাম্পত্য কলহ বা বৈবাহিক জীবন অনেকখানি বিঘ্নিত হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, অতিরঞ্জিত তথ্যের কারণে যে মানসিক চাপ তৈরি হয় তা সামাল দিতে বা মোকাবিলা করতে না পেরে অনেকেই অস্থির বা অতিরিক্ত রাগের আচরণ করছে এবং ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের মতো অনেক ঘটনা ঘটেছে।[৩০-৩৩]

১০. জটিল এবং দুর্বোধ্য খবর পরিবেশন থেকে বিরত থাকুন

সহজে বোধগম্য একটি খবর সাধারণ মানুষের আচরণ পরিবর্তন এবং মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করতে সাহায্য করে। খবরের বিষয়বস্তু জটিল বা দুর্বোধ্য হলে মানুষের মধ্যে একধরনের আলাদা মানসিক চাপ তৈরি হয়। এ ধরনের খবর ব্যক্তির নিজের জন্য এমনকি তার আশপাশের মানুষের জন্য জটিলতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। মানুষ নিরুৎসাহিতবোধ করে এবং মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়।

উপরে আলোচিত অনির্ভরযোগ্য, বিভ্রান্তিকর, অতিরঞ্জিত, বৈষম্য ও অপবাদমূলক এবং ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশনের কারণে অনেক রোগীর মধ্যেই জেনারালাইজ অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার বা দুশ্চিন্তা রোগ, বিষণ্নতা,

মানসিক চাপ, হতাশা, আতঙ্ক/ ভয়, অনিশ্চয়তাবোধ, নিরাপত্তাহীনতা[৮] ধরনের মানসিক সমস্যা তৈরি করেছে, যা রোগীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটাতে বাধা সৃষ্টি করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, এসব কারণে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মানসিক চাপের কারণে মানুষের ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছে। আবার যখন মানুষ চাপের মধ্যে থাকে, তখন তার মধ্যে কিছু হরমোনের ঘাটতি বা আধিক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চাপমূলক অবস্থায় মানুষের করটিসল লেভেল বহুগুণ বেড়ে যায়, যা তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।[৩৪] আরও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য বা অতিরঞ্জিত তথ্যের কারণে মানুষের মধ্যে প্যানিক বা ভয় তৈরি হয়, যা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে গেছে। পাশাপাশি ক্ষমতাধর কিংবা রাজনৈতিক বা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ সংক্রমণ সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি বার্তা দিয়েছে যে, যারা এরকম বিশেষ জনগোষ্ঠী, তারাই কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সুতরাং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের এ সংক্রমণ থেকে সাবধান এবং সচেতন থাকার কিছু নেই এবং আমরাও আক্রান্ত হওয়া থেকে রেহাই পাব না। এ ধরনের মানসিক পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে একধরনের অবহেলা বা অস্বীকারপ্রবণ মানসিক অবস্থা তৈরিতে ভূমিকা রাখে, যা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা তো রাখেইনি উপরন্তু, সংক্রমণ বৃদ্ধি ঘটাতে অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার মতো অবস্থা তৈরি করেছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মানুষকে একা এবং আলাদা করে দিয়েছে। যে কারণে মানসিক চাপ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যা, হৃদরোগের সমস্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যারা কোভিড-১৯ সংক্রমণের উচ্চঝুঁকিতে ছিলেন, তারা আরও বেশি একা হয়ে গেছেন সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে গিয়ে। এই একাকিত্বের অনুভূতি তাদের মধ্যে আরও বেশি পরিমাণে মানসিক ভীতি, অসহায়ত্ব ও অন্যান্য নেতিবাচক অনুভূতির সম্মুখীন করেছে।[৩৪-৩৭]

ইরানে এমন একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, অ্যালকোহল বা মদপান করলে কোভিড-১৯ ভাইরাস নির্মূল হয়ে যায়। এই তথ্য পরিবেশনের পর দূষিত অ্যালকোহল পান করে ২৭ জন ব্যক্তি মারা যান। এ ঘটনাটি ঘটে বস্তুনিষ্ঠ, সত্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবজনিত কারণে। যদিও এটি বলা যায় যে, মানুষ এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে এই ভুল চর্চাটি করেছে; তথাপিও এক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের পরিচ্ছন্নতা বা ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা ছিল। লকডাউন বা আইসোলেশন বিষয়ে অতিরঞ্জিত এবং ভীতিকর তথ্য মানুষের মধ্যে একাকিত্ব, বিষণ্নতা তৈরি করে। যে কারণে তারা যথাযথ চিকিৎসাসেবা এবং চিকিৎসার নিয়মকানুন অনুসরণ করতে অনাগ্রহী ছিল। এসব কারণেও এই ভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়তে থাকে। এমনকি মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে শুরু করে। এসব কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)[৩৮] গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা ফেসবুক, টুইটার, পিন্টারেস্ট এবং টিকটক– এসব মিডিয়া প্ল্যাটফরমগুলোকে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার এবং প্রসার না ঘটানোর জন্য সচেতন থাকতে বলেছে।

এ ধরনের ভুল চর্চার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তথা আমাদের দেশেও ডিজিজ বার্ডেন বেড়ে গিয়েছে। ডিজিজ বার্ডেন হচ্ছে– একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণের মধ্যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যার প্রভাব, যা কয়েকটি বিষয় দ্বারা নির্দেশিত হয়। যেমন, ওই রোগে কতজন আক্রান্ত এবং কতজন মারা গেল এবং তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কতখানি অর্থনৈতিক ব্যয় সংঘটিত হলো।

কোভিড-১৯ মহামারি বা প্যানডেমিক পৃথিবীব্যাপী একধরনের ইনফোডেমিক বা তথ্য মহামারি তৈরি করেছে।[৬] যা আমাদের সচেতনতা তৈরিতে, সাবধান থাকতে এবং মানসিকভাবে স্বাভাবিক থাকতে একধরনের বড়ো বাধা সৃষ্টি করেছে।

পাশাপাশি এ কথা সত্য যে, কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন অনেক সংবাদকর্মী পথে, মাঠেঘাটে তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনে গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের সবার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম, বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অটুট থাকবে। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারাও অনেক ধরনের মানসিক সমস্যা ও সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছেন। তথাপি দিনরাত কাজ করেছেন। অতএব তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানসিক ভারসাম্য রক্ষা, সাহস জোগানোর বিষয়গুলো অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে, দীর্ঘদিন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের মধ্যকার ভয়/আতঙ্ক এবং জীবনের ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট মানসিক চাপ, অশান্তি, বিষণ্নতা, হতাশা দূর করার জন্য অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের সেবা নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একদিকে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে এবং অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক বা প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এটি আশা করা কোনোমতেই অযৌক্তিক নয় যে, এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। আমরা আশা করতে পারি, প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনাকারীরা এ বিষয়ে যথাযথ নজর দেবেন এবং মনোযোগের সঙ্গে তাদের আন্তরিকতা দিয়ে কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন।

তথ্যসূত্র

1. World Health Organization, (2020). Novel coronavirus (2019-nCoV): Situation report – 8. Retrieved from https:// www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200128-sitrep-8-ncov-cleared.pdfWen, J., Aston, J., Liu, X., & Ying, T. (2020). Effects of misleading media coverage on public health crisis: A case of the 2019 novel coronavirus outbreak in China. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1–6. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1730621
2. https://www.unicef.org/bangladesh/en
3. Frenkel, S., Alba, D. & Zhong, R. Surge of virus misinformation stumps Facebook and Twitter. *TheNewYorkTimes* https://www.nytimes.com/2020/03/08/ technology/coronavirus-misinformation-social-media.html (2020).
4. Wen, J., Aston, J., Liu, X., & Ying, T. (2020). Effects of misleading media coverage on public health crisis: A case of the 2019 novel coronavirus outbreak in China. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1–6. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1730621

5. Yi Zheng, Edmund Goh & Jun Wen (2020) The effects of misleading media reports about COVID-19 on Chinese tourists mental health: a perspective article, Anatolia, 31:2, 337-340, DOI: 10.1080/13032917.2020.1747208
6. Goudsmit, E., & Howes, S. (2017). Bias, misleading information and lack of respect for alternative views have distorted perceptions of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and its treatment. Journal of Health Psychology, 22(9), 1159–1167. https://doi.org/10.1177/1359105317707216
7. Zhao, I. (2020). Coronavirus has sparked racist attacks on Asians in Australia. ABC News. https://www.abc.net.au/ news/2020-02-01/coronavirus-has-sparked-racist-attacks-on-asian-australians/11918962
8. Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S. *et al.* Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nat Hum Behav* 4, 460–471 (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z
9. LeDoux, J. Rethinking the emotional brain. *Neuron* 73, 653–676 (2012).
10. Mobbs, D., Hagan, C. C., Dalgleish, T., Silston, B. & Prévost, C. The ecology of human fear: survival optimization and the nervous system. *Front. Neurosci.* 9, 55 (2015).
11. Cole, S., Balcetis, E. & Dunning, D. Affective signals of threat increase perceived proximity. *Psychol. Sci.* 24, 34–40 (2013).
12. Witte, K. & Allen, M. A meta-analysis of fear appeals: implications for effective public health campaigns. *Health Educ. Behav.* 27, 591–615 (2000).
13. Strunk, D. R., Lopez, H. & DeRubeis, R. J. Depressive symptoms are associated with unrealistic negative predictions of future life events. *Behav. Res. Ther.* 44, 861–882 (2006).
14. Sharot, T. The optimism bias. *Curr. Biol.* 21, R941–R945 (2011).
15. Wise, T., Zbozinek, T. D., Michelini, G., Hagan, C. C. & Mobbs, D. Changes in risk perception and protective behavior during the first week of the COVID-19 pandemic in the United States. Preprint at *PsyArXiv* https://osf.io/dz428 (2020).
16. Centres for Diseases Control and Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
17. Fothergill, A. & Peek, L. A. Poverty and disasters in the United States: a review of recent sociological findings. *Nat. Hazards* 32, 89–110 (2004).
18. Bolin, B. & Kurtz, L.C. Race, class, ethnicity, and disaster vulnerability. in *Handbook of Disaster Research* (eds. Rodríguez, H., Donner, W. & Trainor, J. E.) 181–203 (Springer International Publishing, 2018).
19. Schaller, M. & Neuberg, S. L. Danger, disease, and the nature of prejudice(s). *Advances in Experimental Social Psychology* 46, 1–54 (2012).
20. Feldman, S. & Stenner, K. Perceived threat and authoritarianism. *Polit. Psychol.* 18, 741–770 (1997).
21. Jackson, J. C. et al. Ecological and cultural factors underlying the global distribution of prejudice. *PLoS One* 14, e0221953 (2019).
22. Marcus, G. E., Sullivan, J. L., Theiss-Morse, E. & Wood, S. L. *With Malice Toward Some: How People Make Civil Liberties Judgments*. (Cambridge Univ. Press, 1995).
23. Rich, M. (2020). As coronavirus spreads, so does anti-Chinese sentiments. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/01/30/world/asia/coronavirus-chinese-racism.html
24. Aguilera, J. (2020). Xenophobia is a pre-existing condition. How harmful stereotypes and racism are spreading around the coronavirus. TIME. Retrieved from https://time.com/5775716/xenophobia-racism-stereotypescoronavirus/
25. Evans, A. T. et al. Graphic warning labels elicit affective and thoughtful responses from smokers: results of a randomized clinical trial. *PLoS One* 10, e0142879 (2015).
26. Noar, S. M. et al. Pictorial cigarette pack warnings: a meta-analysis of experimental studies. *Tob. Control* 25, 341–354 (2016).
27. Peters, E. et al. Numeracy and decision making. *Psychol. Sci.* 17, 407–413 (2006).
28. Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E. & MacGregor, D. G. Risk as analysis and risk as feelings: some thoughts about affect, reason, risk, and rationality. *Risk Anal.* 24, 311–322 (2004).
29. Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K. & Welch, N. Risk as feelings. *Psychol. Bull.* 127, 267–286 (2001).
30. Brooks, S. K. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *Lancet* 395, 912–920 (2020).
31. Ellemers, N. & Jetten, J. *Pers. Soc. Psychol. Rev.* 17, 3–21 (2013). The many ways to be marginal in a group.
32. Greenaway, K. H., Jetten, J., Ellemers, N. & van Bunderen, L. The dark side of inclusion: undesired acceptance increases aggression. *Group Process. Intergroup Relat.* 18, 173–189 (2015).
33. Owen, L. Five ways the coronavirus is hitting women in Asia. *BBC News* https://www.bbc.com/news/world-asia-51705199 (2020).
34. Luo, Y., Hawkley, L. C., Waite, L. J. & Cacioppo, J. T. Loneliness, health, and mortality in old age: a national longitudinal study. *Soc. Sci. Med.* 74, 907–914 (2012).
35. Haslam, C. et al. *The New Psychology of Health: Unlocking the Social Cure*. (Routledge, 2018).
36. Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Ann. Behav. Med.* 40, 218–227 (2010).
37. Cacioppo, J.T. & Patrick, W. *Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection*. (Norton, 2009).
38. World Health Organization. 2020b. "Novel Coronavirus (2019-nCoV). situation report - 13." Accessed 10 April 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf.

লেখকঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট

করোনাকালে সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য বনাম বিভ্রান্তিকর তথ্য

বারেক হোসেন

সেই আদি থেকেই সত্য তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের পাশাপাশি পথচলা। কেউ বেছে নিয়েছে সত্য। আর কেউ বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে নিজেদের ফায়দা নিতে। গুহাবাসী অথবা গুচ্ছগ্রামভিত্তিক বসবাস করা মানুষের সত্য কিংবা বিভ্রান্তিকর তথ্য ভৌগোলিক সীমানায় আটকে থাকত। তবে সময় ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে প্রযুক্তি একধাপ এগিয়ে গেছে। পুরো দুনিয়া এখন ইন্টারনেট সংযুক্ত মুঠোফোনের দখলে। সেই মুঠোফোন আবার সোশ্যাল মিডিয়ার মায়ায় আচ্ছন্ন।

“সময় ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে প্রযুক্তি একধাপ এগিয়ে গেছে। পুরো দুনিয়া এখন ইন্টারনেট সংযুক্ত মুঠোফোনের দখলে। সেই মুঠোফোন আবার সোশ্যাল মিডিয়ার মায়ায় আচ্ছন্ন”

করোনা সংকটকালে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণ। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্যের পাশাপাশি ভুল তথ্য এবং ভুয়া খবর ভাইরাসের মতোই ছড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ফেসবুক, ইউটিউব, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ভিকে, টুইটারসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যদিও গুগল, ফেসবুকসহ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া মোগলরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে উদ্যোগ নিয়েছে। তারপরও এসব মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো বন্ধ

হয়নি। কিছু কিছু গণমাধ্যম আবার গুগল থেকে আয়, লাইক ও বিজ্ঞাপন পেতে ডিজিটাল এসব মাধ্যম ব্যবহার করছে। ফলে 'গুজবের বাণিজ্য' থামছে না।

তবে ভুল তথ্য ছড়ানোর বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই সমস্যাকে 'ইনফোডেমিক' বলে অভিহিত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া তথ্য মানুষের কাছে কেন এত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে? মূলধারার গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকাশের ব্যর্থতার কারণেই কি সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ত্বরান্বিত হচ্ছে?

যাই হোক, এই সময়ে 'সোশ্যাল মিডিয়া বনাম গণমাধ্যম' একটি বড়ো বিতর্কের বিষয়। সারাবিশ্বেই এখন সোশ্যাল মিডিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে নানা দেশে এমনকি প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও এটি বড়ো প্ল্যাটফরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া কি মূলধারার গণমাধ্যমের সমান্তরাল কিংবা বিকল্প মাধ্যম হতে পেরেছে? এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত সময়ের হাতে। তবে এর কাঠামো বিকল্প ধারার– এটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্য ও সোশ্যাল মিডিয়া

সময়টা সোশ্যাল মিডিয়ার। এই মিডিয়াকে বলা হয় তথ্যের সাগর। এখানে সহজে তথ্য ও মতামত দেওয়া যায়। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। সেই দায়িত্বের অংশই হচ্ছে প্রতিনিয়ত নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া। করোনার সময় পুরো দুনিয়ায় সহজে দ্রুত খবর পৌঁছে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। করোনা প্রতিরোধের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ব্যবহারকারীর ভৌগোলিক অবস্থানের তথ্য জানিয়ে প্রতিনিয়ত সতর্কবার্তা দিয়েছে ফেসবুক। করোনার উপসর্গ, স্থায়িত্ব, পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের বিষয়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করেছে। একই সঙ্গে ফেসবুক করোনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের বিষয়ে সতর্ক করেছে। বিভিন্ন দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা এবং করোনা আপডেট দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সময়টা সোশ্যাল মিডিয়ার। এই মিডিয়াকে বলা হয় তথ্যের সাগর। এখানে সহজে তথ্য ও মতামত দেওয়া যায়। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুদায়িত্ব পালন করেছে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে মহামারি ঘোষণা করার পর থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে সঠিক তথ্য বিতরণ এবং ভুল তথ্যের বিস্তার রোধে কাজ করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। এটির জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করছে ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রাম। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের নিউজ ফিডের শুরুতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ব্যবহারকারীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য ফেসবুকসহ অন্য প্ল্যাটফরমে বিনামূল্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ দিয়েছে।

বিশ্বের প্রায় এক বিলিয়ন ব্যবহারকারী ফেসবুকের বিভিন্ন প্ল্যাটফরম থেকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি গ্রাহক সরাসরি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লিঙ্কে ক্লিক করে তাদের পরামর্শ পেয়েছে। করোনা সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারের জন্য ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ 'তথ্যকেন্দ্র' চালু করেছে।

বিভ্রান্তিকর তথ্য ও সোশ্যাল মিডিয়া

করোনাবিষয়ক ভুল তথ্য ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। যার কারণে হানাহানি, অগ্নিসংযোগ এমনকি প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটেছে। গুজব, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক ভুয়া খবরের কারণে পরোক্ষ অনেক ক্ষতি হয়, যার প্রভাব অনেক ব্যাপক ও গভীর।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে আবার অসচেতনতায়ও ভুল তথ্য শেয়ার হতে পারে। এখানে সাঁচিকরণের সুযোগ সীমিত। ডিজিটাল উৎস থেকে প্রতিদিন বিশ্বাসযোগ্যভাবে ভুল তথ্য কোটি কোটি মানুষের কাছে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বর্তমান ডিজিটাল সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্তও ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সচেতন মানুষমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন, এটির ভয়াবহতা। আর এসব ইচ্ছাকৃত গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক তৈরিতে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো সাইট ব্যবহার করা হয়। তবে রোগ নিয়ে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সঠিক তথ্যের চেয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য সব সময় বেশি জনপ্রিয়।

সঠিক তথ্য প্রচারের পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর তথ্য ঠেকাতে কাজ করছে ফেসবুক। এজন্য ২০১৮ সালে প্রণীত নিজেদেরই এক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে প্রতিষ্ঠানটি। ওই বছর নিজস্ব অ্যালগরিদম ব্যবহার করে পাকিস্তানে পোলিও সংক্রান্ত গুজব বিস্তার সামাল দিয়েছিল ফেসবুক। একই অ্যালগরিদম ব্যবহার করে করোনা সংক্রান্ত গুজব ঠেকিয়েছে ফেসবুক।

ভুল তথ্য বা গুজব এমন নজরে আসা প্রায় সব ধরনের পোস্ট ইতোমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে ফেসবুক। চলতি বছরের এপ্রিলে এ ধরনের ৪০ কোটি ভুয়া পোস্ট বা খবর খুঁজে বের করে ফেসবুক। নতুন এক ফিচারের মাধ্যমে যে কেউ এ কাজটি করতে পারবে। ফিচারটির নাম 'গেট দ্য ফ্যাক্ট'। একইভাবে আগস্টে করোনা নিয়ে গুজবের ৭০ লাখ পোস্ট সরিয়ে দেয় ফেসবুক।

ফ্যাক্ট চেকিং অংশীদাররা যেসব পোস্ট 'অসত্য' বা 'ভুল' বলে চিহ্নিত করে, সেসব পোস্টের বিস্তার প্রথমেই সীমিত করে দেয় ফেসবুক। একই সঙ্গে এসব পোস্ট যেসব ব্যবহারকারী দেখেছেন, তাদের সতর্ক করার পাশাপাশি সেগুলো যদি কেউ শেয়ার করে থাকেন তবে শেয়ারকারীকেও বার্তা ও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সতর্ক করে ফেসবুক। এ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রুপ চ্যাট বা প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমেও যেন গুজব না ছড়ায়, সেজন্য একটি আইডি থেকে বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট করা এবং বিভিন্ন চ্যাট গ্রুপে বার্তা পাঠানোর সংখ্যাও সীমিত করে দিয়েছে ফেসবুক।

করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় ২০০ কোটি ইউজার করোনা নিয়ে একাধিক বার্তা শেয়ার করছেন। ফলে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে ভুয়া মেসেজ ও গুজব। ভুল তথ্য প্রচার কমাতে বিশ্বের প্রায় ৬০টি তথ্য অনুসন্ধান সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে ফেসবুক। বিশ্বের প্রায় ৫০ ভাষার ফেসবুক পোস্ট যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এই কাজ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। ফেসবুক প্রতি হাজারে ১০০টি করে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত ভুল তথ্য সরিয়ে ফেলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া যুগে মহামারি

পৃথিবীজুড়ে সর্বশেষ মহামারি এসেছিল ১০০ বছর আগে। এটি ছিল স্প্যানিশ ফ্লু। তবে ডিজিটাল দুনিয়ায় করোনাই প্রথম মহামারি। এটি পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তবে গত দুই দশকে কমপক্ষে তিনটি নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক মহামারি দেখা দিয়েছে। ২০০৯ সালের সোয়াইন ফ্লু, ২০১৪ সালের ইবোলা ভাইরাস এবং জিকা ভাইরাস। এসব নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক তথ্যও আছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে ১০ বছর আগে বেশির ভাগ সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করা অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে দেওয়ার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ ছিল না। মহামারির এই সময়ে সবাই সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ায় দিকনির্দেশনা খুঁজতে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ অনানুষ্ঠানিক ও অনির্ভরযোগ্য তথ্য পায়।

আধুনিক সমাজে তথ্য উৎপাদন ও প্রচারে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা প্রভাব রয়েছে। করোনা মহামারিতে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য খোঁজার হাতিয়ার।

মানুষ একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা বলছে মৌখিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। মিথ্যা সব সময় সত্যের তুলনায় দ্রুত ছড়ায়। ভাইরাসজনিত মহামারি তথ্যের সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য প্রচার ভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে এবং উদ্‌বেগ নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করে। ভুল তথ্য মোকাবিলায় এবং শনাক্তকরণে সোশ্যাল মিডিয়ার এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে আশার কথা, তাদের চেষ্টার কমতি নেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক নিউজ ও গুজব

বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব বিষয় ভাইরাল হয় সেগুলো আদৌ সত্য কি না, তা যাচাই করে দেখে বিডি ফ্যাক্ট চেক এবং বুম বাংলাদেশ নামে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু থেকে ৯০টি ভাইরাল খবর যাচাই করে এসব প্রতিষ্ঠান দেখেছে 'সেসব ভাইরাল খবর সত্য নয়'। করোনা সংকটের সময় দেশে ও বিদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক নিউজ এবং গুজবের ছড়াছড়ি দেখা গেছে। এসব নিয়েই আলোচনার চেষ্টা–

* মার্চ থেকেই করোনা থেকে সুরক্ষার নামে ছড়িয়ে পড়ছে একের পর এক গুজব। খবরের কাগজের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায় এমন গুজব সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক পাঠক পত্রিকা নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। বাড়ির দরজার পাশ খুঁড়লেই পাওয়া যাবে সুরমা এবং তা ব্যবহার করলে করোনা থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে। এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নে পাওয়া ধাওয়া-চায়ের সঙ্গে গোলমরিচ খেলে করোনাভাইরাস স্পর্শ করতে পারবে না। এমন গুজবে অনেকে গোলমরিচ-চা পান শুরু করেন।
* 'মুসলমানদের জন্য করোনাভাইরাস কোনো আতঙ্কের কারণ নয়, বরং কাফেরদের প্রতি চরম গজব, করোনাভাইরাস হলো দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষীদের জন্য এক কঠিন গজব, ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই, ছোঁয়াচে রোগ বিশ্বাস করা হারাম।' এমন গুজব নিয়ে ইউটিউব, ফেসবুকের আধেয় ভাইরাল হতে দেখা গেছে। বিভিন্ন ইসলামপন্থি নামধারী ভুয়া সংগঠন ভুয়া খবর ছড়িয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে চীনের প্রেসিডেন্ট দেশটির বিভিন্ন মসজিদে যাচ্ছেন এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।
* মুসলিম ধর্মাবলম্বী উইঘুরদের ওপর চীনের অত্যাচারের কারণে অতিলৌকিক শক্তির প্রদত্ত শাস্তি হিসেবেই দেশটিতে করোনাভাইরাস ছড়াচ্ছে– ফেসবুকে নিজেদের এমন বিশ্বাসের কথা প্রচার করেছেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, বাদুড়ের স্যুপ খেতে গিয়ে চীনের মানুষের শরীরে এসেছে করোনাভাইরাস। কেউ বলেছে, দেশটির মানুষের সাপ খাওয়ার অভ্যাস থেকেই ছড়িয়েছে রোগটি।
* সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হচ্ছে– রসুন, লবঙ্গ, গরম পানি ও আদা-জল খেলে করোনাভাইরাস ভালো হয়। অথচ এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো গুজবের কারণে ভারতে ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ইরানে ঘটেছে গণহারে বিষপ্রয়োগ। যুক্তরাজ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ায় ফাইভজি মোবাইল ফোন করোনাভাইরাসের জন্য দায়ী। ফলে যুক্তরাজ্যসহ কিছু দেশে ফোনের টাওয়ারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।
* ম্যালেরিয়ার ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দিয়ে কোভিড সারানো যায়– এমন ভুল তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে। গাড়ি নির্মাতা টেসলার প্রধান এলন মাস্ক, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো, এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও এটা নিয়ে কথা বলেছেন। ট্রাম্প তার টুইটে করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন একসঙ্গে খাবার কার্যকারিতা নিয়ে কথা বলেন। মে মাসে হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'এটা খেয়ে দেখুন, আপনার হারানোর তো কিছু নেই।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তিনি নিজেও হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাচ্ছেন। আমেরিকানদের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি ভারতের ওপর রীতিমতো পেশি দেখিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব মন্তব্য এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়।

* মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ছাড়াও আরও কিছু কোভিড চিকিৎসার জল্পনা ছড়িয়েছেন। এপ্রিলের শেষদিকে তিনি বলেন, অতিবেগুনি রশ্মি দিয়ে করোনাভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে। তিনি বলেন, জীবাণুনাশক তো এক মিনিটের মধ্যে এ ভাইরাস মেরে ফেলতে পারে। এমন কোনো ব্যবস্থা কি করা যায় যাতে এরকম কোনো ইনজেকশন বা কিছু একটা দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার করা যেতে পারে? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরে বলেন, তিনি ঠাট্টার সুরে এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার এসব কথার পর অনেক আমেরিকান জীবাণুনাশক সাবান পান করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।
* সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা সারাতে অ্যালকোহল কার্যকর– এমন গুজব ছড়ানোর পর ইরানে মদ্যপানজনিত বিষক্রিয়ায় অনেক লোক মারা গেছেন। এপ্রিলে ভারতের দিল্লিতে তিনজন মুসলিমকে তিনটি আলাদা ঘটনায় পেটানো হয়। এর আগে গুজব ছড়ায়, মুসলিমরা ভারতে ভাইরাস ছড়াচ্ছে। এ নিয়েই পূর্ব ভারতের সিসাই গ্রামে দাঙ্গায় একজন নিহত হয়।
* ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ড শহরে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গুজব ছড়ায় অশ্বেতাঙ্গ করোনা রোগীদের মারা যেতে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের ইন্দোর শহরে একদল ডাক্তার করোনা আক্রান্ত লোকদের চিহ্নিত করতে গেলে তাদের ওপর পাথর দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। এর আগে হোয়াটসঅ্যাপে বিভ্রান্তিকর ভিডিয়ো ছড়ায়, চিকিৎসাকর্মীরা স্বাস্থ্যবান মুসলিমদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং ইনজেকশন দিয়ে তাদের দেহে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে।
* গরম পানি খেলে বা শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে ভাইরাস সেরে যায়– এমন গুজব ছড়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভারতে গুজব ছড়ায়– সাপের তেল খেলে করোনা ভালো হবে। করোনাভাইরাস জানালা দিয়ে বের হতে পারে– এরকম গুজবে তেজগাঁওয়ে প্রস্তাবিত একটি করোনা হাসপাতালের কাজ শুরুর সময় এলাকার একদল মানুষ এসে হামলা চালায়। রাজধানীর একটি কবরস্থান করোনা আক্রান্তদের মৃতদেহের জন্য নির্ধারণ করার পর সেখানকার শিক্ষিত মানুষরা ব্যানার টানিয়ে এর বিরোধিতা করেছে। বলা হলো, কবরের মাটি ভেদ করেও করোনা ছড়াতে পারে। মানে মৃতদেহও করোনা ছড়াবে।

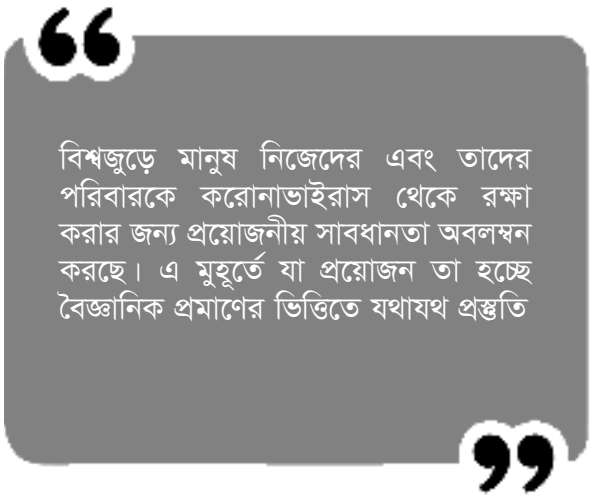

  * ট্রলারযোগে গ্রামের বাড়ি বরগুনা ফেরার পথে হামলার শিকার হয়েছেন পাঁচটি পরিবারের সদস্যরা। ট্রলারে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির লাশ আছে, মসজিদের মাইকে এমন গুজবের ঘোষণা দিলে নদীর এক পারের অত্যুৎসাহী মানুষের ছোড়া ইটপাটকেলের আঘাতে ট্রলারের পাঁচ যাত্রী আহত হন।
  * ডিমের মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায়– এই গুজবের পর ভারতে মুরগি ও ডিম বিক্রি ৫০ ভাগ কমে যায়। দাম কমে ৭০ ভাগ। আমেরিকার মতো জায়গায়ও গুজব রটে– করোনাভাইরাস ঠেকানোর জন্য রয়েছে ভিটামিন, তেল এবং বিশেষ ধরনের চা। অথচ এটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। এমনকি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা থেকেও করোনা চিকিৎসা বিষয়ে ইমেইল যাচ্ছে মার্কিন নাগরিকদের কাছে, যেগুলো মিথ্যা। হ্যাকাররা সংস্থাগুলোর কম্পিউটার হ্যাক করে বিভিন্ন গুজব ছড়াচ্ছে।
* মার্চের প্রথমদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুজব ছড়িয়েছিল– থানকুনি পাতা খেলে করোনাভাইরাস আক্রমণ করতে পারবে না। একজন পীরের বরাত দিয়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে এই গুজব। আরও একটি চাঞ্চল্যকর গল্প সোশ্যাল মিডিয়ার সব প্ল্যাটফরমে জায়গা পেয়েছিল– করোনা হচ্ছে বিশ্বমোড়লদের জীবাণু-অস্ত্র পরীক্ষার ভয়ংকর ফল!

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য বিষয়ে ইউনিসেফের ভাষ্য

বিশ্বজুড়ে মানুষ নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করছে। এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে যথাযথ প্রস্তুতি।

যদিও অনেকে ভাইরাস এবং এর বিরুদ্ধে কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যাবে, সে সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করছেন, তবে এই তথ্যের মধ্যে সামান্যই উপকারী বা নির্ভরযোগ্য। স্বাস্থ্যজনিত সংকটের সময়ে ভুল তথ্য আতঙ্ক ও ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে মানুষ ভাইরাস থেকে অরক্ষিত থেকে যেতে পারে অথবা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আরও বেশি ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ইউনিসেফের সঙ্গে সম্পর্কিত দাবি করে সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি ভাষায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভ্রান্ত অনলাইন বার্তায় অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে এটাও নির্দেশ করা হয় যে, আইসক্রিম এবং অন্যান্য ঠান্ডা খাবার এড়িয়ে চললে তা এই রোগ ঠেকাতে সহায়ক হতে পারে। এটি অবশ্যই, পুরোপুরি অসত্য।

এই ধরনের মিথ্যাচার যারা সৃষ্টি করছেন, তাদের প্রতি ইউনিসেফের বার্তা হলো– থামুন। ভুল তথ্য শেয়ার করা এবং আস্থাভাজন অবস্থানে থাকা কারও নামের অপব্যবহার করে কর্তৃত্বের সঙ্গে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বিপজ্জনক ও ভুল।

জনসাধারণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনাকে ও আপনার পরিবারকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে হবে সে সম্পর্কিত সঠিক তথ্য ইউনিসেফ বা ডব্লিউএইচও, সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও বিশ্বস্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মতো যাচাইকৃত উৎস থেকে অনুসন্ধান করুন। অবিশ্বস্ত বা যাচাইকৃত নয় এমন উৎস থেকে তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনদের কীভাবে নিরাপদে রাখতে হবে, এ সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য ঠিক কোথায় যেতে হবে, তা জানা আজকের তথ্যসমৃদ্ধ সমাজে কঠিন হতে পারে না। তবে আমরা নিজেদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখার জন্য যে ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করি, তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রেও এর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের ঠিক সেই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক তথ্য ও উপদেশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসত্য তথ্য ছড়িয়ে পড়ার সময় জনসাধারণকে সে সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন ও টিকটকের মতো অনলাইন অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে ইউনিসেফ ভাইরাস সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দিতে সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও তথ্যের রকমারি উৎস

তথ্যের অনেক উৎস রয়েছে। তবে বিশ্বাসযোগ্য উৎসগুলোয় মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে সোশ্যাল মিডিয়া জনপ্রিয় হয়েছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রচলিত গণমাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্থানীয় সমস্যা প্রকাশিত হয়। সেই প্রচারণার মাধ্যমে বৈশ্বিক সচেতনতার সুযোগ হচ্ছে।

করোনা মহামারির তথ্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকেন্দ্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বেশির ভাগ স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা অনলাইন প্ল্যাটফরমে নিয়মিত সচেতনতা এবং পরামর্শমূলক আপডেট দিয়েছে। গুগল স্কলার শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল জার্নাল এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত অন্য সাইটগুলোকে হাইলাইট করেছে। টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো নির্দিষ্ট করে যে ব্যক্তিরা করোনাভাইরাস সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করে তাদের সেসব তথ্য নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা, চিকিৎসক এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবকরা অনলাইন ট্র্যাফিক বিশ্বস্ত উৎসের দিকে পরিচালন করছে। মানুষকে সময়মতো যথাযথ তথ্য সরবরাহ করতে এবং ভুল তথ্য অপসারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফেসবুক, পিন্টারেস্ট, টুইটার, টেনসেন্ট এবং টিকটকের সঙ্গে কাজ করছে।

ভুল তথ্য কিংবা গুজব বুঝতে হলে তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে– বিশ্বাস, অবিশ্বাস এবং বিবেচনাধীন। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে না চাইতেই প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে অগণিত তথ্য। এসব তথ্য সত্য নাকি মিথ্যা, এটা নিশ্চিত হতে না পারলে বিবেচনাধীন রাখতে হবে। করোনার ভুয়া খবর এড়ানোর কৌশল হচ্ছে খবরের উৎসের সন্ধান করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য এই বিষয়ের স্বীকৃত বিশেষজ্ঞরা দিয়ে থাকেন। বিভ্রান্তি এড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার নাম-পরিচয়হীন উৎসের ওপর নির্ভর করা যাবে না।

একাধিক ভালো উৎস থেকে যদি পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়, তখন কী করণীয়? তখন ধৈর্য ধরতে হবে, সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখতে হবে। অথবা নিজের কাণ্ডজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনলাইনে খবরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের আরেকটা ভালো উপায় খবর পরিবেশনের ধরন খেয়াল করা। ভালো মানের সংবাদ প্রতিবেদনে সংবাদের উৎস উল্লেখ করা থাকে এমনভাবে যে, আপনি চাইলে নিজে সরাসরি উৎস থেকে খবরটার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারবেন।

সঠিক তথ্য জানার জন্য অদম্য ইচ্ছে থাকতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজ ফিডে আসা অনেক পোস্ট আমরা যাচাই না করেই বিশ্বাস করে ফেলি। আসলে ছাপার অক্ষরে কিংবা কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনে যা থাকে, তার সবই সত্য নয়। ভুয়া খবর চেনা কখনো সহজ, কখনো বেশ কঠিন। সে কারণে উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও কখনো কখনো ভুয়া খবর শেয়ার করতে দেখা যায়। কাজটা সহজ না হলেও সাধ্যমতো ভুয়া খবর ও গুজব এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যদিও গুজবের উৎস খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার মাঝেমধ্যে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভুল তথ্য এবং ভুয়া খবর নানাভাবেই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এটির প্রভাবে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে বিপর্যয়। তথ্য শেয়ার করার আগেই 'ক্রস চেক' করে নিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের সচেতন, সজাগ ও পর্যবেক্ষণ মননের হতে হবে। খবর শেয়ারের আগে চিন্তা করা এবং খবরের উৎস নিশ্চিত হতে হবে। কেননা একটি ভুল খবর সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাণও কেড়ে নিতে পারে। গুজব ঠেকাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু শেয়ার করার আগে যাচাই করে নিন। একটু সতর্ক হলেই এই যাচাই প্রক্রিয়া গোছালো হবে। যে অ্যাকাউন্ট থেকে তথ্য বা খবর শেয়ার করতে চান, সেটি একটু স্টাডি করলেই বুঝতে পারবেন ওই অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীর তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না। তবে এই যাচাই-বাছাইয়ের ইচ্ছে এবং দক্ষতা সবার থাকে না। বাস্তবতা হলো, বেশির ভাগ মানুষ গুজবে কান দিতে ভালোবাসেন। অনেক শিক্ষিত লোকও গুজবে কান, মাথা– সবই ঢুকিয়ে দেন। সম্ভবত গুজব ও ভুয়া তথ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার ভালো উপায়– যত পারেন সঠিক তথ্য প্রচার করুন।

তথ্যসূত্র

* Monitoring, B. (2020). China coronavirus: Misinformation spreads online about origin and scale. (B. Trending, Producer) Retrieved From : https://www.bbc.com/.
* Cellan-Jones, R. (2020). Tech Tent: Is social media spreading the virus? Retrieved From: https://www.bbc.com/.
* Brindha, Jayaseelan, Kadeswara (2020). Social Media Reigned by Information or Misinformation about COVID-19: A Phenomenological Study. https://www.researchgate.net
* Chakrabarti, S., Rooney, C. & Kweon, M. (2018). Verification, Duty, Credibility: Fake News and Ordinary Citizens in Kenya and Nigeria. London: BBC News. Retrieved From : http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/bbc-fake-news-research-paper-nigeria-kenya.pdf
* Soltaninejad, K. (2020). Methanol mass poisoning outbreak, a consequence of COVID-19 pandemic and misleading messages on social media. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 11(3)
* Stechemessera, Wenza, Levermanna (2020). Corona crisis fuels racially profiled hate in social media networks. https://www.thelancet.com/action/showPdf

লেখক: সহকারী প্রশিক্ষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

করোনাকালীন গণমাধ্যমে স্প্যানিশ ফ্লুর শিক্ষা

সারতাজ আলীম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষের পথে। কিছু মার্কিন সেনা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আবার অল্পকিছু সেনাকে নতুন করে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হচ্ছে। মিত্রপক্ষের সেনা এবং রাজনীতিকরা বেশ উল্লসিত। তারা জার্মানিকে হারাতে চলেছে। পৃথিবীতে আবার তাদের শাসন বলবৎ হবে। কিন্তু তারা জানত না বাড়িতে তাদের জন্য এক নতুন শত্রু অপেক্ষা করছে।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপের ঝামেলার মধ্যে নিজেদের জড়াতে না চাইলেও জার্মানি সাবমেরিন আক্রমণ করে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ফলে যুদ্ধে যোগ দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

> “সেখানে ১৯১৮ সালের মার্চের শুরুতে প্রথমে এক সৈন্য জ্বর নিয়ে ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রথমে গুরুতর কিছু মনে হচ্ছিল না। এর কয়েক ঘণ্টার মাথায় আরও শতাধিক সেনা একই কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়”

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তুলনামূলক ছোটো ছিল। কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কয়েক মাসের মাথায় তারা বিশাল এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে, যার মধ্য থেকে প্রায় দুই মিলিয়ন সেনা ইউরোপে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়।

বিশাল সৈন্যবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদেই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে

নতুন সেনা ক্যাম্প তৈরি করে। এর মধ্যে একটি ছিল কানসাসের ফোর্ট রাইলি। সেখানে নতুন সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ক্যাম্প ফান্সটন তৈরি করা হয়।

ক্যাম্প ফান্সটনে মোট ৫০ হাজার সেনার প্রশিক্ষণ এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ১৯১৮ সালের মার্চের শুরুতে প্রথমে এক সৈন্য জ্বর নিয়ে ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রথমে গুরুতর কিছু মনে হচ্ছিল না। এর কয়েক ঘণ্টার মাথায় আরও শতাধিক সেনা একই কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুরু হয় মৃত্যুও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া দেশগুলোর সরকার তাদের সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেনও ছিল। সরকারের অনুমতি ছাড়া সেসব দেশের সংবাদমাধ্যম সংবেদনশীল কোনো খবর প্রকাশ করতে পারত না।

১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে যোগ দেয়। এর চারদিন পর ৮ আগস্ট Defence of the Realm Act নামে এক আইন জারি করে সেই দেশের সরকার। এই আইনের একটি ধারায় ব্রিটিশ সরকার সংবাদমাধ্যমের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ফলে শুধু যুদ্ধের খবর নয়, যে কোনো খবর প্রকাশ করতেই অনুমোদন লাগত। এমনকি ব্রিটেনের বড়ো বড়ো কয়েকটি পরাজয় এবং লক্ষাধিক সেনার মৃত্যুর ঘটনাও প্রথমে প্রকাশ পায়নি। এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সবমিলে ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল সেসময়। মার্কিন সরকারও Espionage Act of 1917 এবং Sedition Act of 1918 আইন দিয়ে গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরে। যুদ্ধবিরোধী কথা বলায় আটকও করা হয় কয়েকজনকে। আমেরিকান ডাক্তাররা বিশেষ করে ফিলেডেলফিয়ার ডাক্তাররা পত্রিকার সম্পাদকদের অনেক অনুরোধ করেন যেন তারা এই ফ্লু নিয়ে খবর ছাপেন; কিন্তু তাদের কথা পাত্তাই দেয়নি কেউ। বরং শহরে এক প্যারেডের আয়োজন করা হয়। ডাক্তাররা ততদিনে বুঝতে পেরেছেন এই রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে। তাই তারা প্যারেড বাতিলের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান। অসফল হয় তারা। প্যারেড হয়। সেখান থেকে ভয়াবহভাবে ছড়ায় ভাইরাসটি। প্যারেডের ৭০ শতাংশ মানুষ পরবর্তী ছয় মাসের মাঝে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সেজন্য এটিকে বলা হয় মৃত্যু বা ডেথ প্যারেড। গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে একই পথে হেঁটেছিল কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া।

> মহামারি ঠেকিয়ে দেওয়ার অন্যতম বড়ো অস্ত্র হলো সচেতনতা। সরকার তার সেরা পদক্ষেপ নেওয়ার পরও যদি দিনশেষে জনগণ সচেতন না হয়, তাহলে মহামারি রোধ করার কোনো উপায়ই থাকে না

গণমাধ্যমের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে বিভিন্ন সময় পরাজয়ের খবর ঠিকই এড়াতে পেরেছিল মিত্রশক্তি। কিন্তু এটা এক নতুন বিপদ ডেকে আনে। স্প্যানিশ ফ্লুতে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পরও কেউ এটা নিয়ে প্রথমে কোনো খবর ছাপছিল না। এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজে অসুস্থ থাকার পরও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান খবর ছাপায় 'বৃষ্টিতে ভিজে প্রধানমন্ত্রীর হালকা জ্বর এসেছে।'

মহামারি ঠেকিয়ে দেওয়ার অন্যতম বড়ো অস্ত্র হলো সচেতনতা। সরকার তার সেরা পদক্ষেপ নেওয়ার পরও যদি দিনশেষে জনগণ সচেতন না হয়, তাহলে মহামারি রোধ করার কোনো উপায়ই থাকে না। কিন্তু পশ্চিমাদের মিডিয়া সেন্সরশিপের ফলে মহামারি হচ্ছে এমন খবরই কেউ জানতে পারল না। এদিকে মার্কিন সেনারা ভাইরাস বয়ে নিয়ে গেল ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে। ব্রিটিশরা তখন সারাবিশ্বের রাজত্ব করছে। আমেরিকানদের থেকে ছড়াল ব্রিটিশদের মাঝে। আর ব্রিটিশরা রোগ বয়ে নিয়ে গেল তাদের কলোনিগুলোয়। এ ছাড়াও মহামারিতে ইতোমধ্যে আক্রান্ত এলাকার অভিজ্ঞতা অনাক্রান্ত এলাকার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তারা মহামারিকালীন কীভাবে চলছে, কীভাবে ভাইরাসকে মোকাবিলা করছে, কীভাবে চিকিৎসার চেষ্টা করছে বা একটু সফল হচ্ছে– এসব খবর সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া গণমাধ্যমেরই কাজ। শুধু জনগণ নয়, খবরে পশ্চিমে ছাপানো এক টুকরো বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে উপমহাদেশের একজন বিজ্ঞানী গবেষণা করে আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু গণমাধ্যমকে রুদ্ধ করায় কেউ কিছু আগে থেকে জানতে পারল না। এভাবেই ব্যাপক আকার ধারণ করে স্প্যানিশ ফ্লু।

আমাদের উপমহাদেশেও ১৩-১৭ মিলিয়ন মানুষ মারা যান। ধারণা করা হয়, কলকাতার জোড়াসাঁকোতে কবিগুরুর বাড়িতেও হানা দিয়েছিল এই ভাইরাস। কত মানুষ মারা যায়, তার প্রকৃত সংখ্যা অনিশ্চিত। মহামারির বৈশিষ্ট্য হলো শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে এটা বলা যাবে না কত লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং কত লোক মারা গিয়েছে। স্প্যানিশ ফ্লু বা ব্ল্যাক ডেথ যে কোনো মহামারির casualties মাপার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হিসাব করা হয়।

স্পেন যেহেতু যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকায় ছিল, তাই তাদের সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফলে রাজা ত্রয়োদশ আলফানসো এবং তার মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য যখন ভাইরাসে সংক্রমিত হন, তখন স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সেই খবর সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। বলে রাখা ভালো, তখনও কিন্তু স্প্যানিশ ফ্লু তার নাম পায়নি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে তখন ইউরোপে

প্রথমবারের মতো এই ভাইরাসের কথা শোনা যায়। যদিও এর আগেই ইউরোপে ভাইরাসটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্রিটেন, ফ্রান্স কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চায়নি তাদের জনগণ নিজ দেশে এমন রোগের কথা জানতে পারুক। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের যুদ্ধের যৌক্তিকতাকে ধরে রাখার জন্য তারা এই খবর গোপন করেছিল। এরপর স্পেনের সংবাদপত্র যখন তাদের রাজার অসুস্থ হওয়ার খবর প্রকাশ করে, তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতারা ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হিসেবে স্পেনের নাম ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে। ফলে তখন ভাইরাসটি হয়ে যায় 'স্প্যানিশ ফ্লু'।

কিন্তু স্প্যানিশরা জানতেন তারা এই ভাইরাসের জন্য দায়ী নন। এই ভাইরাস ছড়ানোর জন্য তারা ফ্রেঞ্চ সেনাদের সন্দেহ করেছিল। কিন্তু তাদের হাতে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিল না। তখন তারা এই মিথ্যা অপবাদ ঘুচানোর জন্য অভিনব এক উপায় বের করে। রাজধানী মাদ্রিদের জারজুয়েলা থিয়েটারে ডন জুয়ানের একটি মিথ মঞ্চায়নের সময় 'দ্য সোলজার অব নেপলস' নামে একটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়। যে গানটি সেই ভাইরাসের মতোই দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে স্প্যানিশরা ভাইরাসটিকে 'সোলজার অব নেপলস' নাম দেয়। আস্তে আস্তে খবর ছাপতে শুরু হলে সবাই ঘটনা বুঝতে পারে; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী স্প্যানিশ ফ্লুর ভয়াবহতা ছড়ানোর জন্য দায়ী যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুদ্ধে অংশ নেওয়া দেশগুলো, যারা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ভ্যাকসিন ও অ্যান্টিবায়োটিকের পূর্ববর্তী সময়ে রোগ ছড়ানো ছিল খুবই সাধারণ এক বিষয়। এর মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা সত্য জানার পরও গোপন রেখেছিল, যা এই ভাইরাসকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।

যুদ্ধের ময়দানে বুলেটের আঘাতে যত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, এর চেয়ে বেশি নিরপরাধ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এক ভাইরাস আর যুদ্ধের জন্য করা এক আইনের কারণে। যুদ্ধ পরিহার করা উচিত। তবে এর থেকে বেশি দরকার যেটা আসলেই ঘটছে সেই সত্যিটা জানানোর। ১৯১৮ সালে সত্যিটা জানলে অনেক প্রাণ রক্ষা হতে পারত। দুঃখের বিষয়, আজ গণমাধ্যম স্বাধীন প্রশ্নে যারা সব থেকে সোচ্চার, তারাই একসময় গণমাধ্যমকে ভয়াবহ নিয়ন্ত্রণ করত। হয়তো শিক্ষা নিয়েছে তারা!

১৯১৮ সালের সেই স্প্যানিশ ফ্লু থেকে শিক্ষা নিয়েছে সবাই। আর তাই আজকের করোনাকালীন গণমাধ্যমকে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় না। করোনার জন্মস্থান চীন প্রথমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও পরে বুঝে যায় তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে মহামারির মতো জিনিসকে লুকিয়ে রাখা খুব কঠিন।

করোনা যত দ্রুত না ছড়িয়েছে, তার থেকে দ্রুত মানুষের কাছে করোনার সংবাদ পৌঁছেছে। এতে সাময়িক সময়ের জন্য মানুষ ভীতিবোধ করলেও নিজেকে আসন্ন মহামারির জন্য নিজেকে প্রস্তুত এবং সচেতন করে তোলার সময় পেয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচক সংবাদ মানুষকে আশা জুগিয়েছে। যেমন– গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ জানছে অন্য যে কোনো রোগের চেয়ে করোনার ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি আসছে। উহানের মানুষের দৈনন্দিন জীবন বা ভাইরাস প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাদের খাদ্যাভ্যাসের মতো বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যম তুলে ধরায় মানুষ দ্রুত নিজেদের আসন্ন যুদ্ধের জন্য একটু হলেও প্রস্তুত করতে পেরেছে। এই একটুখানি প্রস্তুতির জন্য করোনা মহামারিতে স্প্যানিশ ফ্লুর থেকে মৃত্যুর হার অনেক অনেক হবে– এমন বার্তাই দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি।

আর তাই বলা যায়, স্প্যানিশ ফ্লুর শিক্ষা সরকার এবং গণমাধ্যম ভালো মতোই কাজে লাগিয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. World War I, history.com
2. Defence of the Realm Act 1914, Uk parliament website
3. Espionage Act of 1917, Encyclopedia
4. Sedition Act of 1918, history.com
5. How America's Newspapers Covered Up a Pandemic, newrepublic.com
6. The silence of the press: the censored Spanish flu, ncbi.nlm.nih.gov

লেখক: সাংবাদিক

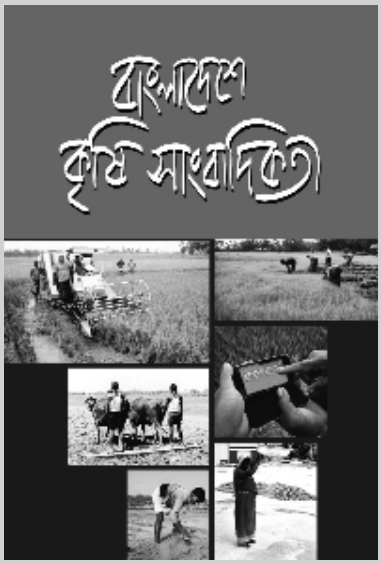

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

করোনা: প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার কাল

মাহফুজুর রহমান মানিক

সংবাদপ্রবাহ পানির স্রোতের মতো। একে বাঁধ দিয়ে রাখা যায় না। সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা থেমে থাকেনি। যার সর্বশেষ নজির কোভিড-১৯। করোনা দুর্যোগের মধ্যেও যখন পৃথিবী থমকে ছিল, তখন সংবাদমাধ্যম ছিল সচল এবং এটা জরুরিও ছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য মিররে প্রকাশিত এক নিবন্ধে কলাম লেখক সুসি বোনিফেস লিখেছেন– 'সাংবাদিকতা না থাকলে করোনায় প্রাণহানি আরও বেশি হতো।' তার মতে, 'সাংবাদিকতা না থাকলে মজুত চলতে পারে, এমনকি লুটও হতে পারে। পুলিশ তার নতুন ক্ষমতা নিয়ে আরও উদ্দীপনার সঙ্গে ভুল করে যেতে পারে। পত্রিকায় বা সন্ধ্যার খবরে ছবি ছাপা হবে না জেনে মানুষ আরও বেশি সমুদ্রের তীরে যাবে। ফলে আরও বেশি সংক্রমণ হবে এবং আরও বেশি মৃত্যু হবে।'[১] বস্তুত সংবাদমাধ্যম কেবল সংবাদই দেয় না বরং সমস্যা সমাধানেও ভূমিকা রাখছে। আমরা দেখেছি, বিশ্বের অন্যান্য দেশে তো বটেই, বাংলাদেশেও করোনার সম্মুখযোদ্ধা যারা, তাদের মধ্যে সাংবাদিকরা অন্যতম। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বৈশ্বিক এ দুর্যোগে করোনায়

“বস্তুত সংবাদমাধ্যম কেবল সংবাদই দেয় না বরং সমস্যা সমাধানেও ভূমিকা রাখছে। আমরা দেখেছি, বিশ্বের অন্যান্য দেশে তো বটেই, বাংলাদেশেও করোনার সম্মুখযোদ্ধা যারা, তাদের মধ্যে সাংবাদিকরা অন্যতম”

সংবাদমাধ্যমের কর্মতৎপরতার পেছনে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক ভূমিকা পালন করে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি। বলা বাহুল্য, বর্তমান স্বাভাবিক সাংবাদিকতাই অনেকাংশে প্রযুক্তিনির্ভর। আর করোনা বাস্তবতায় সে প্রযুক্তি আরও বেশি অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রযুক্তির কল্যাণে করোনার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কীভাবে সাংবাদিকতার অভিযোজন ঘটে এবং সংবাদমাধ্যমের ভবিষ্যৎই বা কী ইত্যাদি এ প্রবন্ধের প্রয়াস।

ঘরে বসে অফিস

ঘরে থেকে অফিস সৌজন্যে ইন্টারনেট

করোনার এ সময়ে সংবাদমাধ্যমে সবচেয়ে যুগান্তকারী বদল ঘটেছে– ঘরে থেকে অফিস করা। ধারণাটি হয়তো বিশ্বে নতুন নয়; কিন্তু বাংলাদেশে এর বাস্তব রূপ আমরা এ সময় দেখেছি। দুর্যোগে আবদ্ধ ঘরে থাকা মানুষের জরুরি চাহিদার মধ্যে খবর অন্যতম। ঘরে বসে থাকলেও মানুষ খবর চায়, কোথায় কী হয়েছে, সেটা জানতে চায়। সংবাদমাধ্যমও দেশ-বিদেশের সংবাদ দিয়ে তার দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছে। এ সময়ে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের অধিকাংশই ঘরে থেকে অফিস করেছে। কেউ অফিসের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও সফটওয়্যারে কাজ করছেন কিংবা ই-মেইলসহ অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমে নির্দেশনা নিয়ে কাজ সম্পন্ন করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রযুক্তির কল্যাণে বড়ো কোনো ঝামেলা ছাড়াই সুন্দরভাবে ঘরে চলেছে অফিস কার্যক্রম।

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমে কর্মীদের করোনা সতর্কতার জন্য এপ্রিল থেকে পদক্ষেপ নেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশ তার আগ থেকেই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিউইয়র্ক টাইমস এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে 'দ্য জার্নালিস্টস চেঞ্জিং রোলস ডিউরিং দ্য করোনাভাইরাস আউটব্রেক'[২] (করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে সাংবাদিকদের পরিবর্তিত ভূমিকা) শিরোনামের প্রতিবেদনে এসেছে, ১৩ মার্চ থেকেই পত্রিকাটির সব সাংবাদিককে ঘরে বসে অফিস করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও বড়ো বড়ো প্রায় সব গণমাধ্যমের অধিকাংশ কর্মীই কাজ করেছেন ঘরে বসে। কোথাও শিফট অনুসারে ঘরে বসে কিংবা মাঝেমধ্যে অফিসে গিয়ে কাজ করতে হয়েছে। কেউ আবার কিছু কর্মীকে অফিসে রেখে বাকিদের থেকে ঘরের সেবা গ্রহণ করেছে। বস্তুত প্রযুক্তির এ সময়ে এটি খুবই সম্ভব। সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্রের কথা বললে অফিসের কাজ জরুরি সব বিভাগের সমন্বয়ের জন্য। প্রযুক্তি এ সমন্বয়ের কাজ করছে। কেউ দূরে থাকলেও তাকে কাছে এনে দিচ্ছে। বাসায় ইন্টারনেট লাইনসহ কম্পিউটার বা ল্যাপটপ হলেই সংবাদপত্রের ডেস্কের কাজ করা সম্ভব। কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন হলে মোবাইল ফোনে কিংবা অনলাইনে তা নেওয়া সম্ভব।

তবে কিছু কাজ রয়েছে যেটা ঘরে থেকে কাভার করা যায় না। সেক্ষেত্রেও করোনার সময় প্রযুক্তি তা ঝুঁকিমুক্তভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। ডয়েচে ভেলে বাংলা বিভাগ এপ্রিলের শেষদিকে 'করোনায় সাংবাদিকতা'[৩] শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, টেলিভিশন সাংবাদিকদের কেউ কেউ বাড়তি সতর্কতার অংশ হিসেবে এখন লম্বা বুম ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ বাইরে দূরত্ব বজায় রেখে যাতে কারও মন্তব্য নেওয়া যায় সেজন্য বুমটা যথেষ্ট লম্বা করা হয়েছে।

বাসা যখন স্টুডিয়ো

করোনার মধ্যে সাংবাদিকরা বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকদের বাসা একেকটা স্টুডিয়ো কিংবা নিউজরুম হিসেবে কাজ করেছে। আমরা দেখেছি, টিভি টকশো যারা পরিচালনা করেন, ঘরে বসেই অতিথিদের সংযুক্ত করছেন। করোনার প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমলেও কিংবা মিডিয়া হাউস খুলে দিলেও এখনো কোনো কোনো চ্যানেলে এটি চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে দি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া (ইনমা) 'দ্য পটেনশল ইম্প্যাক্ট অব ওয়ার্ক ফ্রম হোম অন নিউজরুমস' (নিউজরুমের ওপর ঘরে থেকে কাজের প্রভাব) শিরোনামে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৪] সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরা হলেও আমাদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। গবেষণায় দেখা গেছে, ঘরে থেকে কাজ কার্যকর। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের গুণগত মান আরও ভালো হয়।

করোনার সময়ে কেবল সংবামাধ্যমের স্টুডিয়োই নয়, আমরা দেখেছি ঘরে অসংখ্য স্টুডিয়ো গড়ে উঠেছে। টিভি চ্যানেলের মতো অনলাইনের মাধ্যমে স্ট্রিম ইয়ার্ড, জুম ইত্যাদি ব্যবহার করে ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ টকশো, আলোচনা অনুষ্ঠান চলছে। সে ট্রেন্ড আমরা এখনো দেখছি। এর ভালো বা মন্দ– এটি ভিন্ন আলোচনা; কিন্তু মানুষ একটি প্ল্যাটফরম পেয়েছে। টিভি চ্যানেলে না হোক অন্তত নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বিকল্প মাধ্যমে তৈরি করে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞ মত না হোক অন্তত নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছে। একই সঙ্গে বলা প্রয়োজন, করোনা বাস্তবতায় যখন মানুষ আবদ্ধ, যখন বাইরের সামাজিক সব অনুষ্ঠান বন্ধ, তখন অনলাইনে ভার্চুয়ালিই মানুষ তার বিকল্প তৈরি করে নিয়েছে। নানা বিষয়ে সভা-সেমিনার তো বটেই, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্সের মতো আয়োজন অনলাইনে হচ্ছে।

করোনাভাইরাস যেমন ঘরকে মিডিয়া হাউসের বিকল্প হিসেবে তৈরি করেছে, একই সঙ্গে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের পথও খুলে দিয়েছে। আগে টিভি টকশো আয়োজনের ক্ষেত্রে অতিথিদের অফিসে আসা-যাওয়ার সময় লাগত, যানবহন লাগত আর অনলাইনে হওয়ায় সহজেই উপস্থাপক বাসায় বসে সবাইকে একত্রিত করছেন। অতিথিরাও বাসা থেকে এমনকি দেশের বাইরে থেকেও যুক্ত হচ্ছেন। পৃথিবীকে একটি গ্রামের মতো, গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দাদের একত্রিত করেছে প্রযুক্তি। এখানে প্রযুক্তি থাকলে হাজার হাজার মাইল দূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেউ আপনার সামনে হাজির হচ্ছে, আবার প্রযুক্তিহীন পাশের ফ্ল্যাটের লোকও যেন অনেক দূরে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক সে সুযোগকেই করোনার সময়ে কাজে লাগিয়েছে।

করোনা থেকে টেলিভিশন সাংবাদিকদের লম্বা বুম ব্যবহার অভিনব বটে

সৌজন্যে ডয়েচে ভেলে

অনলাইন ব্রিফিং

আগে যেসব সংবাদ সংগ্রহের জন্য কিংবা যেসব সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সাংবাদিকদের স্পটে যাওয়া লাগত, করোনাভাইরাসের মধ্যে 'অনলাইন ব্রিফিং'-এর কারণে সংবাদিকরা অনলাইনেই সে সংবাদ পেয়ে যান। দুর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি সংবাদ ছিল করোনার আপডেট। আমরা দেখেছি ৮ মার্চ প্রথম করোনা-আক্রান্ত রোগী শনাক্তের দিন থেকেই এ অনলাইন সংবাদ ব্রিফিং শুরু হয়। করোনাভাইরাস নিয়ে প্রথম ব্রিফিং আয়োজন করে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা ব্রিফিং করতেন। এরপরে তার পরিবর্তে মূলত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিং শুরু করেন। দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থের সংখ্যা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিদিনের অনলাইন ব্রিফিং ছিল দেশের করোনা সংক্রান্ত তথ্যের বলা চলে একমাত্র উৎস। প্রতিদিন দুপুর আড়াইটার ওই সংবাদ সম্মেলনের জন্য সাংবাদিকরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও অপেক্ষা করতেন। অবশেষে পাঁচ মাস পর ১১ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওই অনলাইন ব্রিফিং বন্ধ করে দেয় সরকার।

করোনা সংক্রান্ত অনলাইন প্রেস ব্রিফিংয়ের পাশাপাশি আমরা দেখেছি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ সম্মেলনই অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি, এ বছরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দেশ যখন কার্যত 'লকডাউনে', তখন দেশের অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের প্রভাব এবং উত্তরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনলাইন সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি বাসভবন গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার সরাসরি সম্প্রচার করছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রায় সব বক্তৃতাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেল থেকেও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জঙ্গিবিরোধী অভিযান র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র‍্যাবকে সরাসরি সম্প্রচার করতে দেখা গেছে। সেখান থেকেও সাংবাদিকরা তথ্য নিতে পারে। সেটা ঘরে বসেই সম্ভব হচ্ছে। এমনকি বিরোধীদলও অনলাইনে সংবাদ সম্মেলন করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনলাইন সংবাদ সম্মেলনও আমরা দেখেছি মে মাসের গোড়ার দিকে। আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও ন্যামের সভাপতি ইলহাম আলিয়েভের সভাপতিত্বে অনলাইন শীর্ষ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, পরারাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ন্যামের সদস্য দেশগুলোর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ জাতিসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও

করোনার অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সৌজন্যে ইন্টারনেট

অংশ নেন। সেখানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনও অংশ নেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যখন সংবাদের উৎস

করোনাকালে অনলাইন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও সংবাদের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তবে অস্বীকার করা যাবে না সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন সংবাদ পাওয়া গেছে, তেমনই পাওয়া গেছে অনেক গুজবও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে মানুষের হাতের কাছে এখন অনেক তথ্য। এর মধ্যে কোনটি গুজব আর কোনটি সত্য– এটি নির্ণয় করা অনেকেরই সম্ভব হয় না। মার্চের প্রথমদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুজব ছড়ায় যে থানকুনি পাতা খেলে করোনাভাইরাস আক্রমণ করতে পারবে না। একজন পীরের বরাত দিয়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এই গুজব ছড়ায়। ফলে হাজার হাজার মানুষ থানকুনি পাতা সংগ্রহ করতে নেমে

টকশোর অতিথি-উপস্থাপক বাসা থেকেই যুক্ত হচ্ছেন জুম বা স্কাইপে সৌজন্যে ডয়েচে ভেলে

যায়। বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু মহামারির সঙ্গে পরিচিত নয়, সেজন্য নানা রকম ভয় এবং উদ্‌বেগ থেকেই এমন তথ্য ছড়ায়। বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর আগে থেকেই গত আড়াই মাসে ৯০টি ভাইরাল খবর যাচাই করে দেখা গেছে সেগুলো সত্য নয়।

এটা কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বজুড়েই আমরা দেখেছি। চলতি বছরের এপ্রিল, মে ও জুনে করোনাভাইরাস নিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানো ৭০ লাখ পোস্ট সরায় ফেসবুক। যেখানে করোনাভাইরাসের ভুয়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং করোনার ভুয়া চিকিৎসাবিষয়ক পোস্ট রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ষষ্ঠ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডস এনফোর্সমেন্ট রিপোর্টের অংশ হিসেবে এই ডেটা প্রকাশ করেছে ফেসবুক।[৫] ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে সংবাদের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকের সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে ভুয়া খবর কিংবা গুজবও মেইনস্ট্রিম সংবাদমাধ্যমের খবর হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে সেটা হয়েছেও। আমরা দেখেছি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণে যথেষ্ট ভুয়া সংবাদ প্রচার হয়েছে।

প্রিন্টের চেয়েও অনলাইনের কদর

করোনোর সময়ে আমরা দেখেছি ছাপা সংবাদপত্রের চেয়েও অনলাইনের কদর বেড়েছে কয়েক গুণ। শুরুর দিকে খবরের কাগজের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায় বলে গুজব ওঠে। যদিও খবরের কাগজের মাধ্যমে নভেল করোনাভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, প্যাকেটজাত কোনো পণ্যের মাধ্যমে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই। যেহেতু খবরের কাগজ পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে উৎপাদিত হয়ে প্যাকেটজাত হয় এবং প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে খোলা হয়, তাই খবরের কাগজ থেকে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ক্ষীণ। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সিইও ই জে উইলকিনসন এ বিষয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছেন। তিনি বলছেন, 'বিশ্বের কোথাও এখন পর্যন্ত সংবাদপত্র, চিঠি বা অন্য কোনো কাগজের মাধ্যমে এই ভয়াবহ ভাইরাসটি ছড়িয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি।'

তারপরও এ সময় প্রায় সব সংবাদপত্রেরই সার্কুলেশনে ব্যাপক ধস নামে। অন্যান্য দেশেও একই চিত্র স্পষ্ট। বিবিসি তার এক প্রতিবেদনে ইংল্যান্ডের কথাও বলেছে।[৬] দেশে প্রায় সবাই সীমিত কলেবরে পত্রিকা প্রকাশ করে। এ পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নোয়াবকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পাঠক ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে দেখা গেছে। এ সময় অনলাইনের ওপর মানুষের ঝোঁক আগের চেয়ে বেড়েছে। সবার হাতেই এখন মোবাইল ফোন, মোবাইলেই খবর পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রিন্ট ভার্সন পত্রিকারও এখন অনলাইন ভার্সন পাওয়া যায়। অনলাইন গণমাধ্যমগুলো যেহেতু তাৎক্ষণিক নিউজটা দিতে পারছে, সেজন্য পাঠকও অনলাইনের দিকেই ঝুঁকছে। অনলাইনে দেখা যায়, একটা খবর বারবার শেয়ার হচ্ছে এবং দ্রুত সেটি লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

অনলাইনের এ যুগে প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। আজ যেখানে মানুষের হাতে হাতে স্মার্টফোন। মানুষ যেমন খবরটি পড়তে চায়, তেমনি তা শুনতে চায়। আর একসঙ্গে শোনা ও দেখার ব্যবস্থা হলে তো কথাই নেই। এজন্য আমরা দেখছি প্রত্যেকটি সংবাদমাধ্যমই অডিয়ো-ভিজুয়ালের দিকে নজর দিচ্ছে। সংবাদপত্রের ছোট্ট কলেবরে অনেক কিছুই দেওয়া যায় না। সেটিই অনলাইন সংস্করণে বিস্তারিত দেখা যায়। সংবাদপত্রের পাঠক নিশ্চয়ই থাকবে। যারা সকালটা ঝকঝকে পত্রিকার ঘ্রাণে আর ধোঁয়া ওড়ানো চায়ে পার করতে চান। যারা পত্রিকার পাতা থেকেই খবরের বিশ্লেষণ পড়তে চান। পড়ার অভ্যাসে সংবাদপত্রই তার কাছে অনন্য। তবে বাস্তবতা অনেক কিছু বদলে দেয়। করোনা যেমন বদলে দিয়েছে সংবাদমাধ্যমের প্রচলিত ধরন-ধারণ।

তথ্যসূত্র

১. https://www.mirror.co.uk/news/politics/ without-journalism-coronavirus-would-kill-21846297
২. https://www.nytimes.com/2020/04/03/reader-center/the-journalists-changing-roles-during-the-coronavirus-outbreak.html
৩. https://www.dw.com/bn
৪. https://www.inma.org/report-detail.cfm?pubid=211
৫. https://www.reuters.com/article/us-facebook-content-idUSKCN25727M
৬. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52299925

লেখক: সহ-সম্পাদক, সমকাল

সংবাদকর্মীর করোনার দিনরাত্রি

রাসেল মাহ্‌মুদ

গোসলখানায় ঢোকার সময় আড়চোখে দেখলাম, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভেতরে ঘুরছে ভাতের বাটি, অপেক্ষায় তরকারির। আমি শীতল হয়ে বের হতে হতে সেগুলো উষ্ণ হয়ে অপেক্ষা করবে খাবার টেবিলে। সঙ্গে অপেক্ষা করবে একজন তরুণী, যে সারাদিন মূলত অপেক্ষাই করে।

রাত পৌনে ১২টা। সাংবাদিকের বাড়ি ফিরতে রাত হয় সবারই জানা। এতকাল শুনে এসেছি, রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাংবাদিকের ভাত যায় ঠান্ডা হয়ে, স্ত্রীর মেজাজ হয়ে যায় গরম। আমার স্ত্রী চটেন না, মেনে নিয়েছেন। উপায়ই বা কী! এক দশকের ক্যারিয়ার। স্ত্রীর পছন্দ না হলে ত্যাগ করার সুযোগ কোথায়?

“সাংবাদিকের বাড়ি ফিরতে রাত হয় সবারই জানা। এতকাল শুনে এসেছি, রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাংবাদিকের ভাত যায় ঠান্ডা হয়ে, স্ত্রীর মেজাজ হয়ে যায় গরম”

করোনার চিত্র ভিন্ন। সন্তান মাকে ফেলে গেছে বনের ভেতর, স্বামী পথে ফেলে গেছে স্ত্রীকে– এসব খবর তো আমরাই প্রকাশ করেছি, শিউরে উঠেছি। এমন এক মহামারি এলো যে, নিজের হাতকে পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। একটু অসতর্ক হলেই নিজের হাত হবে আত্মহন্তারক। নিয়মিত অফিস করছি, বাড়িতে স্ত্রীর কাছে ফিরছি। সে আমাকে মেনে নিচ্ছে। আক্রান্ত হলে মেনে

নেবে কি না, সেটা একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেলি। সে হৃদয়বান তরুণী। টিভিতে সারাক্ষণ দেশ-বিদেশের করোনা আপডেট দেখছে। পত্রিকা, পোর্টাল, ফেসবুক ঘাঁটছে। বিষয়গুলো নিয়ে তার জানাবোঝা আমার থেকে পরিষ্কার। এক কথায় সে বলে, আক্রান্ত রোগীর পাশে কেউ থাকলে তার লড়াইটা সহজ হয়।

একদিন অফিস থেকে জানানো হলো, অফিসে আর আসতে হবে না। অফিস থেকে সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে বাড়িতে বসেই কাজ করতে হবে। এক সকালে আইটি বিভাগ থেকে একটা বাড়তি কিবোর্ড নিতে গিয়ে দেখলাম, অফিসটা খাঁ-খাঁ করছে। গা ছমছম করে উঠল। বাড়ি ফেরার পর জানতে পারি, প্রথম আলোর বিশেষ বার্তা সম্পাদক শওকত হোসেন মাসুম করোনায় আক্রান্ত! তার জন্য বুকটা খাঁ-খাঁ করে উঠল। তারপর নিজের স্ত্রীর জন্য। অফিসে ঢুকেছি, লিফটের বোতাম টিপেছি, উপস্থিতি নিশ্চিতযন্ত্রে আঙুলের ছাপ দিয়েছি। কাচের দরজার ধাতব হাতল হাত দিয়ে খুলেছি! এই জায়গাগুলোয় অনেকের স্পর্শ লেগে আছে।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেই প্রথম আলো তার কর্মীদের জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রবেশপথে তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা, হ্যান্ড স্যানিটাইজারে হাত জীবাণুমুক্ত করা, শরীরে জীবাণুনাশক ছিটানো, ব্লিচিংমাখা জলে জুতার তলা ধোয়াসহ সব। প্রত্যেক কর্মীর টেবিলে হ্যান্ডিরাব পৌঁছে দিয়েছে। শুরুতে নারী ও বয়সি কর্মীদের বাড়িতে অফিস করার নির্দেশ দিয়েছে। একপর্যায়ে শতভাগ কর্মীকে বাড়ি থেকে অফিস করানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রথম আলোই দেশের প্রথম পত্রিকা অফিস, যার শতভাগ কর্মী বাড়িতে বসে কাজ করে পত্রিকা প্রকাশ করেছে, অনলাইন সচল রেখেছে। পত্রিকা প্রকাশে এতটুকু বিড়ম্বনা হয়নি।

ভেবেছিলাম, এর চেয়ে শান্তির জীবন আর কী হতে পারে! বাড়িতে বসে অফিস করব। দু:খিনী স্ত্রীকে সময় দেব, যাকে কখনোই সময় দেওয়া হয় না। তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের আলাপও করব, করব নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। স্ত্রীও খুশি। ভাবনা আর বাস্তবতা উলটেপালটে বিদীর্ণ হয়ে গেল। জানলাম, হোম অফিস মানে অফিসের উদ্দেশ্যে বসা, আর কখনোই না ওঠা! কৌশলগতভাবে সেটা সম্ভবও নয়। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের গতি বাসায় স্বাভাবিকভাবেই একটু দুর্বল। সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে। চাইলেই সবাইকে একই সময়ে পাওয়াও জটিল ব্যাপার। বাড়িতে অফিস করলেও সেটা বাড়িই! চা ফুরালে, চিনি ফুরালে নিজেকেই বের হতে হবে।

এমন দিনও কাটাতে হলো, স্ত্রীর সঙ্গে একটি কথাও বলা হয়নি। সে একা খাবার প্রস্তুত করেছে, রান্না করেছে, পরিবেশন করেছে, বাসন ধুয়েছে। আমি নিজের টেবিলে কাজ করে গেছি। সে একা একা সিনেমা দেখেছে, জি বাংলায় নাটক দেখেছে, ফোনে আত্মীয়দের সঙ্গে টুকটাক কথা বলেছে, অনলাইনে ক্লাস করেছে, পরীক্ষাও দিয়েছে। এরই মধ্যে আসে রোজা। সাংস্কৃতিক দায় ও বাড়িতে থাকার সুবাদে রোজা পালন করতে হবে। সেই সময়টা আরও অস্থিরতায় ভরে উঠল। ঘুম থেকে উঠে ল্যাপটপ চালু করেছি, কাজ করে গেছি সেহরি পর্যন্ত। সেহরির পর ল্যাপটপ বন্ধ করে ঘুমাতে গেছি। এর মধ্যে গোসলের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ মিনিট, চারবার খাবারের জন্য চার দশে চল্লিশ মিনিট।

প্রথম আলোয় আমার আরও বেশ কজন সহকর্মী আক্রান্ত হলেন। একে একে তারা সুস্থ হয়ে ফিরলেন। অফিস কর্তৃপক্ষ সব সময় তাদের পাশে ছিল। সম্পাদক সার্বক্ষণিক সবার খোঁজখবর নিয়েছেন। এ রকম একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সামনাসামনি কখনো করা হয় না, পাছে মালিক তোষণে দুষ্ট হতে হয়!

একপর্যায়ে উপলব্ধি করলাম, করোনার সবচেয়ে ভয়াবহতা– আক্রান্ত হয়ে জীবন হারানোয় নয়। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। যারা জীবন হারিয়েছেন, তারা রোজগারের ভাবনা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু যারা বেঁচে রইলেন এবং করোনার কড়াল থাবায় চাকরি হারাতে লাগলেন, তাদের বেদনা একটু একটু করে অনুভব করতে শুরু করলাম। পৃথিবীর কর্মহারা মানুষ, যারা সঞ্চয় ভেঙে বাঁচতে শুরু করেছেন, তাদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। করোনায় দায়িত্বে অবহেলা করা মানুষের প্রতি তৈরি হচ্ছিল ক্ষোভ। আর মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বানানো সাহেদ-সাবরীনাদের প্রতি তৈরি হয়েছে তীব্র ঘৃণা। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নজিরও স্থাপিত হয়েছে বহু জায়গায়। জীবন দিয়ে যে চিকিৎসকরা কাজ করে গেছেন রোগীর জন্য, করে যাচ্ছেন এখনো, তাদের জন্য ভালোবাসার পাহাড় জেগে উঠেছে বুকের ভেতর। বিদ্যানন্দ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিনের পর দিন মানুষের জন্য খাবার রান্না করে গেছে। কেউ খাবার, কেউ টাকা, কেউ সেবা, কেউ প্লাজমা দিয়ে একদিকে যেমন মানবিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ত্রাণের চাল ও তেল আত্মসাৎকারীরা ধরা পড়েছে মানুষের হাতে। এক একটি ঘটনায় এ দেশের মানুষের জন্য গর্বে বুক যতটা ফুলে উঠতে চায়, ঠিক তখনই এমন এক ঘটনা সামনে এসে হাজির হয় যে, বুকটা হাওয়াহারা বেলুনের মতো মিইয়ে যায়।

একপর্যায়ে আমরা সীমিত পরিসরে অফিস শুরু করলাম। প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এলো সবকিছু। এ রকম একদিন অফিসে ঢোকার মুখে ঘটল ঘটনাটি। শরীরের তাপমাত্রা মাপতে গিয়ে জ্বলে উঠল থার্মাল স্ক্যানারের লাল বাতি, আটকে দিলেন নিরাপত্তাকর্মী। ওপরে যাওয়া চলবে না। অভ্যর্থনা কর্নার থেকে সহৃদয় সহকর্মী ডেকে বসালেন, নিজের স্ট্যান্ড ফ্যান মুখের ওপর ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, বাইরে রোদ, এ কারণেও হতে পারে। ১০ মিনিট পর আবারও তাপমাত্রা মাপা হলো, পাওয়া গেল সবুজসংকেত। তিনি অফিসের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ওপরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি তখনও শরীরের ভেতরে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল নতুন সিএমএইচের জন্য কাজ করার তাগিদ। সেই দিনটি অফিস করে আমাকে দুদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে হয়েছে। একশ এক ডিগ্রি জ্বর, সীমিত পরিসরে শরীর ব্যথার পর ছিল দুর্বলতা। করোনা টেস্ট করাইনি। কারণ মানসিকভাবে একটা বাড়তি চাপ নেওয়ার মতো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া পরীক্ষায় সাধারণ ভাইরাস জ্বরও করোনা হয়ে বসে, সেই চাপ কীভাবে নেব?

আমরা অফিসে ফিরেছি। সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনে কাজ করছি। এখনো করোনায় আক্রান্ত হইনি, হয়তো স্ত্রী সাহস দিয়েছিল বলেই। সাংবাদিকের স্ত্রীরা সম্ভবত যে কোনো পেশাজীবীর স্ত্রীদের থেকে অধিক মহীয়সী হন।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক

পেশাদার সাংবাদিকতায় করোনার প্রভাব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মো. ফরহাদ উদ্দীন

'জার্নালিজম' এবং 'প্রফেশনালিজম'– এ দুই ইজমকে ঘিরে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। একদল তাত্ত্বিক জার্নালিজম বা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে মানতে নারাজ, যেখানে আরেক দল মনে করে উন্নতি-অবনতি থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতায় প্রফেশনালিজম বা পেশাদারিত্ব বিদ্যমান (চৌধুরী, ২০১৮)। পেশাদার সাংবাদিকতার এসব তর্কবিতর্কের মধ্যে যেন 'আগুনে ঘি ঢেলেছে' করোনা। করোনার ছোবলে আজ বিপর্যস্ত বিশ্ব অর্থনীতি। যার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না সংবাদিকতাও।

> এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে পেশাদার সাংবাদিকতা টিকবে কি না? যদি টিকেও থাকে, কেমন হবে করোনা-পরবর্তী পেশাদার সাংবাদিকতা

বিশ্বব্যাপী অতিমারির কারণে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক সংবাদমাধ্যম। কমেছে মুদ্রিত সংবাদপত্রের সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন ও আয়। চলছে গণমাধ্যমকর্মী ছাঁটাই। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে পেশাদার সাংবাদিকতা টিকবে কি না? যদি টিকেও থাকে, কেমন হবে করোনা-পরবর্তী পেশাদার সাংবাদিকতা।

যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল, কালচার, মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্টস বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অলিভার ডাউডেন বলেছেন, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সাংবাদিকতা ইতিহাসের সবচেয়ে 'বিগেস্ট এক্সিসটেনশিয়াল ক্রাইসিস' বা বৃহত্তম অস্তিত্ব

সংকটে পড়েছে। প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক মশিউল আলম এক উপসম্পাদকীয়তে লিখেছেন, 'সাংবাদমাধ্যমের ওপর করোনার ধাক্কাটা অভূতপূর্ব। পেশাদার সাংবাদিকতা এমন বিপন্ন দশায় এর আগে কখনো পড়েনি।'

এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতেও আশার বিষয় হচ্ছে– সংবাদমাধ্যমের ডিজিটাল বা অনলাইন গ্রাহক বাড়ছে। ফলে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে অনেক সংবাদপত্রের আয়ও বেড়েছে। তাই বলা যায়, পেশাদার সাংবাদিকতা টিকে থাকবে, তবে ভিন্নরূপে। বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে এটি অনুমান করা যায়, নিউ নরমাল পরিস্থিতিতে ট্র্যাডিশনাল জার্নালিজম বা গতানুগতিক সাংবাদিকতাচর্চার অনেকটা ইতি ঘটতে যাচ্ছে। আর এ কারণে করোনা-পরবর্তী পেশাদার সাংবাদিকতা হবে ডিজিটাল মাধ্যমনির্ভর; যেখানে মুদ্রিত সংবাদপত্রের চেয়ে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট-নির্ভর ডিজিটাল জার্নালিজমেরই প্রাধান্য থাকবে বেশি।

মহামারিতে ধস নেমেছে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম শিল্পে

করোনার ভয়াল থাবায় বিশ্বের গণমাধ্যম ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শত শত সংবাদমাধ্যম। মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমে করোনায় ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডকের প্রতিষ্ঠান নিউজ করপোরেশনের অস্ট্রেলীয় শাখা নিউজ কর্প অস্ট্রেলিয়া মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘোষণা দিয়েছে তাদের ৩৬টি আঞ্চলিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া ৭৬টির ছাপা সংস্করণ বন্ধ করে শুধু অনলাইন সংস্করণ চালু রাখবে। যুক্তরাজ্যের দ্য গার্ডিয়ানের বরাতে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় ১৭৫টি সংবাদ প্রতিষ্ঠান সাময়িক ও স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতেও আশার বিষয় হচ্ছে– সংবাদমাধ্যমের ডিজিটাল বা অনলাইন গ্রাহক বাড়ছে। ফলে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে অনেক সংবাদপত্রের আয়ও বেড়েছে

আমেরিকান অনলাইন নিউজ কোম্পানি বাজফিড নিউজ অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যে তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমবিষয়ক মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পয়েন্টার ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, আমেরিকায় এ পর্যন্ত ৫০টি সংবাদ প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। সেগুলোর মধ্যে ১০০ বছরের পুরোনো পত্রিকাও আছে বেশ কয়েকটি আর ২০০টি সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রকাশনায় সাময়িক বিরতি ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে অনেক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ছাপা সংস্করণ বন্ধ হয়ে গেছে। সেগুলোর একটা বড়ো অংশই সম্ভবত আর কখনো ছাপা সংস্করণে ফিরতে পারবে না (প্রথম আলো, ২০২০)।

করোনায় গণমাধ্যম শিল্পে বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) তথ্য অনুযায়ী, মহামারিকালে জুন পর্যন্ত ঢাকা ও আট বিভাগীয় শহরসহ সারাদেশে মোট ২৫৪টি সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে।

চলছে গণমাধ্যমকর্মী ছাঁটাই

মহামারির সময়ে মানুষকে সচেতন করতে তথ্য প্রদান সবচেয়ে জরুরি। নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের গণমাধ্যমকর্মীরা প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজের জন্য সরকারি চাকরিজীবীরা নানা ধরনের প্রণোদনা পাচ্ছেন। অথচ সংবাদকর্মীদের কপালে প্রণোদনার পরিবর্তে জুটছে চাকরি হারানোর চিঠি। দেশের প্রথম সারির পত্রিকা থেকে শুরু করে টিভি চ্যানেলেও চলছে সাংবাদিক ছাঁটাই। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ অনেক পত্রিকায় সাংবাদিক ছাঁটাই করা হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। দীর্ঘ ২০ বছর একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা প্রবীণ সাংবাদিকও বাদ পড়েননি ছাঁটাই থেকে। ছাঁটাই ছাড়াও অনেক সাংবাদিকের বেতন কমানো হয়েছে। তাছাড়া বিনা বেতনে ছুটি ছাড়াও নানা উপায়ে সাংবাদিকদের কাজ থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে চাকরি হারিয়ে পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অনেক সাংবাদিক।

উন্নত দেশগুলোয়ও করোনাকালে চলছে সাংবাদিক ছাঁটাই। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রের একটা আভাস দিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারিয়েছেন কিংবা বেতনভাতা কাটছাঁটের শিকার হয়েছেন এমন সংবাদমাধ্যম কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। এই তালিকায় কোনো ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নেই। পয়েন্টার ইনস্টিটিউট লিখেছে, মহামারি এসে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেকার করে দিয়েছে। সিএনএনের মতো প্রতিষ্ঠান, যারা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্মানি দিয়ে দিত, তারা ঘোষণা করেছে, এখন ফ্রিল্যান্সাররা লেখক সম্মানি পাবেন লেখা প্রকাশিত হওয়ার ৯০ দিন পর।

মানবজমিনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকা ও চ্যানেলে নিয়মিত বেতন হচ্ছে। বেশ কয়েকটি চ্যানেলে সংবাদসহ বিভিন্ন বিভাগে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। বিভিন্ন

সংবাদপত্রেও অনেকে চাকরি হারিয়েছেন দুই-তিন মাসে। দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকা কয়েকদিন আগে করোনা পরিস্থিতির অজুহাতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য বিভাগীয় প্রধানদের উদ্দেশে একটি চিঠি ইস্যু করে বলা হয়েছে দ্রুত ছাঁটাইযোগ্য কর্মীদের তালিকা দিতে। পত্রিকাটির এমন পদক্ষেপের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী ও গণমাধ্যম শিক্ষকরা সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন। এর বাইরে বড়ো একটি মিডিয়া গ্রুপের একটি পত্রিকার বেশ কয়েকজন সিনিয়র সংবাদকর্মীকে ছাঁটাই এবং বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া আরও একটি পত্রিকা তাদের কর্মীদের বেতন অর্ধেক করেছে। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ কাজ করলেও চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। বেতন অর্ধেক করার কারণে বিশেষ করে যাদের বেতন কম, তারা মানবেতর জীবযাপন করছেন। শুধু তা-ই নয়, বাসাভাড়া ও পরিবারের অন্যান্য চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। এমন পরিস্থিতিতে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতায় অনিশ্চয়তা বেড়েছে। ফলে আগামী প্রজন্ম সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে নিরুৎসাহিত হবে।

তাই নতুন প্রজন্মকে সাংবাদিকতা পেশায় টানতে এবং দেশের গণমাধ্যম শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে গণমাধ্যমকর্মী ছাঁটাই বন্ধ করে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। সাংবাদিকতার শিক্ষক ও পেশাগত সাংবাদিকরা একটি যৌথ বিবৃতিতে গণমাধ্যমের এই সংকট মোকাবিলা করতে তিনটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে– সহজ শর্তে সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ, নিজেদের অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সংকটকালীন তহবিল গঠন এবং গণমাধ্যম মালিকদের সংগঠনের মাধ্যমে একটি যৌথ তহবিল গঠন। সাংবাদিকদের ছাঁটাই না করে এ ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্মিলিত প্রয়াসে সংকট মোকাবিলা করার মাধ্যমেই পেশাদার সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

বাড়বে 'ডিজিটাল মাধ্যম' নির্ভরতা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্যমতে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫৫ লাখ। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে অপারেটরগুলো দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা চালু করছে। এতে ঘরে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পুরো দুনিয়ার খবর জানা সহজ হয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামসহ জনপ্রিয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উপনীত হয়েছে মানুষের জানার আগ্রহ মেটানোর নিত্যসঙ্গী হিসেবে।

দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আসায় গণমাধ্যমের ডিজিটাল কার্যক্রমও বাড়ছে। গণমাধ্যমগুলো মুদ্রিত পত্রিকা বা শুধু টেক্সট রিপোর্টিং থেকে বের হয়ে এসে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। মোবাইল জার্নালিজম, মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম, সিটিজেন জার্নালিজমসহ নিউ মিডিয়ার প্রতিই বেশি ঝুঁকছে পাঠক।

বর্তমানে সংবাদপত্রগুলো শুধু মুদ্রিত সংখ্যার ওপর বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো টেলিকাস্ট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। তাদের রয়েছে নিজস্ব ওয়েবসাইট, যেখানে সংবাদের লিখিত বিবরণীর পাশাপাশি ছবি, অডিয়ো ও ভিডিয়ো সংযুক্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া সব মিডিয়া হাউসের নিজস্ব ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। কারণ গণমাধ্যমের বেশির ভাগ রিডারশিপ সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ধরেই আসছে। ফলে পাঠককে সংবাদ পড়ে কোনো ঘটনার ভিডিয়ো দেখতে টিভি চ্যানেল দেখতে হচ্ছে না আবার টিভি চ্যানেল দেখে ঘটনার বিস্তারিত জানতে পত্রিকা পড়তে হচ্ছে না। তাই পাঠক বাড়াতে সংবাদমাধ্যমকে মাল্টিমিডিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। আর এতে বাড়ছে গণমাধ্যমের ডিজিটাল মাধ্যম নির্ভরতা।

বদলাবে গণমাধ্যমের ব্যবসায়িক মডেল

সংবাদপত্র এমন একটি শিল্প, যেখানে 'ডুয়েল মার্কেট ইকোনমি' কাজ করে। ডুয়েল মার্কেট ইকোনমি বলতে একই পণ্য বিক্রি করে দুবার আয় করাকে বোঝায়। অর্থাৎ সংবাদপত্র পত্রিকার কপি বিক্রি করে একবার আয় করে আবার বিজ্ঞাপন থেকেও আয় করে। করোনা পরিস্থিতির কারণে মুদ্রিত সংবাদপত্রের বিক্রি কমেছে। বেসরকারি বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে। সরকারি বিজ্ঞাপনও কমেছে। বকেয়া বিলের স্তূপ বেড়েছে।

বর্তমানে সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সংখ্যা ৭০৭টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৩৬৫টি, মফস্বল থেকে প্রকাশিত ৩৪৭টি পত্রিকা সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে, যার মধ্যে দৈনিক পত্রিকা রয়েছে ৫১২টি। ঢাকা থেকে ২৫৪টি সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত পত্রিকা রয়েছে। অথচ বাজারে পত্রিকা আছে ২০-২৫টি। বাকিগুলো অনিয়মিত। কিছু প্রকাশ হয়, কিছু হয় না। আবার দেখা যায়, সরকার ঘোষিত ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন নেই; কিন্তু এসব পত্রিকাও সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। ফলে পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলো বঞ্চিত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায় (মানবজমিন, ২০২০)।

সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপন না পেলেও করোনার মধ্যেও অনেক গণামাধ্যমের অনলাইনের অনলাইন গ্রাহক ও আয় বেড়েছে। এ সংবাদমাধ্যমগুলো ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে প্রাধান্য দিয়ে কনটেন্ট সিলেক্ট করছে। ফলে তারা দ্রুত ডিজিটাল মাধ্যমের গ্রাহক টানতে পারছে আর আয়ও বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যম শিল্পের এই আয় সংকট শুরু হয়েছে অন্তত এক যুগ আগে, যখন গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রাধান্যের সূচনা ঘটে (আলম, ২০২০)। তখন থেকেই মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের আয় কমতে শুরু করে। তবে আশা করা হয়েছিল, সাংবাদিকতার প্রধান মাধ্যম মুদ্রণ থেকে ডিজিটালে স্থানান্তরিত হলে আয়ও একইভাবে স্থানান্তরিত হবে। যে রাজস্ব মুদ্রিত সংস্করণ থেকে আসত, তা আসবে ডিজিটাল সংস্করণ থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই প্রত্যাশা সত্য হয়নি।

সংবাদমাধ্যম শিল্প ও পেশাদার সাংবাদিকতার জন্য যে সংকট অনেক আগেই শুরু হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণের একটা সম্ভাব্য উপায় হলো সংবাদমাধ্যম শিল্পের আয়-নির্ভরতার স্থানান্তর। ভাবনাটা এমন– এই শিল্প টিকে থাকবে এবং ক্রমে আরও বিকশিত হবে অর্থনৈতিকভাবে বিজ্ঞাপনদাতাদের ওপর নির্ভর করে নয়, এর ভোক্তাদের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এই শিল্পের রাজস্বের প্রধান জোগানদাতা হবে পাঠক-দর্শক-শ্রোতা। সেটা সম্ভব গ্রাহকভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেলের বিস্তারের মাধ্যমে (আলম, ২০২০)।

এক্ষেত্রে চলতি কোভিডকালে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা গেছে নিউইয়র্ক টাইমসের ক্ষেত্রে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পত্রিকাটির ডিজিটাল গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে ৬০ লাখ। ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল ও দি আটলান্টিক ম্যাগাজিনসহ আরও অনেক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল

গ্রাহকসংখ্যা বেড়েছে। যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায়ও একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যদিও বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ার অনুপাতে ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন বা গ্রাহকভিত্তিক আয়ের পরিমাণ এখনো অনেক কম, তবু অন্তত আস্থা অর্জনকারী সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িক মডেলে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে গ্রাহকভিত্তিক সাংবাদিকতার মডেল।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে করণীয়

পৃথিবী পুরোপুরি স্বাভাবিক কবে হবে বা আদৌ হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। এমন অনিশ্চয়তা ও মহামারির সময়ে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তথ্য। তাই করোনার ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে তথ্য সরবরাহ করার বিকল্প নেই সাংবাদিকদের কাছে। তথ্যের সন্ধানে তাকে যেতে হবে আক্রান্ত এলাকা কিংবা হাসপাতালে। এতে তার সঙ্গে সহকর্মী ও পরিবারও ঝুঁকিতে থাকবে।

বলতে গেলে এক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে (রেজা, ২০২০)। যুদ্ধের ময়দানে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যে ধরনের নীতিমালা মানতে হয়, এখানে তার চেয়েও কঠিন বিধিবিধান মানতে হবে সাংবাদিকদের। কারণ যুদ্ধের ময়দানে সবাই জানে শত্রু আর মিত্র কারা। এখানে পুরো লড়াইটাই হচ্ছে এক অজানা শত্রুর সঙ্গে। তাই একজন সাংবাদিক মাঠপর্যায়ে রিপোর্টিংয়ে গেলে বিশেষ করে কোয়ারেন্টিন জোন বা হাসপাতালে গেলে তাকে অবশ্যই মাস্ক, পিপিই, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ অন্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে।

মহামারির কারণে বেশির ভাগ সাংবাদিক 'হোম অফিস' করছে। যে কারণে অনেক সময় তাদের পক্ষে সরেজমিন গিয়ে সংবাদসূত্রের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় সাংবাদিকতার নিয়মিত প্র্যাকটিস (যেমন, তথ্য ক্রসচেক) করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে সংবাদের সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে মহামারির সময়ে অনেক গুজব ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। এসব গুজব থেকে জনগণকে রক্ষা করার, সঠিক সংবাদ দেওয়ার দায়িত্ব সাংবাদিকদের। তাই করোনার অজুহাতে সংবাদের সঠিকতা বা সাংবাদিকতার পেশাগত নীতিমালা যেন উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সাংবাদিকরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করলেই হবে না; তাদের হাউস, গণমাধ্যমের মালিকপক্ষ এবং সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করার। তাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা কীভাবে কাজ করবেন, এর জন্য সময়োপযোগী একটি নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে। এতে জনগণের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হবে আর পেশাদার সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ পথচলা অনেকটা সহজ হবে।

তথ্যসূত্র

১. চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম, ২০১৮, পেশাদারি সাংবাদিকতার প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর চ্যালেঞ্জ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ঢাকা।*

২. আলম, মশিউল, প্রথম আলো (২২ আগস্ট ২০২০), পেশাদার সাংবাদিকতা টিকবে কীভাবে Retrived from:https://www.prothomalo.com/opinion

৩. রেজা, সৈয়দ ইশতিয়াক, জাগো নিউজ (৪ এপ্রিল ২০২০), করোনাকালে সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি, Retrived from: https://www.jagonews24.com/opinion/news/570843?__

৪. ফারুক, মোহাম্মদ ওমর, মানবজমিন (৪ জুলাই ২০২০), নজিরবিহীন সংকটে গণমাধ্যম Retrived from: https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233860

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

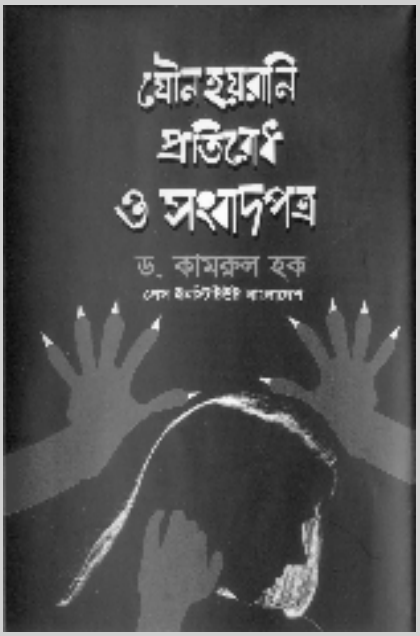

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যুগে যুগে যত মহামারি

মো. লুৎফর রহমান

করোনার থাবায় বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। ২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic) ঘোষণা করার আগেও যুগে যুগে মানবসভ্যতা মুখোমুখি হয়েছে বিভিন্ন অতিমারির। এসব মহামারি কেড়ে নিয়েছে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ। একুশ শতকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো মহামারি হিসেবে আঘাত হেনেছে করোনাভাইরাস-সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯, যাতে ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ। যার ছোবল প্রাণ কেড়েছে ১০ লাখের বেশি মানুষের। নিরীক্ষা'র পাঠকের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে হানা দিয়ে ধ্বংসলীলা চালানো কিছু অতিমারি বা মহামারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

“সেই সময়ই এথেন্সে এক অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তা আকার নিল মহামারির। তবে কী কারণে এই মহামারি, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে”

এথেন্সের মহামারি

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০, গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে শুরু হয়েছে পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ। সেই সময়ই এথেন্সে এক অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তা আকার নিল মহামারির। তবে কী কারণে এই মহামারি, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডিডেসের বর্ণনা অনুযায়ী,

'স্বাস্থ্যবান লোকদের শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেল। চোখ লাল ও জ্বালাজ্বালা ভাব। জিভ-গলায়ও লালচে ভাব।' এর জেরে প্রায় এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরে লিবিয়া, ইথিওপিয়া, মিসরেও এই রোগ ছড়ায়।

প্লেগ

মহামারি প্রসঙ্গে বলতে গেলেই আসে প্লেগের কথা। বিশ্বে প্লেগ বিভিন্ন নামে-আঙ্গিকে বহুবার এসেছে মহামারিরূপে। ইতিহাস ঘাঁটলে প্লেগ প্রসঙ্গটি পওয়া যায় রোমান সাম্রাজ্যে। বিভিন্ন সময়ে অতিমারি হয়ে হানা দেওয়া প্লেগগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

অ্যান্টোনিন প্লেগ

১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ রোম সাম্রাজ্যে ছড়িয়েছিল অ্যান্টোনিন প্লেগ। এই রোগকে গুটিবসন্তের প্রাথমিক আবির্ভাব বলে মনে করা হয়। যুদ্ধ থেকে ফেরা সৈনিকদের মাধ্যমেই রোমে সাম্রাজ্যে ছড়িয়েছিল এটি। জ্বর, গলাব্যথা, ডায়রিয়ার লক্ষণ ছিল এই রোগে। এই অতিমারি ৫০ লাখ লোকের প্রাণ কেড়েছিল। এর জেরে একদিনে দুই হাজার মৃত্যুর সাক্ষীও থেকেছে রোম।

সাইপ্রিয়ান প্লেগ

অ্যান্টোনিনের ৭০ বছর পর আরেক অতিমারির ধাক্কা সহ্য করে মানবসভ্যতা। তিউনিসিয়ার কার্থেজ শহরের বিশপ সাইপ্রিয়ানের নামে নামকরণ করা হয় এই অতিমারির। মনে করা হয়, ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে ইথিওপিয়ায় সাইপ্রিয়ান প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। উত্তর আফ্রিকা হয়ে রোমে ঢোকে এটি। তারপর ছড়িয়ে পড়েছিল মিসর ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। অ্যান্টোনিনের সঙ্গে এই রোগের লক্ষণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এই অতিমারিও প্রচুর প্রাণ কেড়েছিল সেসময়।

জাস্টিনিয়ান প্লেগ

৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে এর সূত্রপাত মিসরে। এরপর ফিলিস্তিন ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্য হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নামেই এর নামকরণ। এই অতিমারিকেই প্রথম দফার বুবোনিক প্লেগ হিসেবে ধরা হয়। মনে করা হয়, পৃথিবীর সেসময়ের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশের মৃত্যু হয়েছিল এই অতিমারিতে। জাস্টিনিয়ানও আক্রান্ত হয়েছিলেন এই রোগে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেও তার সাম্রাজ্যের বাঁধন আলগা করে দিয়েছিল এই অতিমারি।

ব্ল্যাক ডেথ

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ত্রাস হয়ে উঠেছিল ব্ল্যাক ডেথ। কুখ্যাত বুবোনিক প্লেগ দ্বিতীয়বার শক্তিশালী রূপে ফিরে আসার জেরেই ১৩৪৭ নাগাদ হয় এই অতিমারি। এই ব্ল্যাক ডেথ অতিমারির জন্য দায়ী ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস নামে ব্যাকটেরিয়ার এক প্রজাতি, যা আজ প্রায় অবলুপ্ত। ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর দেহে বসা মাছির মাধ্যমে এটি ছড়িয়েছিল। এশিয়ায় শুরু হয়েছিল ব্ল্যাক ডেথ। পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে এটি। এর জেরে প্রায় ২০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেসময় আক্রান্তদের দেহ গণকবর দেওয়া হতো। ব্ল্যাক ডেথ এত মানুষের জীবন কেড়েছিল যে, এই অতিমারির পর আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য বদল ঘটেছিল। সেসময় ইউরোপে কাজের জন্য শ্রমিকের আকাল দেখা দিয়েছিল।

আমেরিকান প্লেগ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর বছর। ইউরোপীয়রা পৌঁছে গিয়েছে দুই আমেরিকা মহাদেশের নানা প্রান্তে। সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে হওয়া গুটিবসন্ত, হাম, বুবোনিক প্লেগের মতো রোগ। এই সময়কালে গুটিবসন্তে মেক্সিকোর অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইনকা সভ্যতাতেও প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে থাকে এই রোগগুলো। দশকের পর দশক ওইসব অঞ্চলে ফিরে আসতে থাকে ইউরোপের রোগগুলো। সাম্প্রতিক এক গবেষণা জানাচ্ছে, এসব রোগের কবলে পড়ে ওই শতকে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

গ্রেট প্লেগ অব লন্ডন

বিশ্বজুড়ে 'সন্ত্রাস' চালানো ব্ল্যাক ডেথ প্রায় ৩০০ বছর পর ফিরে আসে লন্ডনে। ১৬৬৫ সালের গ্রীষ্মে লন্ডনজুড়ে দ্রুত হারে ছড়াতে থাকে এই রোগ। এর জেরে লন্ডনের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, প্রায় এক লাখ লোক মারা গিয়েছিল। সেই বছর সেপ্টেম্বরের এক সপ্তাহে ৭ হাজার ১৬৫ জনের মৃত্যু নথিভুক্ত রয়েছে এই মহামারির কারণে। এর কয়েক বছর আগে ইতালিতেও লক্ষাধিক লোকের প্রাণ কেড়েছিল এই প্লেগ।

গুটিবসন্ত

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু। বিংশ শতাব্দীতে গুটিবসন্তে প্রায় ৫০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আগে গুটিবসন্তে মৃত্যুহার ছিল ৩০ শতাংশ, যদিও এর অধিকাংশ উপাদান ছিল প্রাণঘাতী। তবে এ রোগ আয়ত্তে আসায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৯ সালে গুটিবসন্ত নির্মূলের ঘোষণা দেয়।

কলেরা

ঊনবিংশ শতকের শুরুর সময়ে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ অতিমারির চেহারা নেয় কলেরা। আমাদের বাংলায় প্রথম ছড়ায় এই রোগ। এ অঞ্চলে এ রোগকে 'ওলা ওঠা' নামে ডাকা হতো। ১৮১৭ সালে যশোরে প্রথম দেখা দেয় এই রোগ। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ, বিশ্বজুড়ে প্রায় সাত বছর দাপিয়ে বেড়িয়েছে কলেরা। ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়া কলেরার জন্য দায়ী। এটি মূলত পানিবাহিত রোগ। ব্যাকটেরিয়া-মিশ্রিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে এটি ছড়িয়েছিল। বাংলায় শুরু হওয়ার পর ভারতসহ মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কায়ও ছড়িয়ে পড়ে এই রোগ। ১৮২০ সালে থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায়ও থাবা বসায় ভিব্রিও কলেরি। কলেরার জেরে শুধু জাভা দ্বীপেই এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। চীন-জাপান ঘুরে ১৮২১ সালে এশিয়ার বাইরে পা রাখে। পাঁচ-ছয় বছর তাণ্ডব চালিয়েছিল কলেরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, প্রথম কলেরা অতিমারিতে প্রতিবছর ১৩ থেকে ৪০ লাখ লোক আক্রান্ত হতেন। বছরে ২১ হাজার থেকে ১ লাখ ৪৩ হাজারের প্রাণ কাড়ত এই রোগ।

তৃতীয় প্লেগ অতিমারি

চতুর্দশ শতকের সেই বুবোনিক প্লেগ ১৮৫৫ সালে নতুন করে ফিরে আসে চীনে। এরপর বেশ কয়েক দশক এ দেশের, সেই দেশের মানুষকে ভুগিয়ে ছেড়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতেও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্লেগ। বেশ কয়েক দশক বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি মানুষের প্রাণ কেড়েছিল ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ বুবোনিক প্লেগ। ১৮৯৪ সালে হংকংয়ের চিকিৎসক ইয়ারসিন প্লেগের কারণ হিসেবে ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি চিহ্নিত করেন।

রাশিয়ান ফ্লু

সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলো, গণপরিবহণ হলো সহজ। ভিড় বাড়তে থাকল। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া তত সহজ হলো। ১৮৮৯-৯০ নাগাদ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল একধরনের ফ্লু ভাইরাস। এই রাশিয়ান ফ্লু অতিমারির জেরে বিশ্বে ১০ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে। রাশিয়ায় উৎপত্তি হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এই ফ্লুতে মৃত্যুর হার শিখরে পৌঁছায়।

স্প্যানিশ ফ্লু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই দুনিয়াজুড়ে হানা দিল ইনফ্লুয়েঞ্জার আরেক প্রজাতি (এইচ১এন১ ভাইরাস)। যার জেরেই স্প্যানিশ ফ্লু। কোনো ওষুধেই সেসময় বাগে আনতে পারা যায়নি এই ফ্লুকে। এর থেকে বাঁচতে স্কুল-কলেজ, থিয়েটার, বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়। মানুষকে মাস্ক পরতে বলা হয়। ১৯৫৭ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন রূপ আক্রমণ হানে বিশ্বজুড়ে। যার জেরেই এশিয়ান ফ্লু অতিমারি। হংকং থেকে সারা চীনে ছড়ায় এশিয়ান ফ্লু। এরপর এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও হানা দেয়। এই অতিমারির প্রকোপে প্রায় ১১ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছিল সেসময়। শুধু আমেরিকায়ই মারা গিয়েছিলেন এক লাখ ১৬ হাজার জন।

এইচআইভি/এইডস

১৯৮১ সাল নাগাদ এক নতুন ধরনের রোগের প্রকোপ শুরু হয় আমেরিকায়। নাম এইডস। জানা যায়, এই রোগ মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেই ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলে। যার জেরে মানুষের মৃত্যুও হয়। এইচআইভি নামের ভাইরাস এই রোগের জন্য দায়ী। ১৯২০ সালে আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জির থেকে মানুষের দেহে এসেছিল এই ভাইরাস। এরপর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এইডস। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল এই প্রাণঘাতী ভাইরাস। এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সাত কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের প্রাণ কেড়েছে এই ভাইরাস। বর্তমানে এই রোগের অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। তাই ভাইরাসটি থেকে গেলেও আগের থেকে মৃত্যুহার অনেক কমেছে।

সোয়াইন ফ্লু

২০০৯ সলে এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের (সুয়াইন ফ্লু) নতুন প্রজাতির কবলে পড়ে বিশ্ব। এপ্রিলে আমেরিকায় এর উপস্থিতির প্রমাণ মেলে। তারপর বিশ্বের প্রায় ৭৪টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সোয়াইন ফ্লু। জুনে এটিকে অতিমারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। প্রায় দেড় বছর সক্রিয় ছিল এই ভাইরাস। এই ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭০ কোটিরও বেশি মানুষ। আড়াই লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়েছিল সোয়াইন ফ্লু। কিন্তু ৬৫ বছরের বেশি বয়সিদের কাবু করতে পারেনি এই ভাইরাস। মূলত কমবয়সি ও মধ্যবয়সিরা বেশি আক্রান্ত হয়েছিলেন এতে।

ইবোলা ভাইরাস

ইবোলা ভাইরাস বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ১৯৭৬ সালে, যখন আফ্রিকার বর্তমান দক্ষিণ সুদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর (তৎকালীন জায়ারে) ইয়ামবুকু গ্রামের মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। ইয়ামবুকু গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ইবোলা নদীর নাম থেকে এর নামকরণ করা হয়। সেসময় এই ভাইরাসের আঘাতে (বর্তমানের) দক্ষিণ সুদানে রোগাক্রান্ত মানুষের অর্ধেকের বেশিই মারা গিয়েছিল। ইয়ামবুকু গ্রামে মৃত্যুর হার ছিল আরও ভয়াবহ। সেখানে আক্রান্ত ১০০ জনের মধ্যে ৮৮ জনই মৃত্যুর কাছে হার মেনেছিল।

সার্স ভাইরাস

২০০৩ সালে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল সার্স নামের এক সংক্রামক ভাইরাস, যাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮ হাজারেরও বেশি লোক এবং ১৭টি দেশে মৃত্যু হয়েছিল ৭৭৪ জনের। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়া এই রোগে ছয় মাসের মধ্যেই ৭ শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়, আর বেশির ভাগ মৃত্যুই হয় পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

সংক্রমণের ভয়ে ওই অঞ্চলের জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে। ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ভ্রমণের ওপর নানা রকম নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। দুঃস্বপ্নের মতো এ রোগের সূচনা হয় ২০০২ সালের শেষদিকে দক্ষিণ চীনের গুয়াংডংয়ে।

বার্ড ফ্লু

২০০৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বার্ড ফ্লুতে (এইচ৫এন১ ভাইরাস) চার শতাধিক মানুষ মারা যায়। হংকংয়ের পোলট্রি ফার্ম থেকে ছড়িয়ে মানুষে মানুষে সংক্রমিত হয়।

জিকা ভাইরাস

২০১৫ সালের পর লাতিন আমেরিকায় প্রাদুর্ভাব ঘটে জিকা ভাইরাসের। তবে ইবোলা ও জিকা ভাইরাসের মৃত্যুহার বেশি হলেও পৃথিবীজুড়ে খুব বেশি মানুষ এতে আক্রান্ত হননি।

করোনাভাইরাস

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনাভাইরাসের সন্ধান মেলে। তারপর চীন ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এটি। ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে করোনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এটিকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

চীনে সেরকম মারাত্মক প্রভাব না ফেললেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয় করোনাভাইরাস থেকে হওয়া কোভিড-১৯ রোগের জেরে। তারপর করোনা তাণ্ডব শুরু করে আমেরিকা মহাদেশে। ভারতেও রোজ বাড়ছে সংক্রমণ। বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস।

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডওমিটারের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ৩ কোটি ৩৫ লাখ ৬০ হাজার ৮৭৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। আর বাংলাদেশে ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৪৭৯ জন। বিশ্বজুড়ে করোনা প্রাণ কেড়েছে একই সময়ে ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জনের। আর বাংলাদেশে ৫ হাজার ২৫১ জন। যদিও আক্রান্ত হওয়ার পর একটা বড়ো অংশই সুস্থ হয়ে উঠছেন। প্রাণ কাড়লেও আগের অনেক অতিমারির তুলনায় করোনায় মৃত্যুহার অনেকটাই কম– বিশ্বে ৩ শতাংশ আর বাংলাদেশে মাত্র ১.৪৪ শতাংশ। এই কম শক্তি নিয়েই সারাবিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব ফেলেছে করোনা।

তথ্যসূত্র

লাইভ সায়েন্স, হু, ওয়ার্ল্ডওমিটার, প্রথম আলো, আন্দবাজার।

লেখক: সম্পাদনা সহকারী, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

কেমন পৃথিবী আমাদের অপেক্ষায়

শুরুটা চীনের উহান থেকে। এরপর করোনাভাইরাস তার ভয়ের চাদর বিছিয়েছে বিশ্বজুড়ে। আমাদের যাপিত জীবনে যোগ হয়েছে কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন আর সামাজিক দূরত্বের মতো নিত্যনতুন শব্দ। কীভাবে মিলবে মুক্তির পথ, কবে আসবে টিকা– এমন শত ভাবনার পাশাপাশি প্রতিটি সচেতন মানুষ নিশ্চিতভাবেই একবার হলেও ভেবেছেন এই মহামারি শেষে কেমন পৃথিবী পেতে যাচ্ছি আমরা। কতটা বদলে যাওয়া পৃথিবী অপেক্ষমাণ আমাদের জন্য? এমন প্রশ্নের জবাবে মহামারি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার প্রাক্কালে এই সময়ের বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু মতামত নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো। অনুবাদ– আকিল জামান ইনু

> তুলনামূলকভাবে মহামারি ব্যবস্থাপনায় ইউরোপ এবং আমেরিকা গুলিয়ে ফেলেছে পুরো বিষয়টিকে, যা এতদিন ধরে দাবি করে আসা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে কিছুটা হলেও ম্লান করেছে, নিশ্চিত

কম মুক্ত, ধীরগতির উন্নয়ন নিয়ে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন এক পৃথিবী

স্টিফেন এম ওয়াল্ট, রবার্ট অ্যান্ড রেনে বেলফের প্রফেসর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

এই মহামারি রাষ্ট্রক্ষমতাকে সংহত করবে এবং নতুন করে শক্তি জোগাবে জাতীয়তাবাদকে। সংকট মোকাবিলায় প্রতিটি সরকারই গ্রহণ করতে বাধ্য হবে জরুরি কিছু পদক্ষেপ। এই নতুন ক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে আমরা অনেককেই দেখব সংকট শেষে ক্ষমতার কেন্দ্র ছেড়ে যেতে।

কোভিড-১৯ ত্বরান্বিত করবে পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্ষমতার স্থানান্তরকে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুর মহামারি মোকাবিলায় সম্ভাব্য সেরা পথে সাড়া দিয়েছে, প্রাথমিক ভুলগুলো কাটিয়ে উঠে চীনও যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে নাগরিকদের সুরক্ষায়। তুলনামূলকভাবে মহামারি ব্যবস্থাপনায় ইউরোপ এবং আমেরিকা গুলিয়ে ফেলেছে পুরো বিষয়টিকে, যা এতদিন ধরে দাবি করে আসা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে কিছুটা হলেও ম্লান করেছে, নিশ্চিত।

এ কথাও নিশ্চিত করেই বলা যায়, এই মহামারি বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব, তা মেটাতে তেমন কোনো প্রভাব রাখবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯১৮-১৯ সালের মহামারি বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কমাতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি, জাগ্রত হয়নি ক্ষমতাবানদের বিবেক। কোভিড-১৯ও তা পারবে না। আমরা আরও দেখব 'হাইপারগ্লোবালাইজেশন' থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এক পৃথিবী। যেখানে নাগরিকরা রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে নিজেদের সুরক্ষার জন্য এবং রাষ্ট্রের কাছে দাবি থাকবে, তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে বিশ্বায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার। কারণ, বিশ্বায়নের স্বার্থে তারা নিজেরা মূল্য দিতে রাজি হবে না।

সংক্ষেপে কোভিড-১৯ মহামারি এমন এক পৃথিবী গড়ে দেবে, যা কম উন্মুক্ত, কম উন্নয়নশীল এবং দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষয়টি এমন হওয়া উচিত ছিল না; কিন্তু এই মারণ ভাইরাস, অপ্রতুল পরিকল্পনা আর অপরিপক্ব নেতৃত্ব মানবজাতিকে এমনই এক উদ্‌বেগজনক পথে ঠেলে দিয়েছে।

চীনকেন্দ্রিক বিশ্বায়নে প্রাধান্য

কিশোর মাহবুবানি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর, এশিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট

> জাতি থেকে শুরু করে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে এই মহামারির থাবায়। প্রতিটি জাতি নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি নিয়ে এই মহামারি মোকাবিলা করবে এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিজেদের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করবে

কোভিড-১৯ মহামারি বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিপথে তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনবে না। এটি কেবল ইতোমধ্যে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের পরিবর্তে চায়নাকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে। চায়নাকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের গতি ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ কী? কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকুক আর না থাকুক, মুক্তবাণিজ্য চুক্তি এখন তাদের কাছে বিষের মতো। চীন কিন্তু তাদের আস্থা হারায়নি। কিন্তু কেন? এই আস্থা না হারানোর পেছনে রয়েছে গভীর ঐতিহাসিক কারণ। চীনা নেতারা খুব ভালো করেই জানেন, পুরো এক শতাব্দী (১৮৪২-১৯৪৯) তাদের যে অপমান বইতে হয়েছে তার কারণ আর কিছু নয়, সেটা হলো– পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগার নিষ্ফল প্রয়াস। অন্যদিকে গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের কারণ কিন্তু বৈশ্বিক সংযোগ। তাদের সংস্কৃতিও চীনাদের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে। চীনারা এখন বিশ্বাস করে তারা যে কোনো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে সক্ষম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এ মুহূর্তে রয়েছে দুটো পছন্দ। তার প্রাথমিক লক্ষ্য যদি হয় বৈশ্বিক মোড়লিপনা বজায় রাখা, তবে তাকে নতুন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চীনের মোকাবিলায় হতে হবে অগ্রসর। অন্যদিকে তার প্রধান লক্ষ্য যদি হয় মার্কিন নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের, যা ইতোমধ্যে নেমে গেছে সেক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত চীনের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নেওয়া। বুদ্ধিমান যে কেউই বলবেন, সহযোগিতার পথটিই উত্তম। কিন্তু চায়নাকে কেন্দ্র করে মার্কিন রাজনীতিতে যে বিষবাষ্প ছড়িয়েছে, তাতে সুবুদ্ধির প্রাধান্য থাকবে– এমনটা আশা করা কঠিন।

এই মহামারি যদি শুভবোধ জাগায়, সেটি হবে বড়ো প্রাপ্তি

শিব শঙ্কর মেনন, সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ভারত

এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত দেওয়ার সময় আসেনি। তবে আপাতদৃষ্টিতে কিছু বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, এই করোনাভাইরাস মহামারি বদলে দেবে আমাদের রাজনীতির প্রচলিত ধারা, সেটি যেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, তেমনি রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করবে। হতে পারে সামাজিক শক্তিগুলোর ওপর রাষ্ট্রক্ষমতার এক পরিবর্তিত প্রভাব আমরা দেখব। এই মহামারি এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করায় সরকারের সামর্থ্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ইস্যুসহ সমাজের অভ্যন্তরে সামাজিক বিকেন্দ্রীকরণকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করবে। অভিজ্ঞতা বলছে, কর্তৃত্ববাদী কিংবা পপুলিস্ট মতামতধারীরা মহামারি মোকাবিলায় খুব বেশি সাফল্য দেখাতে পারেননি। যদিও কোরিয়া এবং তাইওয়ানের উদাহরণ রয়েছে আমাদের সামনে।

দ্বিতীয়ত, পরস্পর সংযুক্ত এক বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে– এ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। বরং মহামারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু রাজনীতির সব ক্ষেত্রেই ভেতরে ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পরিবর্তন। সেটা হচ্ছে– অধিক স্বায়ত্তশাসন এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে অধিক ক্ষমতা। আমরা হয়তো একটি দরিদ্র হীনমর্যাদাসম্পন্ন এবং ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

তৃতীয়ত, এর মাঝেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আশার আলো আর সুকুমারবৃত্তির পরিচয়। ভারত ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার নেতাদের নিয়ে একটি ভিডিয়ো কনফারেন্সের আয়োজন করেছে একসঙ্গে এই মহামারি মোকাবিলার পথ খুঁজে বের করতে। এই মহামারি যদি আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় প্রতিটি রাষ্ট্রকে আরও বেশি মিলেমিশে কাজ করতে হবে– সেটি হবে একটি বড়ো পাওয়া।

নেতৃত্বের পরীক্ষায় ব্যর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কোরি সাকে, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন আর এককভাবে বিশ্বনেতা বলার কোনো উপায় নেই। কেননা তাদের সরকার নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষায় নিয়েছে বড়ো রকমের ভুল পদক্ষেপ এবং প্রমাণ করেছে নিজেদের অযোগ্যতা। এই মহামারির বৈশ্বিক প্রভাব হিসেবে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রাথমিক তথ্য সরবরাহের ক্ষমতা কমে যাওয়া, যা মহামারি মোকাবিলায় সরকারগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করতে পারত। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দিয়ে নিতে পারত কার্যকর সংগঠকের ভূমিকা। এই ভূমিকা শুধু নিজের নয়, সবার স্বার্থেই হওয়া উচিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে আর সেজন্য বিশ্বকেই আজ তার ব্যর্থতার মূল্য শোধ করতে হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে শুনি মানবিক শক্তির জয়গান

নিকোলাস বার্নস, অধ্যাপক, হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট

এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো বৈশ্বিক সংকট নিঃসন্দেহে কোভিড-১৯ মহামারি। এর ক্ষতের গভীরতা পরিমাপ করা এক্ষুনি সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য সমস্যা পৃথিবীর ৭.৮ বিলিয়ন মানুষের জীবন ফেলেছে হুমকির মুখে। অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাপিয়ে যাবে ২০০৮-২০০৯ এর মহামন্দাকে। আমরা জানি, প্রতিটি বড়ো সংকট অনেকটা ভূমিকম্পের মতো, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ক্ষমতার ভারসাম্যে আনে বিরাট পরিবর্তন।

এটা প্রমাণিত, আজকের দিনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে স্তর, সংকট মোকাবিলায় তা যথেষ্ট নয়। দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এই সংকটেও তাদের বাগ্‌যুদ্ধ থামিয়ে সংকট মোকাবিলায় যথাযথ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি। সেটা তারা করতে পারত সহজেই। এতে তারা দুজনেই হারিয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি তাদের ৫০০ মিলিয়ন অধিবাসীর জন্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তবে আগামী দিনে জাতীয় রাষ্ট্রগুলো ব্রাসেলসকে দেওয়া অনেক ক্ষমতাই প্রত্যাহার করে নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংকট মোকাবিলায় ফেডারেল সরকারের সামর্থ্য আজ ঝুঁকির মুখে।

সবকিছুর পরও প্রতিটি রাষ্ট্রেই আমি দেখি মানবিক শক্তির জয়গান– ডাক্তার, নার্স, রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে এই মহামারি মোকাবিলায় কার্যকর নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর সেটাই আমাদের আশার জায়গা। এই অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে আমরা সফলভাবে মোকাবিলা করব এই নতুন চ্যালেঞ্জ।

বদলে যাবে বিশ্বায়নের পরিচিত ধারণা

রবিন নিবলেট, পরিচালক, সিইও চ্যাতহাম হাউস

এই করোনাভাইরাস মহামারি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বায়নের অর্থনীতির মেরুদণ্ডে একটি বড়ো আঘাত। চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামরিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করছে চীনকে বিচ্ছিন্ন করার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদেরও প্রভাবিত করতে চাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে। কিছুদিন ধরে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে কার্বন নিঃসরণ কমানোর দাবিতে বেড়ে ওঠা জনমতের মোকাবিলায় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে তাদের এবং বৃহৎ কোম্পানিগুলোর আন্তরিকতাও আজ প্রশ্নের মুখে। আর এখন কোভিড-১৯ সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে ঠেলে দিয়েছে অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই একলা চলার মতো শক্তি সংহত করার পরিস্থিতিতে। বাস্তবতা হলো, এভাবেই তাদের মানিয়ে নিতে হবে।

একুশ শতকের শুরুতে চালু হওয়া পারস্পরিক মুনাফার ভিত্তিতে বিশ্বায়নের যে ধারণা, বর্তমান বাস্তবতায় তা নিশ্চিতভাবেই বদলে যাবে। পারস্পরিক লাভের প্রচলিত ধারণার জন্য নতুন মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এ-ও নিশ্চিত যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রণীত বিশ্বায়নের অর্থনীতির যে নীতিমালা, তা-ও খুব দ্রুত ক্ষয়ে যাবে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ নিতে হবে। পুরোনো প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার দিনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সফলভাবে এই মহামারি মোকাবিলার সাফল্যকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আগামী দিনে তাদের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করবেন। কিন্তু এটি মোকাবিলায় যারা ব্যর্থ হবেন, নিজেদের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার সেই পুরোনো সংস্কৃতি তাদের কোনো সুরক্ষা দেবে না।

বিজয়ীরা লিখবেন ইতিহাস

জন অ্যালেন, প্রেসিডেন্ট ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন

ইতিহাসের ধারায় বিজয়ীরা নিজেদের মতো লিখবে ইতিহাস। কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না। জাতি থেকে শুরু করে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে এই মহামারির থাবায়। প্রতিটি জাতি নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি নিয়ে এই মহামারি মোকাবিলা করবে এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিজেদের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করবে। কারও কারও কাছে গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদে বিশ্বাসীরাই বিজয়ী হবেন এই মহামারি সফলভাবে মোকাবিলায়। অন্য পক্ষে মহামারি মোকাবিলায় কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের সাফল্যগাথা রচনা করবেন কেউ কেউ।

যেভাবেই দেখি না কেন, এই সংকট আন্তর্জাতিক ক্ষমতা কেন্দ্রের ভারসাম্যে নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তন আনবে, যা শুধু আমরা কল্পনা করতে পারি। ঠিক কতটা পরিবর্তন করবে, তা বলার সময় আসেনি। কোভিড-১৯ অর্থনীতির গতিকে শ্লথ করে দেবে, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাড়াবে উত্তেজনা। অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে, ব্যক্তি কর্ম হারাবে, বিচ্ছিন্নতা, কর্মহীনতা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য বড়ো ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো পড়বে বড়ো ধরনের চাপের মুখে। আর ফলাফল হচ্ছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি।

অনুবাদক: সহ-সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গণমাধ্যম সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২০ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাফর ওয়াজেদকে একুশে পদক ২০২০ প্রদান করেন

সাংবাদিকতায় একুশে পদক পেলেন জাফর ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও বিস্তারলাভ করে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বলেছেন, নিজের ভাষাকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক-২০২০ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের ভাষার অধিকার, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করা, চর্চা করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদেরই কর্তব্য।

শেখ হাসিনা বলেন, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। আমরা চাই এই গৌরবের ইতিহাস আমাদের দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন জানতে পারে। তিনি বলেন, মাতৃভাষা আন্দোলন শুধু মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল স্বাধিকার আদায়ের, স্বাধীনতার আন্দোলন।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার অংশবিশেষ উল্লেখ করেন। জাতির পিতা বলেন, '১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলন ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।'

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে এবারের একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে সেই পদক তুলে দেন।

সাংবাদিকতায় জাফর ওয়াজেদ, ভাষা আন্দোলনে আমিনুল ইসলাম বাদশা (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) ডালিয়া নওশিন, শঙ্কর রায় ও মিতা হক, শিল্পকলায় (নৃত্য) গোলাম মোস্তফা খান, অভিনয়ে এসএম মহসীন, চারুকলায় শিল্পী ফরিদা জামান, মুক্তিযুদ্ধে হাজী আক্তার সরদার (মরণোত্তর), আবদুল জব্বার (মরণোত্তর) ও ডা. আ আ ম মেসবাহুল হক (মরণোত্তর), গবেষণায় জাহাঙ্গীর আলম ও হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ, শিক্ষায় অধ্যাপক বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, অর্থনীতিতে অধ্যাপক শামসুল আলম, সমাজসেবায় সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাষা ও সাহিত্যে নুরুন নবী, মরহুম সিকদার আমিনুল হক এবং বেগম নাজমুন নেসা পিয়ারি, চিকিৎসায় অধ্যাপক সায়েবা আখতার এবার একুশে পদক পেয়েছেন। এছাড়া গবেষণায় এ সম্মাননা পেয়েছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, সমকাল

১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার ভুয়া জন্মদিন পালনের জন্য বিএনপির ক্ষমা চাওয়া উচিত: তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'এতদিন ধরে ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার ভুয়া জন্মদিন পালনের জন্য জাতির কাছে বিএনপির ক্ষমা চাওয়া উচিত। আর সেই ভুয়া জন্মদিন না পালনের ঘোষণা দিয়ে বাহবা নেওয়ার চেষ্টাও অপরাধ।'

১৪ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড: ষড়যন্ত্র দেশে-বিদেশে' সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট, যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, হঠাৎ খালেদা জিয়া সেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন ঘোষণা দিয়ে তো হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করার শামিল। তাই আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাব, তারা যে হঠাৎ করে ১৫ আগস্টকে খালেদা জিয়ার জন্মদিন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটি যে মিথ্যা-বানোয়াট ছিল, সেটির জন্য জাতির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে, তাহলে জাতি তাদের ক্ষমা করলেও করতে পারে।'

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক নেতাদের মধ্যে আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ওমর ফারুক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্মসম্পাদক শাহেদ চৌধুরী ও মাঈনুল আলম সেমিনারে বক্তব্য দেন।

সভাপতির বক্তৃতায় সাইফুল আলম বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা ছিল এবং যারা আগে ও পরে এ হত্যাকে সমর্থন করেছে, তাদের মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের আওতায় আনা এখন সময়ের দাবি।' জাতীয় প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শ্যামল দত্ত 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড: ষড়যন্ত্র দেশে-বিদেশে' মূল প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও এর পূর্বাপর ষড়যন্ত্রের পটভূমি বর্ণনা করেন।

সূত্র: ১৫ আগস্ট ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদা দেন বঙ্গবন্ধু: তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, আর বিএনপি ২০০৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে এক কলমের খোঁচায় তা কেড়ে নিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ১২ আগস্ট প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদসহ অতিথিরা

মিলনায়তনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের সহায়তায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের অনেক উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে প্রেস ইনস্টিটিউট, প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়, তার হাত ধরেই ওয়েজবোর্ড গঠিত হয়। তিনি সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন, যেটি ২০০৬ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এক কলমের খোঁচায় কেড়ে নিয়ে তাদের শ্রমিক বানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তারা (বিএনপি) সাংবাদিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখলেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক, ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয়।

সূত্র: ১৩ আগস্ট ২০২০, কালের কণ্ঠ

করোনায় অর্থ সহায়তা পেলেন ডিইউজের সদস্যরা

১১ জুলাই প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের সহায়তার অর্থের চেক বিতরণ করেন।

করোনাকালে সংকটে পড়া সাংবাদিকদের জন্য এ বিশেষ সহায়তা দিচ্ছে সরকার।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সাংবাদিকরা করোনাকালে কাজ করছেন, অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন, কয়েকজন মারা গেছেন। সাংবাদিকরা হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মালিকরা চাইলেও গণমাধ্যম চালু থাকত না।

মানবিক বিবেচনায় সরকার যেমন সাংবাদিকদের সহায়তা করছে, এ সময় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের অনেকের সাময়িক কষ্ট হলেও গণমাধ্যমকর্মীদের বেতনভাতা নিয়মিত পরিশোধ ও চাকরিচ্যুতি না করার জন্য অনুরোধ করেন ড. হাছান মাহমুদ।

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় সরকারি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সব মন্ত্রণালয়ে পত্র ও তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে করে সংবাদকর্মীদের বেতন দিতে সুবিধা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার আলোচনার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ও করোনা উপসর্গে মারা যাওয়া সাংবাদিকদের প্রত্যেকের পরিবারকে ইতোমধ্যে তিন লাখ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সেই পরিবাররা আবেদন করলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আরও সহায়তা দেওয়া হবে।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল।

সহায়তাপ্রাপ্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তৃতা করেন আতাউর রহমান জুয়েল ও মোহাম্মদ তারিক আল বান্না। বক্তারা এ সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

এছাড়া চলমান সহায়তার প্রথমপর্বে এ পর্যন্ত ৪৮টি জেলায় সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেস ক্লাবের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কাছে এ সহায়তা পৌঁছেছে বলে জানান ডিইউজে সভাপতি।

সূত্র: ১১ জুলাই ২০২০, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

সাংবাদিকদের সহায়তা চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চিফ হুইপ

করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ জুলাই বিকালে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও চেক বিতরণ করেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের ত্রাণ কার্যক্রম আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো ছিল না। আজ পুরো পৃথিবীতে করোনা সমস্যা। এই মহামারিতে সবাই আতঙ্কিত। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বাংলাদেশে করোনা মহামারি আসার পরে আমরা একটি ঝড়, একটি নদীভাঙন, একটি বন্যা মোকাবিলা করেছি। একই সময় চারটি দুর্যোগ এই সরকার মোকাবিলা করছে। আজ নদীভাঙনে বহু এলাকার স্কুল ভেঙে যাচ্ছে, মানুষের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, বসতভিটা নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বহু এলাকায় মানুষ পানিবন্দি। এই যে ইদ উপলক্ষ্যে মানুষ কোরবানি দেবে, সেই সম্পদও কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

সাংবাদিকদের সহায়তা চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী

আমাদের অনেক ফসলও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্যোগকালীনও ত্রাণের অভাবে কোনো মানুষ না খেয়ে মারা যায়নি। আর এটিই হচ্ছে বর্তমান সরকারের সফলতা।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে যেমন বাংলাদেশ হতো না, তেমনি শেখ হাসিনার জন্ম না হলে আমরা একটি উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখতে পারতাম না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের কারণেই এই করোনা মহামারির সময়েও ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানসহ আরও অন্যান্য কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। শেখ হাসিনা না থাকলে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সঠিক উপায় পেতাম না। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার ফলে যে কোনো দুর্যোগের সময় সাংবাদিকদের সহায়তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই সময়ে কিছু কিছু সংবাদপত্র বন্ধ করাসহ কর্মক্ষম মানুষকে চাকরিচ্যুত করা দুঃখজনক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ। সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিইউজে সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু।

সূত্র: ৩১ জুলাই ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী

দেশে সাড়ে তিন মাসে একজন মানুষও না খেয়ে মারা যাননি

ঢাকার পর চট্টগ্রামেও প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত করোনাকালীন সহায়তার চেক পেলেন সাংবাদিকরা। ৩ জুলাই চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ১৩৬ সাংবাদিককে করোনাকালীন সহায়তার চেক তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এর বাইরেও এ সময় চট্টগ্রামের ২৫ জন সাংবাদিককে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন আয়োজিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, করোনায় সারাবিশ্ব যখন পর্যুদস্ত, তখন শুরু থেকেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনগণের শারীরিক সুরক্ষার পাশাপাশি খেটে খাওয়া ২০ শতাংশ দরিদ্র মানুষের জন্য ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞ এ সময় করোনা নিয়ে নানা মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সবার মতামত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে গেল সাড়ে তিন মাসে একজন মানুষও না খেয়ে মারা যাননি। অনেকে আশা করেনি এ রকম সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে। বাংলাদেশে ৭ কোটি মানুষ সরাসরি ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে। করোনাকালীন কঠিন সময়ে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতিকে অমানবিক উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমরা নবম ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করেছি কিন্তু সম্পাদকরা তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেননি, যা দুঃখজনক।

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ম. শামসুল ইসলামের সঞ্চালনায় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের সহসভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি আলী আব্বাস, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, বিএফইউজের যুগ্ম মহাসচিব মহসীন কাজী প্রমুখ।

করোনাকালীন সহায়তার চেক প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আর বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক চট্টগ্রামের ২৫ জন সাংবাদিক ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন।

সূত্র: ৪ জুলাই ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

নোয়াব ও সম্পাদক পরিষদের আলোচনাসভা

গণমাধ্যম বিশ্লেষক হুয়ান সেনর বলেছেন, অনলাইন আর ডিজিটাল যুগের দ্রুত বিকাশের ফলে ছাপা গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তবে চিরাচরিত ছাপা কাগজকে ভবিষ্যতের সেতু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তার মতে, ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে পক্ষপাতহীন সুসাংবাদিকতাই সাংবাদিকতাকে পরিবর্তনশীল সময়ে বাঁচিয়ে রাখবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ডেইলি স্টার মিলনায়তনে জ্যেষ্ঠ গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময় হুয়ান সেনর এ মন্তব্য করেন।

নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (নোয়াব) ও সম্পাদক পরিষদের যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষেদের সভাপতি মাহফুজ আনাম। পরিবর্তিত সময়ের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন গণমাধ্যমের জন্য সৃজনশীল ব্যবসা কৌশল নিয়ে হুয়ান সেনর আলোচনা করেন। তার মতে, অনলাইন আর ডিজিটাল যুগের প্রসারের কালে ছাপা গণমাধ্যমকে ভবিষ্যতের সেতু হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। আর ছাপা কাগজের খবর হতে হবে একেবারে বিশেষ কিছু এবং বিশ্লেষণধর্মী। ডিজিটাল মাধ্যম যদি তথ্য দেয়, ছাপা কাগজের খবর হবে সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত কিছু।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন, ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক জাফর সোবহান, সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ প্রমুখ।

সূত্র: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

গাফ্‌ফার চৌধুরীকে মুজিববর্ষের বিশেষ সম্মাননা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে 'একুশের গান' কবিতার রচয়িতা আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে লন্ডনে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১ মিনিটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনালগ্নে গাফ্‌ফার চৌধুরীর হাতে এ সম্মাননার ক্রেস্ট তুলে দেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম। হাইকমিশন জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন মিশনে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটিতে কণ্ঠ মেলান হাইকমিশনার, মিশনের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশি-ব্রিটিশ কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা। সম্মাননা পাওয়ার পর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে এ ধরনের আয়োজনের জন্য হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীমসহ লন্ডন মিশনের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী।

সূত্র: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০, কালের কণ্ঠ

পিওওয়াই পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ৭৭তম পিকচার্স অব দ্য ইয়ার ইন্টারন্যাশনালে (পিওওয়াই) প্রথম হয়েছেন প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক শুভ্র কান্তি দাশ। এবারের প্রতিযোগিতায় তার 'দ্য ডেথ অব বাংলাদেশি সিনেমা' শীর্ষক ফটো স্টোরিটি 'লোকাল নিউজ পিকচার স্টোরি' শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে। ১৯৪৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়ার রেনল্ডর্স জার্নালিজম ইনস্টিটিউট প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

শুভ্র কান্তি দাশের কাজের প্রধান ক্ষেত্র সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ে ডকুমেন্টারি আলোকচিত্র।

সূত্র: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

তাসমিমা হোসেনকে জ্ঞানালোক পুরস্কার প্রদান বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের

লৌহজং উপজেলার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রাঙ্গণে ১১ জানুয়ারি অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের দ্বিতীয় সম্মিলন ও জ্ঞানালোক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। অনুষ্ঠানে দুই গুণী ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক পুরস্কার দেওয়া হয়।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল কর্ম ও অবদানকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সংগঠিত করার উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯ সালের জ্ঞানালোক পুরস্কার পান দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যা সম্পাদক তাসমিমা হোসেন। শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, সাংবাদিকতা, জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি-উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন ২০১৫ সাল থেকে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভাপতি ড. নূহ-উল-আলম লেনিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট নাট্যজন নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। কবি ঝর্ণা রহমানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের লৌহজং কেন্দ্রের আহ্বায়ক কবির ভূঁইয়া কেনেডি। ফাউন্ডেশনের সম্মিলন প্রস্তুতি পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, জ্ঞানচর্চাকারী ও আইন প্রতিষ্ঠাকারী চিরঞ্জীব। বিক্রমপুরে এমন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্কর। হিংসা, বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা হচ্ছে সংঘাতের জন্য দায়ী। মানুষ চলে যায় কিন্তু কৃষ্টি রেখে যায়।

সূত্র: ১২ জানুয়ারি ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

'সাফল্যের এক বছর' শিরোনামে দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয় ২০ জানুয়ারি। রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুলের হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান।

কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন, নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম সম্পাদক জুয়েল মাজহারসহ বসুন্ধরা গ্রুপ এবং ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, '১১ বছর আগে দেশে পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৭৫০। এখন আছে ১৩ শর বেশি। টিভি চ্যানেল ছিল ১০টি, এখন ৩৪টি। হাজার হাজার অনলাইন। অর্থাৎ গত ১১ বছরে দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। দেশ রূপান্তর সেই বিকাশেরই একটি অংশ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে দেশ রূপান্তরের আরও সফলতা কামনা করি।'

সূত্র: ২১ জানুয়ারি ২০২০, কালের কণ্ঠ

নোয়াবের নতুন কমিটি

সমকালের প্রকাশক এ কে আজাদ সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব)

কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সংগঠনের সহসভাপতি হয়েছেন নিউ এজের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এএসএম শহীদুল্লাহ খান এবং কোষাধ্যক্ষ মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য নোয়াবের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।

নোয়াবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যরা হলেন মতিউর রহমান (প্রথম আলো), তাসমিমা হোসেন (ইত্তেফাক), মাহফুজ আনাম (ডেইলি স্টার), নঈম নিজাম (বাংলাদেশ প্রতিদিন), এমএ মালেক (আজাদী), মোজাম্মেল হক (করতোয়া), এম শামসুর রহমান (ইনডিপেনডেন্ট), তারিক সুজাত (ভোরের কাগজ) ও দেওয়ান হানিফ মাহমুদ (বণিক বার্তা)।

নির্বাচন বোর্ডের প্রধান রিয়াজউদ্দিন আহমেদ নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন বোর্ডের আরও দুই সদস্য ছিলেন এএমএম বাহাউদ্দীন ও শাহ হুসাইন ইমাম।

সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

ডিইউজের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম তপু

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কুদ্দুস আফ্রাদ (আনন্দবাজার) এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন সাজ্জাদ আলম খান তপু (যমুনা টিভি)। ২৯ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাশেম হুমায়ুন এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন সহসভাপতি এমএ কুদ্দুস, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, কোষাধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ জিহাদুর রহমান জিহাদ, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দুলাল খান, জনকল্যাণ সম্পাদক সোহেলী চৌধুরী এবং দফতর সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরী। এছাড়া সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন– সুরাইয়া অণু, জিএস মাসুদ ঢালী, শাকিলা পারভিন, শাহনাজ পারভিন এলিস, রাজু হামিদ, ইব্রাহিম খলিল খোকন, সলিমুল্লাহ সেলিম, অজিত কুমার মহলদার এবং এএম শাহাজাহান মিয়া। এর আগে সকাল ৯টা থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। নির্বাচনে ৩ হাজার ১৬০ জন ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৪৩ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবারের নির্বাচনে পাঁচ প্যানেলে ৮৯ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সূত্র: ১ মার্চ ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

ক্র্যাবের সভাপতি খায়ের সাধারণ সম্পাদক বিকু

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটির ২০২০ সালের নির্বাচনে সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক পূর্বাঞ্চলের আসাদুজ্জামান বিকু। অন্যান্য পদে বিজয়ীরা হলেন সহসভাপতি চ্যানেল আইয়ের মোরছালীন বাবলা, যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাখাওয়াত হোসেন কাওসার, অর্থ সম্পাদক আবু হেনা রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক জনকণ্ঠের নিয়াজ আহমেদ লাবু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হরলাল রায় সাগর, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক এটিএন বাংলার জিএম তসলিম উদ্দিন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সংবাদের সাইফ বাবলু, দপ্তর সম্পাদক নয়া দিগন্তের শহিদুল ইসলাম রাজী, কল্যাণ সম্পাদক আমাদের অর্থনীতির ইসমাইল হোসেন ইমু এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে দৈনিক জনতার শাহীন আলম। এছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত তিনজন হলেন মানবজমিনের রুদ্র মিজান, এসএ টিভির বাতেন বিপ্লব ও বাংলা নিউজের আবাদুর রহমান শিমুল।

সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

ডিক্যাব সভাপতি মন্টি সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর

২০২০ সালের জন্য ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ডিক্যাব) সভাপতি হয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোরের আঙ্গুর নাহার মন্টি ও সাধারণ সম্পাদক বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের তৌহিদুর রহমান। ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভার পর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সহসভাপতি রবিউল হক (ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান (মানবজমিন), কোষাধ্যক্ষ আতিকুর রহমান (এশিয়ানমেইল২৪.কম), দফতর সম্পাদক জেসমিন আক্তার পাপড়ি (জাগোনিউজ২৪.কম) নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ইশরাত জাহান ঊর্মি (ডিবিসি নিউজ), খুররম জামান (বার্তা২৪.কম), মাসুদ করিম (যুগান্তর), রাহীদ এজাজ (প্রথম আলো) ও রাশেদ মেহেদী (সমকাল)।

নির্বাচনে ডিক্যাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলমগীর হোসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং এম শফিকুল করিম সাবু ও নিজামউদ্দিন আহমেদ নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। বিদায়ী সভাপতি রাহীদ এজাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব ও কোষাধ্যক্ষ মেহেদি হাসান তালুকদার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সূত্র: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, দৈনিক ইত্তেফাক

দিল্লিতে অনুষ্ঠান বিনিময় উদ্বোধন

ভারতে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার

রাষ্ট্রায়ত্ত টিভি চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর ভারতে এবার বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদকার ১৪ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বেতার ও ভারতের আকাশবাণীর অনুষ্ঠান বিনিময় কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এতে ভারতে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার।

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান আকাশবাণী চ্যানেলে কলকাতায় এফএম ১০০.১ মেগাহার্টজ, আগরতলায় এফএম ১০১.৬ মেগাহার্টজ এবং আকাশবাণী অ্যাপ ও ডিটিএইচের মাধ্যমে পুরো ভারতে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা এবং বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় একযোগে সম্প্রচার শুরু হয়েছে। একই সময়ে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের এফএম ১০৪ মেগাহার্টজে সম্প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত নুজহাত ইয়াসমিন এবং ভারতের এনএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিসিএ কল্যাণী দুই দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের মধ্যে যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনা চুক্তিতে সই করেন। এ সময় বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বেতার ও চলচ্চিত্র খাতে এ সহযোগিতা দুই দেশের জনগণ ও সরকারের বন্ধুত্বের এক অনন্য মাইলফলক। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদকার বলেন, এ সহযোগিতা দুদেশের অন্যান্য খাতে সহযোগিতাকেও প্রসারিত করবে।

ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার এটিএম রকিবুল হক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত প্রেস মিনিস্টার ফরিদ হোসেন, ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব রবি মিত্তাল, প্রসার ভারতীর প্রধান নির্বাহী শশী শেখর ভেম্পতি ও অতিরিক্ত সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ১৫ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস

সাংবাদিকদের জীবনে বছরে একটি দিন আসে, যখন সংবাদমাধ্যমের মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চারিত হয়; দেশে দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কী অবস্থা, সেদিকে ফিরে তাকানো হয়। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৩ মে'কে বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ বছর বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে এসেছে এই দিবসটি। ফলে সংকটময় পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই সংকটের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার পাশাপাশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো সচল রাখতে সরকারসহ অংশীজনদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

সূত্র: ৩ মে ২০২০, কালের কণ্ঠ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ডিজইনফেকশন চেম্বার উদ্বোধন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, করোনা মহামারির মধ্যে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। সবকিছু লকডাউন হলেও গণমাধ্যম খোলা থাকে। এ পর্যন্ত দেশে ৬০ জনের মতো গণমাধ্যমকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তার প্রিয় বন্ধুপ্রতিম সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনকে হারিয়েছেন। ৬ মে সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ডিজইনফেকশন চেম্বার উদ্বোধনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সব সময় মন্ত্রী ছিলাম না বা থাকব না; কিন্তু আমি সব সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে ছিলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সব সাংবাদিকের করোনা পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেছি, তারা সে ব্যবস্থা করেছে। বিশেষ বুথের জন্যও তাদের তাগাদা দেব।' তিনি আরও বলেন, দুস্থ সাংবাদিকদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে। শিগগিরই কিছু করতে পারবেন বলে আশা করেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী অনুষ্ঠানে ডিআরইউ নেতাদের কাছে অ্যান্টিসেপটিক সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করেন। ডিআরইউ সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ডিজইনফেকশন চেম্বার প্রদানকারী সংগঠন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অব বাংলাদেশের (এনআইবি) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও ডিআরইউ সহসভাপতি নজরুল কবীর। ডিআরইউর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোরসালিন নোমানী, দৈনিক বর্তমানের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মোতাহার হোসেন প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ০৭ মে ২০২০, সমকাল

করোনায় সাংবাদিকের মৃত্যু

তিন পরিবারকে ১৫ লাখ টাকা অনুদান দিল বসুন্ধরা গ্রুপ

করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারানো তিন সাংবাদিকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ। ওই তিন সাংবাদিকের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে মোট ১৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে দেশের বৃহত্তম এই শিল্পগোষ্ঠী। বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর ১২ জুলাই বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টার-১-এ স্বজনহারা তিন পরিবারের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন।

করোনায় প্রাণ হারানো দৈনিক সময়ের আলোর প্রধান প্রতিবেদক ও নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবীর খোকনের পক্ষে তার স্ত্রী শারমীন সুলতানা রীনা, সিনিয়র সাব-এডিটর মাহমুদুল হাকিম অপুর পক্ষে তার স্ত্রী আরিফা সুলতানা ও ভোরের কাগজের আসলাম রহমানের পক্ষে তার স্ত্রী ফাতেমা রহমান এই চেক গ্রহণ করেন। বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের (ইডব্লিউএমজিএল) পরিচালক ও কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ১৩ জুলাই ২০২০, কালের কণ্ঠ

বাসস-এর চেয়ারম্যান আরেফিন সিদ্দিক

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে বাসসের ১৩ সদস্যের পরিচালনা বোর্ডও পুনর্গঠন করা হয়েছে। ১৫ জুলাই তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে

বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেক, একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক, দৈনিক সংবাদের সম্পাদক আলতামাশ কবিরকে বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রেস), অর্থ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন করে প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি এবং বাসসের নগর সম্পাদক মধুসূদন মণ্ডলকে বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে।

সূত্র: ১৬ জুলাই ২০২০, প্রথম আলো

পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন তিন কাশ্মীরি সাংবাদিক

অবরুদ্ধ কাশ্মীরের ছবি ক্যামেরায় ধারণ করে ২০২০ সালের পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছেন জম্মু-কাশ্মীরের তিন আলোকচিত্র সাংবাদিক। তাঁরা হলেন দার ইয়াসিন, মুখতার খান ও চান্নি আনন্দ। তিনজনই এপিতে কর্মরত। তাঁরা ফিচার ফটোগ্রাফিতে পুরস্কার পান।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা রহিত করে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়। তাতে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা চড়াও হন। এসব দৃশ্য লুকিয়ে ক্যামেরাবন্দি করেন এপির এই তিন সাংবাদিক।

পুলিৎজার কর্তৃপক্ষ বলেছে, নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আড়ালে থেকে কাশ্মীরে সামরিক অভিযান ও প্রাত্যহিক জীবনের ছবি তুলেছেন ওই তিনজন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে চার ফটোগ্রাফিতে তাদের পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সূত্র: ৬ মে ২০২০, প্রথম আলো

৯২তম অস্কার পুরস্কার প্রদান
সেরা ছবি প্যারাসাইট শ্রেষ্ঠ অভিনেতা জোয়াকিন অভিনেত্রী রেনে

লস অ্যাঞ্জেলসের ডলবি থিয়েটারে ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত হয় অস্কারের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এবারের আসরে নতুন ইতিহাস গড়েছে কোরিয়ান সিনেমা 'প্যারাসাইট'। ইংরেজি সিনেমার রেকর্ড ভেঙে ৯২তম আসরের সেরা সিনেমা 'প্যারাসাইট'।

প্রথমবার ইংরেজি ছবির বাইরে কোনো পরিচালককে সেরা হিসেবে বেছে নিল অস্কারের মঞ্চ। এছাড়া সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার সিনেমা ও সেরা অরিজিন্যাল স্ক্রিনপ্লে ক্যাটাগরিতেও পুরস্কার পায় 'প্যারাসাইট'। সেরা ছবি না পেলেও 'জোকার' ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের পুরস্কার পেলেন জোয়াকিন ফিনিক্স। সেরা অভিনেতা হিসেবে তার নাম ঘোষণা হতেই আপ্লুত জোয়াকিন কান্নায় ভেঙে পড়েন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই কথাই ব্যক্ত করলেন অভিনেতা। সেরা অরিজিন্যাল স্কোরের (মিউজিক) জন্যও অস্কার পেল জোকার।

'জুডি' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রী হলেন রেনে জেলওয়েগার। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অস্কার উঠল তাঁর হাতে।

৯২তম অস্কারের একটি দৃশ্য

একনজরে অস্কার

সেরা ছবি: প্যারাসাইট
সেরা পরিচালক: বং জুন হো (প্যারাসাইট)
সেরা অভিনেতা: হোয়াকিন ফিনিক্স (জোকার)
সেরা অভিনেত্রী: রেনে জেলওয়েগার (জুডি)
সেরা সহ-অভিনেতা: ব্র্যাড পিট (ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড)
সেরা সহ-অভিনেত্রী: লরা ডার্ন (ম্যারেজ স্টোরি)
সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম : প্যারাসাইট
সেরা সিনেম্যাটোগ্রাফি: রজার ডেকিন্স (১৯১৭)
সেরা এডিটিং: মাইকেল ম্যাককাস্কার এবং অ্যান্ড্রু বাকল্যান্ড (ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি)
সেরা অরিজিন্যাল সং: এলটন জন ও বার্নি তপিন (লাভ মি এগেইন)
সেরা মিউজিক (অরিজিন্যাল স্কোর) : হিদুর গুয়ানদত্তির (জোকার)
সেরা সাউন্ড মিক্সিং: মার্ক টেলার ও স্টুয়ার্ট উইলসন (১৯১৭)
সেরা সাউন্ড এডিটিং: ডোনাল্ড সিলভেস্টার (ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি)
সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার: আমেরিকান ফ্যাক্টরি
সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট: লার্নিং টু স্কেটবোর্ড ইন আ ওয়ারজোন
সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড
সেরা কস্টিউম ডিজাইন: জ্যাকলিন ডুরান (লিটল উইমেন)
সেরা অরিজিন্যাল স্ক্রিনপ্লে: প্যারাসাইট

সূত্র: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক

ফিলিস্তিনি নারী সাংবাদিকের আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

ফিলিস্তিনের নারী সাংবাদিক সাথা হাম্মাদ মর্যাদাপূর্ণ 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড মিডিয়া নিউ ভয়েস' পুরস্কার লাভ করেছেন। পশ্চিম তীরের অধিবাসী এই ফ্রিল্যান্সার নারী সাংবাদিক মিডল ইস্ট আইয়ের হয়ে কাজ করেন। বিচারকরা সাথা হাম্মাদের কাজের প্রশংসা করে বলেন, 'সে ব্যতিক্রমধর্মী ও সমৃদ্ধ কাজ করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে তার। হাম্মাদের কাজের গ্রহণযোগ্যতার আরও কারণ হলো, সে পশ্চিম তীরে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করে। তাঁকে আটক করা হয়েছে এবং সে চেকপোস্টে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছে।'

গত বছর ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসম্যান রাশিদা তালিবের দাদির সাক্ষাৎকার নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আলোচনায় আসেন সাথা হাম্মাদ। ইসরাইল সরকার রাশিদা তালিবের পশ্চিম তীর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারির পর তার দাদি মুফতিয়া ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বক্তব্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তুলে ধরে।

সূত্র: ২১ জুন ২০২০, কালের কণ্ঠ

শোক সংবাদ

মুশাররাফ করিম মঞ্জু

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ও প্রবীণ সাংবাদিক মুশাররাফ করিম মঞ্জু (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন। ১১ জানুয়ারি ময়মনসিংহে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য মুশাররাফ করিম দৈনিক দিনকালের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া অধুনালুপ্ত দৈনিক দেশসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির পরিচালকও ছিলেন।

আবুল বাশার খান

মোহনা টেলিভিশনের কুমিল্লা জেলা প্রতিনিধি আবুল বাশার খান (৬১) ১১ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন (ইনালিল্লাহি ... রাজিউন)। আবুল বাশার হৃদরোগে আক্রান্ত হলে কুমিল্লার সিডিপ্যাথ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সৈয়দ জিয়াউর রহমান

প্রবীণ সাংবাদিক ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক আন্তর্জাতিক বেতার ভাষ্যকার সৈয়দ জিয়াউর রহমান (৮৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৩১ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ম্যারিল্যান্ডের হলিক্রস হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ ম্যারিল্যান্ডে দাফন করা হয়েছে। সৈয়দ জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে যোগ দেন। ২০১১ সালে অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানেই নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনের ডায়েরি, মিতালিসহ অনেক মৌলিক অনুষ্ঠান গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা করেছেন। সৈয়দ জিয়াউর রহমান ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় জন্মগ্রহণ করেন।

দীপু হাসান

সিনিয়র সাংবাদিক দীপু হাসান (৫৩) ইন্তেকাল করেছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আরামবাগে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন দীপু।

দীপু হাসান পূর্বপশ্চিম বিডিডট নিউজের প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি কর্মজীবনে প্রথম আলো, আজকের কাগজ, এনটিভি, যমুনা টিভি, একাত্তর টিভিসহ প্রথমসারির কয়েকটি গণমাধ্যমে কাজ করেছেন।

আহসান হামিদ

বিশিষ্ট সাংবাদিক আহসান হামিদ (৬৮) মারা গেছেন। তিনি ১০ মার্চ রাজধানীর মিরপুর আল হেলাল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। আহসান হামিদ নয়া দিগন্ত ও সংবাদসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

কামাল লোহানী

ভাষাসৈনিক, গুণী সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক কামাল লোহানী (৮৬)। ২০ জুন রাজধানীর মহাখালীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংবাদিক হিসেবে, সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় কামাল লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার খান সনতলায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্ত্রীর কবরে সমাহিত করা হয়।

নিমাই ভট্টাচার্য

চলে গেলেন বাংলা ভাষার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য। তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস হচ্ছে 'মেমসাহেব'। এই

উপন্যাসই তাঁকে লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। ২৫ জুন তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা দে'জ পাবলিশিং। নিমাই ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৩১ সালে। নিমাই ভট্টাচার্যের আদিনিবাস বাংলাদেশের যশোরে। যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশনে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন তিনি। তারপর ১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় চলে যান কলকাতায়। পেশাগত জীবন শুরু হয় সাংবাদিকতা দিয়ে। জীবদ্দশায় সাহিত্যকর্মের জন্য অসংখ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন বরেণ্য এই কথাসাহিত্যিক।

ডিপি বড়ুয়া

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক ভাষাসৈনিক ডিপি বড়ুয়া (দেবপ্রিয় বড়ুয়া) আর নেই। ৮ জুলাই ভোর ৫টায় রাজধানীর মগবাজারের বাসায় তিনি মারা যান। ডিপি বড়ুয়া ১৯৩৪ সালের ১০ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের মহামুনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে দৈনিক মর্নিং নিউজ দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

রাশীদ উন নবী বাবু

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানলেন সিনিয়র সাংবাদিক রাশীদ উন নবী বাবু (৬৪)। ৮ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৯৭৪ সালে বগুড়ার দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিতার কর্মজীবন শুরু। পরে তিনি আজকের কাগজ, দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, সমকাল, যুগান্তর, আমার দেশ, ইনকিলাব, বাংলার বাণী, দেশ বাংলায় কাজ করেছেন। দৈনিক সকালের খবরের সম্পাদক ছিলেন তিনি। সর্বশেষ তিনি প্রকাশিতব্য দৈনিক আমার দিন পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া এনটিভি ও চ্যানেল ওয়ানে বার্তা বিভাগের শীর্ষ পদেও কাজ করেছেন।

মাশুক চৌধুরী

চলে গেলেন কবি ও সাংবাদিক মাশুক চৌধুরী (৭৩)। ২৩ জুন তিনি রাজধানীর মগবাজারের

রাশমনো হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মাশুক চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রধান বার্তা সম্পাদক ছিলেন। মাশুক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে লেখাপড়া শেষে ১৯৭২ সালে দৈনিক গণকণ্ঠ থেকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি দৈনিক সংবাদ, দৈনিক খবর, দৈনিক দেশসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'মুক্তিযুদ্ধ প্রিয়তমা আমার', 'নির্বাচিত কবিতা', 'স্বর্গের রেপ্লিকা', 'অত্যাগসহন' ও 'নদীর নাম দুঃসময়'।

ফখরে আলম

যশোরের প্রথিতযশা সাংবাদিক দৈনিক কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি কবি ফখরে আলম (৬০) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৪ মে যশোর জেনারেল হাসপাতালে তিনি মারা যান। ব্ল্যাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আট বছর তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। গ্রামের বাড়ি শহরতলীর চাঁচড়ায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ১৯৮৫ সালে সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। এরপর দৈনিক আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা, মানবজমিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, আমাদের সময়, যায়যায়দিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন নান্নু

না-ফেরার দেশে চলে গেলেন দৈনিক যুগান্তরের অপরাধ বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন নান্নু। ১৩ জুন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১২ জুন রাজধানীর আফতাবনগরের জহিরুল ইসলাম সিটির নিজ ফ্ল্যাটে আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন নান্নু। তাঁর শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে যায়। ফ্ল্যাটটির একই কক্ষে গত ২ জানুয়ারি আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান নান্নুর একমাত্র ছেলে স্বপ্নিল আহমেদ পিয়াস।

খন্দকার মহিতুল ইসলাম

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার মহিতুল ইসলাম (৬৮) মারা গেছেন। তিনি ২৯ এপ্রিল ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ইউনাইটেড হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। সাংবাদিক খন্দকার মহিতুল ইসলাম ডেইলি অবজারভারসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ছাড়াও জাতীয় বার্তা সংস্থা বাসসের নিউজ কনসালট্যান্ট ছিলেন। এছাড়া তিনি দৈনিক জনতার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নিকুঞ্জ-১ জামে মসজিদে জানাজা শেষে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

খোন্দকার মোজাম্মেল হক

প্রবীণ সাংবাদিক-মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মোজাম্মেল হক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৯ জুন তিনি মারা যান। 'গেদু চাচা'খ্যাত মোজাম্মেল হক 'আজকের সূর্যোদয়' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। আশির দশকে তিনি সাপ্তাহিক 'সুগন্ধা'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা 'গেদু চাচার খোলা চিঠি' ছিল খুবই জনপ্রিয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় প্রথম জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ ফেনীর ছাগলনাইয়ায় গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁর লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবেদ মাহমুদ চৌধুরী

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের হাসাননগর পূরবী এলাকার বাসিন্দা আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার ও সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ পত্রিকার সম্পাদক আবেদ মাহমুদ চৌধুরী (৪৫) ২২ জুলাই নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। আবেদ মাহমুদ চৌধুরী দুই যুগ ধরে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক সুনামগঞ্জ সংবাদ, জাতীয় দৈনিক আজকের কাগজে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন বহুদিন। তিনি সুনামগঞ্জ প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও সুনামগঞ্জ রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য ছিলেন।

হুমায়ুন কবীর খোকন

দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবীর খোকন (৫০) আর নেই। ২৮ এপ্রিল উত্তরার একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ঢাকাস্থ কুমিল্লা সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সদস্য ছিলেন। শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মারা যাওয়া সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনের নমুনা পরীক্ষায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায়।

আসলাম রহমান

দৈনিক ভোরের কাগজের অপরাধ বিভাগের স্টাফ রিপোর্টার আসলাম রহমান (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৭ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তিনি মারা যান।

সাংবাদিক আসলাম রহমান ২০০০ সালে মানবজমিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। ২০০৬ সালে তিনি সান্ধ্যকালীন দৈনিক দিনের শেষে পত্রিকায় যোগ দেন। সেখান থেকে ভোরের কাগজে অপরাধ বিভাগে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির
সিনিয়র সদস্য। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিজাব) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মো. নজরুল ইসলাম

যুগান্তরের সিনিয়র সম্পাদনা সহকারী মো. নজরুল ইসলাম (৫৬) ৩০ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। কর্মজীবনে তিনি যুগান্তর ছাড়াও দৈনিক গণকণ্ঠ, বাংলার বাণী, জনতা, ইনকিলাব, রূপালী, লালসবুজ, ভোরের কাগজ, নয়া দিগন্ত, ডেসটিনিসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদনা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। জানাজা শেষে রাজধানীর মেরাদিয়া পঞ্চায়েত কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মোস্তফা কামাল সৈয়দ

খ্যাতনামা টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান মোস্তফা কামাল সৈয়দ (৭৫) আর নেই। করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৩১ মে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জানাজা শেষে তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। দীর্ঘদিন তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানপ্রধান ও উপপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এম মিজানুর রহমান

করোনা উপসর্গ নিয়ে দৈনিক বাংলাদেশের খবরের সিনিয়র ফটোসাংবাদিক এম মিজানুর রহমান খান (৫২) মারা গেছেন। ২০ মে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে করোনা পরীক্ষা করতে গিয়ে অপেক্ষমাণ অবস্থায় মারা যান। তিনি বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনেরও (বিপিজেএ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মিজানুর দীর্ঘদিন কিডনি, ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মরদেহ রায়েরবাজার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রোজিনা আক্তার

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) প্রথম নারী চিত্রগ্রাহক রোজিনা আক্তার (৪০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২৩ এপ্রিল রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোজিনা আক্তার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সরাসরি সম্প্রচার হওয়া অনুষ্ঠানে বেশি কাজ করেছেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনও কাভার করতেন তিনি।

আবু জাফর পান্না

প্রবীণ সাংবাদিক আবু জাফর পান্না (৭৮) ১৭ এপ্রিল রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। আবু জাফর পান্না ১৯৪৩ সালের ১৪ এপ্রিল ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সত্তরের দশকের শুরুতে ইংরেজি দৈনিক দ্য বাংলাদেশ অবজারভার দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে মর্নিং নিউজ, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসসহ (লন্ডন) বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে কাজ করেন। সর্বশেষ দ্য নিউজ টুডের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক পদ থেকে কয়েক বছর আগে অবসর নেন তিনি। রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুমন মাহমুদ

স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সাংবাদিক সুমন মাহমুদ (৭০) আর নেই। ২২ মে রাজধানীর পুরান ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রেহেনা আক্তার

দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ ফটোসাংবাদিক রেহেনা আক্তার (৩২) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ২৯ জুন মারা যান। রেহেনা আক্তার দৈনিক ইত্তেফাকের আগে পাক্ষিক অনন্যা, বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর অনলাইনসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। গ্রামের বাড়ি ডেমরায় বাবার কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও সাধারণ সম্পাদক কাজল হাজরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মোলাজ্জেম হোসেন সাচ্চু

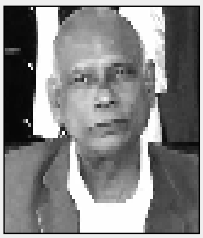

রাজশাহীর প্রবীণ সাংবাদিক মোলাজ্জেম হোসেন সাচ্চু (৭৪) ৪ জুন উপশহরে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। সাচ্চু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ইংরেজি পত্রিকা মর্নিং নিউজে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এরপর রাজশাহীর দৈনিক পত্রিকা সোনালী সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক এবং পরে স্থানীয় দৈনিক নতুন প্রভাতের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রানা হামিদ

চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা রানা হামিদ (৬৮)। ৯ মে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে।

মোজাম্মেল হক

বগুড়া প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মোজাম্মেল হক করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৪ জুন ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৭৫ বছর বয়সী প্রবীণ এই সাংবাদিক বগুড়া থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক উত্তরকোণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জেলার ভাইপাগলা মাজার কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

কাজী মো. ফজলুর রহমান

দৈনিক ইত্তেফাকের ভাণ্ডারিয়া সংবাদদাতা কাজী মো. ফজলুর রহমান (৬৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ঢাকার সাভারের একটি হাসপাতালে লিভারজনিত রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। নিজ গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মো. রওশন উজ জামান

সিনিয়র সাংবাদিক মো. রওশন উজ জামান (৭১) আর নেই। ৮ এপ্রিল রাজধানীর উত্তরায় ৭ নম্বর সেক্টরে নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। রওশন জামান সর্বশেষ ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজ'-এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে ইউএনবি, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, বাসস, এএফপিসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

মাহমুদুল হাকিম

সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক মাহমুদুল হাকিম অপু (৫৪) ৬ মে রামপুরা বনশ্রীতে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সিনিয়র সদস্য মাহমুদুল হাকিম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি কাজ করেছেন দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সকালের খবর ও বাংলাভিশনে।

মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ

দৈনিক ইত্তেফাকের গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার সাবেক সংবাদদাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ (৬৯) ১৫ এপ্রিল ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সংক্রান্ত জটিল রোগে ভুগছিলেন। আশির দশক থেকে তিনি ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোনায়েম খান

কক্সবাজারের সিনিয়র সাংবাদিক আবদুল মোনায়েম খান (৫৪) ৭ জুন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ডেইলি স্টার, নিউ এজ, ডেইলি সান পত্রিকার পর সর্বশেষ ডেইলি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজারের সিনিয়র সদস্য ছিলেন।

আমিরুল হক

সাপ্তাহিক নরসিংদীর আলো পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আমিরুল হক (৭২) ১০ জুন মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জানাজা শেষে জেলার বাদুয়ারচর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

রাহাত খান

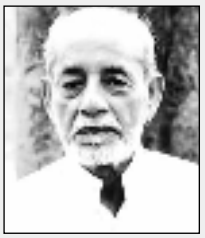

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাহাত খান (৮০) আর নেই। ২৮ আগস্ট রাজধানীর ইস্কাটনের নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন হৃদরোগের নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৯৬ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন রাহাত খান। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। রাহাত খান দীর্ঘকাল দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাসস-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সংবাদ প্রতিদিনের সম্পাদক ছিলেন।

সাইদা খানম

দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী একুশে পদকপ্রাপ্ত সাইদা খানম (৮২) ১৭ আগস্ট ঢাকার বনানীর বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। বনানী কবরস্থানে মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বেগম পত্রিকার মাধ্যমে আলোকচিত্র সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে অবজারভার, মর্নিং নিউজসহ বিভিন্ন পত্রিকায়।

ইকরাম চৌধুরী

চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরাম চৌধুরী (৫৫) আর নেই। ৮ আগস্ট একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, কিডনিসহ নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। শহরের নাজিরপাড়ায় পৌর কবরস্থানে মা-বাবার পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে। সরকারি চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকতায় আসেন ইকরাম চৌধুরী। প্রায় তিন যুগ সাংবাদিকতা পেশায় সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষ তিনি চ্যানেল আইয়ের স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক চাঁদপুর দর্পণের সম্পাদক ও প্রকাশক এবং জাগো নিউজের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফারুক কাজী

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ফারুক কাজী (৭১) ৩ জুলাই রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন বাংলার বাণী, ইউএনবি, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বিএসএস), ডেইলি অবজারভাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেছেন। নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপপ্রেস সচিব ও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টারের (প্রেস) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ল' রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি।

ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

প্রবীণ রাজনীতিক ও সাংবাদিক ড. ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (৭৮) আর নেই (ইন্নাল্লিলাহি ... রাজিউন)। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টির (পিডিপি) চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ৩১ আগস্ট মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে ফেনীর দাগনভূঞায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। ষাটের দশকে অবিভক্ত পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নির্বাচিত হন।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান

দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বার্তা সম্পাদক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান (৭২) আর নেই। ১৭ জুলাই বিকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

৪ জুলাই করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এরপর পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ এলে তাঁকে প্লাজমা দেওয়া হয়। করোনা ছাড়াও তাঁর শরীরে বিভিন্ন জটিলতা ছিল।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান ১৯৪৮ সালে রংপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ দশকের বেশি সাংবাদিকতা জীবনে তিনি বাংলাদেশ টাইমস, দ্য ডেইলি স্টার, দ্য ডেইলি সান, বাংলাদেশ টুডে, নিউ নেশন, দ্য টেলিগ্রাফসহ বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। এক দশকেরও বেশি সময় তিনি দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

আবদুস শহীদ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এনটিভির যুগ্ম প্রধান বার্তা সম্পাদক ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি আবদুস শহীদ (৬৩)। ২৩ আগস্ট রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় তোরাবগঞ্জ গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এতিমখানার পাশে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

ওয়াদুদুর রহমান পান্না

খুলনা প্রেস ক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক ওয়াদুদুর রহমান পান্না (৭০) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২২ আগস্ট নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। করোনা উপসর্গ নিয়ে ওই হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ওয়াদুদুর রহমান পান্না ব্যক্তিজীবনে বিপত্নীক ছিলেন। খুলনার জোহরা খাতুন শিক্ষা নিকেতনের পরিচালকসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তিনি।

আজিজুল ইসলাম বাচ্চু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম বাচ্চু (৭০) ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ আগস্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে গার্ড অব অনার দেওয়ার পর গ্রামের বাড়ি সোহাতায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আবুল কালাম

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদনা বিভাগের সাবেক ইনচার্জ ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাবেক সহসভাপতি আবুল কালাম (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২৩ জুলাই মিরপুরের সাংবাদিক কলোনির বাসায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। সাংবাদিক কলোনি মসজিদে জানাজা শেষে কালশি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রয়াতের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়।

ফজলুন নাজিমা খানম

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক সাব-এডিটর ফজলুন নাজিমা খানম (৭৬) ২৮ জুলাই ভোরে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানায় ডাকরখালী গ্রামের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। নিজ গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

কাজী মো. শামসুল হুদা

দৈনিক সংগ্রামের সাবেক মফস্বল সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য কাজী মো. শামসুল হুদা (৭৪) ২৮ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। রাজধানীর মিরপুর সাংবাদিক আবাসিক এলাকা সংলগ্ন মসজিদে জানাজা শেষে কালশি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রেবেকা ইয়াসমিন

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রকাশিত সংবাদপত্র দৈনিক জাহানের প্রকাশক ও সম্পাদক অধ্যাপিকা রেবেকা ইয়াসমিন (৬৫) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৭ জুলাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মোহনগঞ্জ পৌর শহরে দৌলতপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রেবেকা ইয়াসমিন নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলার দর্পণ পত্রিকারও প্রকাশক।

সাইদুজ্জামান সরকার

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বগুড়ার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধা সাইদুজ্জামান সরকার (৭০) ইন্তেকাল করেন (ইন্নলিল্লাহি ... রাজিউন)। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি বগুড়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হাতিয়ার পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক এবং বগুড়া প্রেস ক্লাব ও বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রবীণ সদস্য ছিলেন। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখযোদ্ধা সাইদুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

নুরুল করিম মজুমদার

ফেনীর সিনিয়র সাংবাদিক সাপ্তাহিক হকার্সের সম্পাদক নুরুল করিম মজুমদার (৭২) ৫ জুলাই ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ফেনী প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি নুরুল করিম মজুমদার ফেনী ডায়াবেটিক হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা ও আজীবন সদস্য ছিলেন।

কার্ক ডগলাস

হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা কার্ক ডগলাস (১০৩) মারা গেছেন। তিনি অভিনয় করেছেন 'স্পার্টাকাস', 'টু থাউজেন্ড লিগ আন্ডার দ্য সি', 'চ্যাম্পিয়ন'-এর মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবিতে। ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর ছেলে ভ্যারিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কার্ক ডগলাস ১০৩ বছর বয়সে আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বিশ্বের কাছে তিনি একজন কিংবদন্তি অভিনেতা।'

মারিয়া মারকেডার

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক মারিয়া মারকেডার (৫৪)। তিনি সিবিএস নিউজের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ডেস্কের একজন প্রডিউসার ছিলেন। সিবিএসে তিন দশক ধরে কাজ করছিলেন তিনি। সিবিএস নেটওয়ার্ক তাদের লড়াকু সাংবাদিকের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বলেছে, মারিয়া মারকেডার ২০ বছর ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। বিশ্বের অন্যতম আলোচিত ঘটনা, যেমন প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু এবং ৯/১১ হামলার ব্রেকিং সংবাদের প্রচারের সময়ে প্রডিউসিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল

সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে পিআইবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু –জাফর ওয়াজেদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মহাপরিচালক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। হিমালয়ের চেয়ে উঁচু ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহস। নিজ জাতিকেও গড়ে তুলেছিলেন সাহসীযোদ্ধা হিসেবে। গড়তে চেয়েছিলেন স্বপ্নের বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা সেই স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছে। ঘাতকরা সেদিন শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রকেও হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন আজও হয়নি। হয়নি বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন ও কর্মধারা, তাঁর দর্শন, মতবাদ, দেশ শাসন নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ বা গবেষণা। পিআইবি এসব বিষয়ে কাজ করছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে জাফর ওয়াজেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রের আইনের পাশাপাশি পিআইবির প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

১৭ আগস্ট বিকালে পিআইবি সেমিনার কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনায় অংশ নেন পিআইবি'র পরিচালক (প্রশাসন) ইলিয়াস ভূইয়া, পরিচালক (প্রকাশনা ও ফিচার এবং গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ) ফায়জুল হক, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাকির হোসেন এবং গবেষণা কর্মকর্তা শেখ মজলিশ ফুয়াদ। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সার্কিট হাউস জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।

মিলাদ শেষে পিআইবি চত্বরে একটি করে ফলদ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সাংবাদিকদের জন্য করোনাকালীন সুরক্ষাবিষয়ক ৮টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জুনে দেশের ৮টি বিভাগের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে 'করোনাকালে সাংবাদিকদের করণীয় ও সুরক্ষা' শীর্ষক আটটি ওয়েবিনার সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও ঢাকা বিভাগের ৩৬৫ জন সাংবাদিক এতে অংশগ্রহণ করেন। গত ১১, ১৬, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫, ২৯ ও ৩০ জুন অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

ওয়েবিনারগুলোয় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. শামীম রেজা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. সহিদউল্যাহ লিপন ও সহযোগী অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন নিপু, নিউইয়র্ক টাইমসের স্ট্রিংগার ও বৈশাখী টিভির পরামর্শক জুলফিকার আলী মানিক, চ্যানেল আইয়ের সিনিয়র নিউজ এডিটর মীর মাশরুর জামান, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনেশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান, দেশ রূপান্তরের যুগ্মসম্পাদক গাজী নাছির উদ্দিন খোকন, এটিএন বাংলার সিনিয়র নিউজ এডিটর মানস ঘোষ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ শফিউল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. আওরঙ্গজেব আরু, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাহাত মিনহাজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহামুদুল হক, ডেইলি স্টারের সাবেক চিফ রিপোর্টার আবুল কালাম আজাদ, বাংলা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক হারুন অর রশিদ, কালের কণ্ঠের ডেপুটি চিফ রিপোর্টার তৌফিক মারুফ, এমআরডিআই-এর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্প ডেস্কের প্রধান বদরুদ্দোজা বাবু, বাংলাদেশ পোস্টের বিশেষ সংবাদদাতা নুরুল ইসলাম হাসিব এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা আহমেদ। ওয়েবিনারগুলোয় আলোচনায় সাংবাদিকরা করোনা পরিস্থিতিতে তাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও পেশাগত নানা সমস্যা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের মাঝে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শাহ আলমগীরের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সাবেক মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১ মার্চ পিআইবির সেমিনার কক্ষে এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মো. শাহ আলমগীরের কর্মময় জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, পরিচালক (প্রশাসন), মো. ইলিয়াস ভূইয়া, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার শেখ মজলিশ ফুয়াদ, সহকারী সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেন, হিসাব অফিসার মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরী এবং গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হক। পিআইবি'র সহযোগী সম্পাদক

সাবেক মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

(পরিচালক প্রকাশনা ও ফিচার এবং গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ) ফায়জুল হক, পিআইবি পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, সহকারী সম্পাদক (প্রকাশনা) দুলাল কৃষ্ণ আচার্যসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, মরহুম মো. শাহ আলমগীর আমার অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগের ছাত্র হওয়ার কারণে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। কর্মজীবনেও তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন খুব গোছানো ও বিনয়ী মানুষ। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

সাবেক মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত পিআইবি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

পরিচালক (প্রশাসন) ইলিয়াস ভূইয়া বলেন, মরহুম শাহ আলমগীরকে আমি অল্প সময়ই পেয়েছি। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। এ ধরনের গুণ সাংবাদিকদের মাঝে বিরল। তবে তিনি কয়েকটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে সিইও হওয়ায় তাঁর প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা ছিল।

শেখ মজলিশ ফুয়াদ বলেন, শাহ আলমগীরের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। তিনি সাংবাদিক নেতা হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ড. কামরুল হক বলেন, শাহ আলমগীরের সময় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তাঁর সময়ে পিআইবিতে পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মিজানুর রহমান বলেন, শাহ আলমগীর কর্মপাগল মানুষ ছিলেন। তিনি সব সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি পিআইবি থেকে শাহ আলমগীরের ওপর যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হবে তাতে লেখা দেওয়ার জন্য পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাকির হোসেন বলেন, শাহ আলমগীরের সততা মুগ্ধ করার মতো। কর্মজীবনে তিনি আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে

থাকবেন। এখানে তাঁর কর্মকালীন দেখেছি তিনি কাজ পছন্দ করতেন। কাজের মানুষকে ভালোবাসতেন। চেতনা হারানোর আগে তিনি পিআইবি'র বেতনভাতা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ স্বাক্ষরটি ছিল পিআইবি'র বেতন বিলে।

মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরী বলেন, শাহ আলমগীরের সময়ই পিআইবি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় পিআইবি আইনটি যথাসময়ে পাস করানো হয়েছে।

করোনাকালে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও করণীয় শীর্ষক তিনটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে 'করোনাকালে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও করণীয়' শীর্ষক তিনটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার সাংবাদিকদের, ২৪ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার সাংবাদিকদের এবং ২৭ সেপ্টেম্বর চাঁদপুর ও জামালপুর জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে ওয়েবিনারগুলো অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারগুলোয় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান, নিউইয়র্ক টাইমসের স্ট্রিংগার জুলফিকার আলী মানিক, চ্যানেল আইয়ের জ্যেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক মীর মাসরুর জামান রনি, এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক মানস ঘোষ, দৈনিক দেশ রূপান্তরের যুগ্মসম্পাদক গাজী নাছির উদ্দিন খোকন, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. আওরঙ্গজেব আরু, কালের কণ্ঠের ডেপুটি চিফ রিপোর্টার তৌফিক মারুফ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাহাত মিনহাজ, বাংলাদেশ পোস্টের বিশেষ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম হাসিব, প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়ল, এমআরডিআই-এর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্প ডেস্কের প্রধান বদরুদ্দোজা বাবু প্রমুখ। ওয়েবিনারগুলোয় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনটি ওয়েবিনারে মোট ৯০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল বিভাগের সাংবাদিকদের জন্য ২৫ জুন 'করোনাকালীন সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও করণীয়' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীরা

পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের (এফএও) সহযোগিতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা' শীর্ষক ওয়েবিনার ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আয়োজিত এ ওয়েবিনারটি বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টায় শেষ হয়। ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে দারিদ্র্যের হার বাড়ায় পুষ্টি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। অপুষ্টির কারণে শিশুদের এক-তৃতীয়াংশ শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফএও এর ন্যাশনাল পোভার্টি অ্যান্ড সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যাডভাইজর মোহাম্মদ মিজানুল হক কাজল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর নাওকি মিনামিগওসি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) ফিরোজ আল মাহমুদ এবং সংশ্লিষ্ট বিটের সাংবাদিকরা। ওয়েবিনারে জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিটে কর্মরত মোট ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যাপিড সমীক্ষার ফলাফল অবহিতকরণ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (এফএও)-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে পুষ্টি সচেতনতা, আচরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে তরুণদের নিয়ে র‍্যাপিড সমীক্ষার ফলাফল অবহিতকরণবিষয়ক ওয়েবিনার ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসএআইডি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্প-২০২০ সালের মে মাসে 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে তরুণদের পুষ্টি সচেতনতা, আচরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা' বিষয়ে একটি র‍্যাপিড সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরতে গিয়ে মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন স্পেশালিস্ট প্রজ্ঞায়ন বেহেরা ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ভামি বোরা জানান, দেশের অর্ধেকেরও বেশি কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী কোভিড-১৯ থেকে নিজেকে রক্ষায় যথেষ্ট জ্ঞান রাখে এবং এক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কিছুটা এগিয়ে আছে। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আয়োজিত এ ওয়েবিনারটি বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টায় শেষ হয়। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের

নোয়াখালী ও কুড়িগ্রাম জেলার সাংবাদিকদের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর 'করোনাকালে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও করণীয়' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীরা

সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে আরও বক্তব্য দেন এফএও'র মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর নাওকি মিনামিগওসি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিটের সহযোগী পরিচালক (গবেষণা) ফিরোজ আল মাহমুদ এবং মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের সিনিয়র নিউট্রেশন অ্যাডভাইজর ললিতা ভট্টাচার্য। ওয়েবিনারে জাতীয় দৈনিক, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিটে কর্মরত ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

খাদ্য নষ্ট ও অপচয়বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (এফএও) ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নষ্ট ও অপচয়' শীর্ষক ওয়েবিনার ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আয়োজিত ওয়েবিনারটি বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টায় শেষ হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান ওয়েবিনারে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নষ্ট ও অপচয় শীর্ষক মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। ওয়েবিনারে আরও বক্তব্য দেন জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট সিম্পসন ও ইইউ ডেলিগেশন টু বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা) আশুন্তা তেস্তা এবং মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর নাওকি মিনামিগওসি। ওয়েবিনারে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। ওয়েবিনারে জাতীয় দৈনিক, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিটে কর্মরত মোট ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

গৃহস্থালি সেবামূলক কাজ নিয়ে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে 'সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে গৃহস্থালি সেবামূলক কাজ' শীর্ষক ওয়েবিনার ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আয়োজিত এ ওয়েবিনারে মোট ৩০ জন সিনিয়র সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে সম্মানিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন ও দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান। ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পিআইবি'র পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইলিয়াস ভূইয়া এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির। ওয়েবিনারে বক্তারা গৃহস্থালি সেবামূলক কাজে নারীর অবদানকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। তারা বলেন, জিডিপিতে নারীর এই শ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে দেশের প্রবৃদ্ধি অনেক বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অনলাইনে সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর মোট তিনটি সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আয়োজিত প্রশিক্ষণগুলোয় ২০ জন করে ৬০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলো উদবোধন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণগুলোয় সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেশন পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক টাইমসের স্ট্রিংগার জুলফিকার আলী মানিক, চ্যানেল আইয়ের মীর মাসরুর জামান রনি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাহাত মিনহাজ।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা